প্রথম ভাগ।

১ম সংস্করণ

শ্রীভাগবত মিত্র।

১৯৪৩

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক—
শ্রীশিবনাথ মিত্র
৭৮ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা.
হরনাথ শিক্ষার্থী।

মুদ্রাকর—
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য, বি, এ
শ্রীচৈতন্য প্রেস,
২৩৩ নং আপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥"

—ভাঃ ১০।৩১।৯

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর হরনাথের বংশ পরিচয়।

পাগল ঠাকুর হরনাথের নাম বাংলা দেশের অনেকেই শুনিয়াছেন। শুধু বাংলা দেশ নহে, বোম্বাই, পাঞ্জাব, পশ্চিম, মান্দ্রাজ, আসাম, নাগপুর, বর্ম্মা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি নানা প্রদেশে তাঁর ভক্তমণ্ডলী আছেন। হরনাথ ১২৭২ সালের ১৮ই আষাঢ় শনিবার সকাল ৫-৪৫ মিনিট গতে, শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথি, হস্তা নক্ষত্র, কন্যা রাশি, চারিখ যোগ, শকুনি করণ, মিথুন লগ্নে (ইংরাজি 1st July 1865) বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোণামুখী গ্রামে ভক্তপ্রবর জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔরসে ও ভগবতী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কোষ্ঠীর মোটামুটী ফলাফল—রাজযোগ ও সন্ন্যাসীযোগ। ভক্তিযোগ প্রবল, কর্ম্ম-বহুল। নানা বিভূতি লাভ ও বহু সেবকযুক্ত, উদার মতাবলম্বী, বৈষ্ণব উপাসক। বালকভাব। মিথুন ও কন্যারাশি বা লগ্নের জাত ব্যক্তি ইঁহার দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হইবে। ইনি নূতন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক নহেন। কিন্তু পুরাতন আবর্জ্জনাবৃত ভাবকে নবজীবন প্রদান করিবেন।

বাংলা প্রদেশের তাৎকালীন বর্দ্ধমান জেলার, (বর্ত্তমানে বাঁকুড়া জেলার) অন্তর্গত সোণামুখী গ্রামে এক ঘর নিষ্ঠাবান একান্ত ঈশ্বর শরণাগত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁর নাম যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি সোণামুখীর চট্টোপাধ্যায় পাড়া

নিবাসী কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের কেবল মাত্র দুই কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা লক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন ও শ্বশুরের সম্পত্তির অর্দ্ধেক পাইয়া জামবুনী গ্রাম হইতে আসিয়া সোণামুখী গ্রামে বাস করেন। হরনাথ এই বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে আবির্ভূত হন। সোণামুখীর এই বন্দ্যোপাধ্যায় বা বাঁড়ুয্যেরা, শাণ্ডিল্য গোত্র, যে শাণ্ডিল্য মুনি ভক্তিসূত্র ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল প্রবর, কুলাচল বিভাগ, রাঢ়ী শ্রেণী, গাঞি বন্দ্যঘটী, ফুলিয়া মেল, স্বতন্ত্র ভাগ, ভাব ও যুত নাই। কাঁটাদিয়া সমাজ, সিদ্ধ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বোবা গোপীনাথের সন্তান, ভঙ্গ, সামবেদী, কুথুমশাখাধ্যায়ী।

খ্রীষ্টাব্দ ৭৫৩—৭৫৫ সাল মধ্যে মহারাজ জয়ন্ত আদিশূর পুত্রেষ্টি যাগ করিবার অভিপ্রায়ে কান্যকুব্জপতি বীরসিংহের নিকট হইতে পাঁচ জন সাগ্নিক বিপ্রকে গৌড়ে আনেন। এই পাঁচ জন সাগ্নিক বিপ্রই বঙ্গদেশের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণগণের আদি পুরুষ। এই পাঁচজন সাগ্নিক বিপ্রের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ একজন সাগ্নিক বিপ্র। এই ভট্টনারায়ণের বংশে ঠাকুর হরনাথের জন্ম।

এই পাঁচজন সাগ্নিক বিপ্র অশ্বারোহণে কোলঞ্চ হইতে আদিশূরের সভায় আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ কবচাবৃত ও করে রমণীয় অসি বাণতূণ শোভিত ছিল। রাজা ভূশূরের সহিত রাঢ় দেশে আসিয়া বাস করেন বলিয়া তাঁহারা "রাঢ়ী" নামে খ্যাত হইলেন। ইহাদিগের অন্যান্য বংশধরগণ তৎকালে বরেন্দ্র ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া "বারেন্দ্র" নামে অভিহিত হইলেন।

বাংলা দেশের ইতিহাস ও কুলগ্রন্থে দেখা যায় যে ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে কনোজপতি যশোধর্ম্মদেবের সময়ে সর্ব্বপ্রথম ভট্টনারায়ণের পিতা ক্ষিতীশ কাশ্যপ গোত্রীয় বীতরাগ, বাৎস্য গোত্রীয় মেধাতিথি, ভরদ্বাজ গোত্রীয় সুধানিধি, সাবর্ণ গোত্রীয় সৌভরী এই পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্র, নর্ম্মদাতীরস্থ লাট ব্রাহ্মণগণ ও জলচল, যজ্ঞ কার্য্যের সহায়তাকারী নম্র পাঁচজন ক্ষাত্রয় কায়স্থ যথা (১) অনাদিবর সিংহ, (২) সোম ঘোষ, (৩) পুরুষোত্তম বসু, (৪) সুদর্শন মিত্র ও (৫) দেব দত্ত, গৌড়ে আসিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই পরিবারবর্গের সহিত আসিয়াছিলেন। যজ্ঞ কার্য্য শেষ হইলে সকলেই দেশে ফিরিয়া যান কিন্তু স্বদেশস্থ গ্রামবাসিগণ তাহাদিগকে সমাজে গ্রহণ না করাতে সকলেই পুনরায় ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ে আসিয়া বসবাস করেন।

রাঢ়দেশে শূররাজ্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে ভূশূর তনয় মহারাজ ক্ষিতিশূর সাগ্নিক

বিপ্রগণের সকল বিষয় অবগত হইয়া বিপ্রগণের সন্তানদিগের ভরণপোষণ ও বাসস্থানের জন্য ৫৬ খানি গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। গ্রামের নামানুসারে গ্রামী বা "গাঞি"র উৎপত্তি হইয়াছে। ক্ষিতীশের ১৬ জন পৌত্র বা ভট্টনারায়ণের ১৬ জন পুত্রের জন্য ঐ ৫৬ খানি গ্রামের মধ্যে ১৬ খানি গ্রাম নির্দ্দিষ্ট হয়। ভট্টনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বরাহ বীরভূমের অন্তর্গত কাণানদীর নিকট (অক্ষ ২৪° ৫৫′ ৫১″ উঃ ও দ্রাঘিঃ ৮৭° ৫২′ ২৫″ পূঃ) ইহার নামানুসারে বন্দ্যগ্রামিগণ "বন্দিঘাটী" নামে পরিচিত—বন্দ্য বা বন্দিঘাট গ্রামখানি এখন বন্দিঘাট নামেই প্রচলিত।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের ১৬টী পুত্রের মধ্যে ৫টী পুত্র বীরভূম জেলায়, ৩টী পুত্র বাঁকুড়া জেলায়, ৩টী বর্দ্ধমান, ১টী মানভূমে, ৩টী মুর্শিদাবাদ জেলায় ও ১ জন হুগলি জেলায় বাস করিয়াছিলেন। ভট্টনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বরাহ বীরভূম জেলার অন্তর্গত কাণানদীর নিকট বন্দ্য বা বন্দিঘাট গ্রামে খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে বাস করেন।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণগণের যে উপাধি দেখিতে পাই যথা বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় ঘোষাল, ইত্যাদি সকলগুলিই আদি গ্রাম বসবাস কালীন এই সকল গ্রামের স্মৃতিচিহ্ন বহন করিয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালে তাঁহারা দ্বিবেদী, ত্রিবেদী ইত্যাদি বলিয়া অভিহিত হইতেন। আদিশূর যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন তাঁহারা আচার্য্য, উপাধ্যায়, মিশ্র, পাণ্ডে ইত্যাদি বৈদিক কার্য্য হিসাবে গণ্য হইতেন। এই সকল আচার্য্য, উপাধ্যায় মিশ্র ইত্যাদি উপাধি সে সময় বংশগত ছিল না। যতদিন কেহ আচার্য্যের কার্য্য করিতেন ততদিন তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া অভিহিত করা হইত, পরে তিনি উপাধ্যায়ের কার্য্য করিলে উপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হইতেন। যে সময় ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রগণ দূরবর্ত্তী জেলায় গিয়া বসবাস করেন সেই সময় হইতে এই সকল উপাধি বংশগত হইয়া পড়ে।

এই বন্দ্যোপাধ্যায় নামটীর দ্বারা গ্রাম ও বৈদিক কার্য্যের শ্রেণী বিভাগ বুঝায়। যথা বন্দ্য নামটী গ্রামের নাম ও উপাধ্যায় নামটী বৈদিক কার্য্যের বিশিষ্ট শ্রেণীবাচক। এই দুইটী একত্রে বন্দ্যোপাধ্যায় হইয়াছে। ভট্টনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বরাহ ও তাঁর বংশধরেরা বংশানুক্রমে কেবল বন্দ্যোপাধ্যায় হইয়াছেন ও হইতেছেন। কিন্তু বরাহের অন্য ভ্রাতারা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস হেতু ভিন্ন ভিন্ন উপাধি পাইয়াছেন।

পাগল হরনাথকে ভট্টনারায়ণ হইতে গণনা করিলে ৩৯ পরিচয়, বা পর্য্যায় ভুক্ত পুরুষ হন।

শাণ্ডিল্যমুনির বংশের পুত্র কলিব্যাস তৎপুত্র বামদেব, তৎপুত্র রামদেব, তৎপুত্র ক্ষিতীশ (আদিশূর সভায় কনোজাগত কোলঞ্চ হইতে আসিয়াছিলেন) তৎপুত্র (১) ভট্টনারায়ণ (রাঢ়ে বাস হেতু রাঢ়ী) তৎপুত্র (২) বরাহ (বীরভূম জেলার বন্দিঘাট গ্রামে বাস হেতু বন্দিঘাট গ্রামিগণ ইহার নামানুসারে "বন্দিঘাটী" বা "বন্দ্যঘটী" নামে পরিচিত) তৎপুত্র (৩) সুবুদ্ধি তৎপুত্র (৪) বৈনতেয়, তৎপুত্র (৫) বিবুধেশ, তৎপুত্র (৬) সুভিক্ষ (সুভিক্ষের অন্য চারি ভ্রাতার উল্লেখ করা হইল না), তৎপুত্র (৭) ভয়াপহ (অন্য ভ্রাতা অনিরুদ্ধের বিষয় ছাড়া হইল) তৎপুত্র (৮) ধরণী. তৎপুত্র (৯) মহাদেব, তৎপুত্র (১০) মকরন্দ, তৎপুত্র (১১) দশো বা দাশরথি (ঢাকা জেলার কাঁটাদিয়া বাস), তৎপুত্র (১২) বনমালী, তৎপুত্র (১৩) ভীম, তৎপুত্র (১৪) মাধব, তৎপুত্র (১৫) আদিত্য, তৎপুত্র (১৬) পীতাম্বর, তৎপুত্র (১৭) চতুর্ভুজ, তৎপুত্র (১৮) সবাই, তৎপুত্র (১৯) শ্রীগর্ভ (ঢাকা জেলার কাঁটাদিয়া গ্রাম পরিত্যাগ ও নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে বাস, হরিণাকুণ্ড সমাজভুক্ত), তৎপুত্র (২০) গৌরীকান্ত, তৎপুত্র (২১) চণ্ডীদাস, তৎপুত্র (২২) বিশ্বেশ্বর (ভঙ্গ) তৎপুত্র (২৩) বলরাম, তৎপুত্র (২৪) হরিহর, তৎপুত্র (২৫) জগন্নাথ, তৎপুত্র (২৬) রাঘব পাঠক চক্রবর্ত্তী (রাজ উপাধি), তৎপুত্র (২৭) সিদ্ধ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বোবা গোপীনাথ বা গুপীনাথ, (গোপীনাথ কাণে শুনিতে পাইতেন, মুখে কথা বলিতেন না, বিবাহে অন্তে মন্ত্র পাঠ করেন। তিনি বন্যব্যাঘ্র চাপিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন) তৎপুত্র (২৮) রামেশ্বর (লাওগ্রাম বাঁকুড়ায় বাস), তৎপুত্র (২৯) মদনমোহন, তৎপুত্র (৩০) গঙ্গাধর (অযোধ্যায় বাস), তৎপুত্র (৩১) পৃথ্বীধর (জামবুনী গ্রামে বাস) তৎপুত্র (৩২) সীতানাথ (জামবুনীতে বাস ও কণকলতা ঠাকুরাণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা নিস্তারিণীকে বিবাহ করেন), তৎপুত্র (৩৩) যজ্ঞেশ্বর (সোণামুখী গ্রামে বাস) তৎপুত্র (৩৪) রামচন্দ্র (সোণামুখী) তৎপুত্র (৩৫) কুঞ্জবিহারী (সোণামুখী) তৎপুত্র (৩৬) মদনগোপাল, তৎপুত্র (৩৭) শ্রীকান্ত (সোণামুখী) তৎপুত্র (৩৮) জয়রাম (সোণামুখী) তৎপুত্র (৩৯) হরনাথ (সোণামুখী) এই হরনাথই আমাদের পাগল হরনাথ, ঠাকুর হরনাথ বা পাগল ঠাকুর হরনাথ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

"পাগল হরনাথ" নামের উৎপত্তি।

হরনাথ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে ঠাকুর

হরনাথ বলিয়া থাকেন। পাগল উপাধি তাঁর হাতরাসের ভক্ত অটলবিহারী নন্দী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। এই অটল বিহারীর সহিত ১৮৯৫ সালে হরনাথের পরিচয় হয়। সাধারণ বিশ্বাসের বিরোধী ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হরনাথের নিকট শুনিয়া ঐ সকল কথাবার্ত্তাকে হরু ঠাকুরের পাগলামি বলিতেন। হরনাথ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর, তাঁর কর্ম্মস্থল, হইতে পত্র লিখিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ ৩৪ খানি পত্র সংগ্রহ করিয়া অটলবিহারী ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে, চৈতন্যাব্দ ৪২০ সালে পুস্তক আকারে প্রথম খণ্ড ছাপান—এই পুস্তকখানির নাম দিয়াছিলেন "শ্রীহরনাথ ঠাকুরের পাগলামি" "অর্থাৎ শ্রীমদ্ হরনাথ ঠাকুরের উপদেশপূর্ণ পত্রাবলী"। এই পুস্তকখানি বিনা মূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। পরে চৈতন্যাব্দ ৪২২ সালে ইংরাজি ১৯০৬ সালে ৫১খানি পত্র সংগ্রহ করিয়া দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তক প্রকাশ করেন ও এই পুস্তকের নাম রাখেন "পাগল হরনাথ" বা "শ্রীহরনাথের অপূর্ব্ব পত্রাবলী"। এই সময় হইতে "পাগল" নামের উৎপত্তি হয়। হরনাথ তাঁর এই "পাগল" নামের জন্য অসন্তুষ্ট হন নাই বরং আনন্দ অনুভব করিতেন, তিনি নিজেও তাঁর লেখাকে "পাগলের পাগলামি" বলিয়া অনেক পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

অনেকে অনুমান করেন যে তিনি কৃষ্ণকথা বলিতে বা কৃষ্ণ বিষয়ের পত্র লিখিতে পাগল হইয়া যাইতেন বলিয়া "পাগল" উপাধি পাইয়াছেন। কৃষ্ণকথা বলিতে আরম্ভ করিলে তাঁর সময়ের জ্ঞান থাকিত না—তিনি সত্যই পাগল হইয়া যাইতেন, কিন্তু অটল বিহারী এই জন্য তাঁকে পাগল বলেন নাই। ঠাকুর হরনাথ সাধারণ বিশ্বাস-বিরোধী কথা বলিতেন বলিয়া অটল বিহারী তাঁকে "পাগল" বলিতেন। সাধারণ বিশ্বাস-বিরোধী কথার দুই চারিটী উদাহরণ দিলাম। ঠাকুর হরনাথ বলিতেন :—

(১) কণ্ঠে মালাধারণ, কপালে ও নাসিকায় তিলক কাটা, সর্ব্বগাত্রে হরিনামের ছাপ, হাতে মালা না ফিরিলে—বৈষ্ণব হওয়া যায় না, একথা যাঁহারা বলেন তাঁরা কৃষ্ণ রাজ্যের ধার ধারেন না।

(২) হ্যাট কোটধারী মাছ মাংসভোজী কত বৈষ্ণব চূড়ামণি আছেন—তাহার সন্ধান কে রাখে।

(৩) অহিংসা পরম ধর্ম্ম—আমরা একথা যে ভাবে বুঝিয়া থাকি তাহা ভ্রমাত্মক। যে কোন কারণে প্রাণী হত্যা করিলে বা উদরের জন্য জীব হত্যা করিলে হিংসার কার্য্য হইল। তারা জানে না এজগতে সকলেই অন্যের প্রাণ-সংহার করিয়া জীবিত আছে—এই সংহার কার্য্য ছাড়া বাঁচিবার উপায় নাই।

উদ্ভিদের প্রাণ আছে, জল ও বায়ুতে অসংখ্য প্রাণী আছে—ইহাদের নাশ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।

(৪) জঠর বা গর্ভ যন্ত্রণা—এটা একেবারে অলীক কথা। গর্ভস্থ জীব তিলমাত্র যন্ত্রণা বোধ করিলে মরিয়া যাইত; প্রাণী মাত্রেই গর্ভে মহাসুখে ও আনন্দে থাকে।

(৫) মানব সুসভ্য হইয়া স্বার্থে বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছে—বিবাহ মন্ত্রে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া সকল ভাষাতে দিলাম ও গ্রহণ করিলাম ছাড়া আর কি আছে? বিবাহ ব্যতীত পুরুষ নারী গ্রহণ বা নারী পুরুষ গ্রহণ করিলে সমাজ তাহাকে পাপী বলিয়া থাকে। কৃষ্ণ কি তাকে পাপী বলেন?

(৬) পাপকার্য্য ঘৃণা করিও, পাপীকে ঘৃণা করিও না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাগল হরনাথের পিতা ও মাতার পরিচয়—

পাগল হরনাথের পিতা জয়রাম, শ্রীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔরসে ও দ্বিতীয়া স্ত্রী আদরমণি দেবীর গর্ভে ৫ই বৈশাখ ১২১২ সালে সোণামুখীতে-জন্মগ্রহণ করেন। ১২১২ সালের কার্ত্তিক মাসে বহু অর্থ ব্যয়ে জয়রামের অন্নপ্রাশন হইয়াছিল। অন্নপ্রাশনের পর বিমাতা ভদ্রকালীর অত্যাচারে জয়রামকে মাতুলালয়ে গিয়া বাস করিতে হইয়াছিল। ভদ্রকালীর যত আক্রোশ শিশু জয়রামের উপর পড়িল। একদিন তিনি শিশুটীকে সজোরে মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করাতে শিশু অচৈতন্য হইয়া পড়ে ও বহু চেষ্টায় শিশুর চৈতন্য ফিরিয়া আসে। ভদ্রকালীর এই সব কার্য্য দেখিয়া প্রতিবাসীগণের পরামর্শে শ্রীকান্ত তাঁর স্ত্রী আদরমণি ও শিশু পুত্রকে বেলিয়াড়া গ্রামে তাঁর শ্বশুরালয়ে রাখিয়া আসেন। জয়রামের যখন ৫ বৎসর বয়স সেই সময় শ্রীকান্ত তাঁর স্ত্রী ও জয়রামকে সোণামুখীতে আনেন কিন্তু তাহাদিগকে সোণামুখীতে রাখিতে অকৃতকার্য্য হন, অগত্যা তাহাদিগকে পুনরায় বেলিয়াড়ায় লইয়া যান।

জয়রাম মাতুলালয়ের গ্রামের পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন। তিনি পাঠশালায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, চণ্ডী ইত্যাদি গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ ছিল না, তাই তিনি ইংরাজি ভাষায় লিখিতে বা পুস্তক পড়িতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁর কর্ম্মস্থল কলিকাতায় থাকা কালে কুঠীর ইংরাজ বণিকগণের কথা শুনিয়া শুনিয়া ইংরাজিতে কথা কহিতে পারিতেন। তিনি দেব দেবীর পূজা করিতে পারিতেন। মাতুলদের কুলদেবতা দামোদর শালগ্রাম শিলা পূজা করিতেন।

একদা জয়রাম দামোদর শালগ্রাম শিলা পূজা করিতেছেন এমন সময় এক সন্ন্যাসী আসেন ও পূজিত শালগ্রাম শিলাটীকে জাগ্রত দেবতা বলিয়া বর্ণনা করেন ও একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ জয়রামের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়াছিলেন। অন্য আর একদিন বেলিয়াড়া গ্রামে একজন দৈবজ্ঞ আসেন—সেই দিন জয়রামের পিতা শ্রীকান্ত তথায় ছিলেন। শ্রীকান্ত ঐ দৈবজ্ঞকে তাঁর হাত দেখান। দৈবজ্ঞ শ্রীকান্তের হাত দেখিয়া তিনি একটী পরম ধার্ম্মিক পুত্রলাভ করিবেন বলেন। শ্রীকান্ত দৈবজ্ঞকে জয়রামের হাত দেখিতে বলেন। দৈবজ্ঞ জয়রামের হাত দেখিয়া শ্রীকান্তকে বলেন এইটী তোমার ধার্ম্মিক পুত্র—এই পুত্রের ঔরসে ৪টী পুত্র ও ২টী কন্যা জন্মগ্রহণ করিবেন—এই সন্তানগুলির মধ্যে কোন সিদ্ধ পুরুষ পুত্ররূপে আসিয়া জন্মিবে। ঐ পুত্রের পুণ্যে ইহার কুল পবিত্র হইবে।

বালক জয়রাম তাঁর অনেকগুলি পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে বলাতে বিশেষ লজ্জিত হন ও বিবাহ করিবেন না সিদ্ধান্ত করেন। এই কারণে ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি বিবাহ করেন নাই। ১২২৬ সালে জয়রামের মাতা আদরমণি ২৯ বৎসর বয়সে জ্বরাতিসারে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার এক বৎসর মধ্যে জয়রামের পিতা ১২২৭ সালে ৬১ বৎসর বয়সে অমরধামে চলিয়া যান। শ্রীকান্তের মৃত্যু সোণামুখীতে হইয়াছিল এ সংবাদ জয়রামকে প্রেরণ করা হয় নাই। জয়রামের মাতুল রামতনু মুখোপাধ্যায় লোকমুখে এই সংবাদ পাইয়া তিনি জয়রামকে সঙ্গে লইয়া ক্ষৌরকার্য্যের পূর্ব্বদিনে সোণামুখীতে আসেন। কোন পুত্র পিতার পারলৌকিক কার্য্যে যোগদান না করিলে পিতৃ সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে না এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জয়রামের বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা হংসেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, রামদয়াল, জগন্নাথ ও বিমাতা ভদ্রকালী জয়রাম ও তাঁর মাতুলকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই, গালিগালাজ ও মারধর

করিয়া তাড়াইয়া দেন। পাড়ার ও গ্রামের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক একত্র হইয়াছিলেন। শ্রীকান্তের খুড়তুত ভ্রাতা নফরচন্দ্র সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি জয়রামের প্রতি এইরূপ ব্যবহার সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি জয়রামকে সঙ্গে লইয়া ভদ্রকালীর নিকটে যান কিন্তু ভদ্রকালী তাঁর কথা শুনিলেন না অধিকন্তু গালিগালাজ করিলেন। নফরচন্দ্র জয়রামকে নিজের বাটীতে আনেন ও শ্রাদ্ধের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সোণামুখীর ব্রাহ্মণমণ্ডলী একজোটে কেহই জয়রামের বৈমাত্র ভ্রাতাদের বাড়িতে যান নাই। গ্রামের কোন পুরোহিত বা পরামাণিক উহাদিগের শ্রাদ্ধ বা ক্ষৌরকার্য্য করে নাই।

জয়রামের প্রখর বুদ্ধি ও সুন্দর হস্তাক্ষর দেখিয়া শ্রাদ্ধান্তে নফরচন্দ্র তাঁর কলিকাতা, বড়বাজার ৯নং বণাক লেনস্থ গালার আড়তে মাসিক ৩৲ টাকা বেতনে জয়রামকে নিযুক্ত করেন ও শ্রাদ্ধের একমাস পরে ১২২৮ সালের বৈশাখ মাসে জয়রামকে কলিকাতার আড়তে পাঠাইয়া দেন। এই সময় জয়রামের বয়স ১৬ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। জয়রাম 'সরকার" রূপে কর্ম্মে নিযুক্ত হন ও ১২৭২ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত—নফরচন্দ্রের "সরকার" রূপে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। মাসিক ৩৲ টাকা বেতন হইতে মাসিক ১১৲ টাকা হইয়াছিল, তাঁর বাসাভাড়া বা খাইখরচ লাগিত না—ইহা ছাড়া বাৎসরিক হিসাব নিকাশের সময় সকল কর্ম্মচারিগণের সহিত একটা অংশ পাইতেন। বাৎসরিক ২০০৷৩০০৲ টাকা পাইতেন, এই হিসাবের অংশ প্রতি বৎসর একরূপ হইত না। জয়রাম ১২৭৩ সালের বৈশাখ মাসে কলিকাতার ৪১নং বাঁশতলা লেনে চারিজন অংশীদারে গালার আড়ত খোলেন। সোণামুখীর রাণীর বাঁধের (পুষ্করিণীর) পাড়ে গালা তৈয়ারী করিবার কারখানা ছিল।

মানকরের (১) নিমু কুণ্ডু—৫০০০৲ টাকা মূলধন দিয়াছিলেন তাই তিনি আট-আনা অংশ পাইতেন। (২) গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও (৩) জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় তিন আনা হিসাবে ছয় আনা পাইতেন ও (৪) নদেরচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় দুই আনা পাইতেন। নিমু কুণ্ডু ব্যতীত আর সকলেই সোণামুখীর লোক।

নফরচন্দ্র, যাদবেন্দ্র, গোপীনাথ ও অন্যান্য আত্মীয়গণের চেষ্টায় জয়রাম সাবেক বাড়ীর পূর্ব্বদিকে ছয় কাঠা খালি জমি বাসের জন্য ও মাঝির ডাঙ্গা গ্রামে ১২ বিঘা জমি পৈত্রিক হিসাবে পাইয়াছিলেন। জয়রামের ৩০ বৎসর বয়সের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ছয় কাঠা জমি পড়িয়াছিল ও মাঝির ডাঙ্গার জমির খাজনা বৈমাত্র ভ্রাতাদের চক্রান্তে আদায় করিতে পারিতেন না।

খ্রীষ্টাব্দ ১৮৪০ হইতে ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ৺দুর্গা পূজার সময় ইংরাজ বণিকদিগের অফিস ও কাজ এক মাসের উপর বন্ধ থাকিত ও সাহেবগণ জাহাজে করিয়া এক মাসের জন্য সমুদ্রে বেড়াইতে যাইতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরে ভিক্টোরিয়ার সময়েও গভার্ণমেণ্ট অফিস একমাস বন্ধ থাকিত, এখন এক মাসের স্থলে ১২ দিন মাত্র বন্ধ থাকে। স্কুল আদালতে এখন পর্য্যন্ত সাবেক নিয়ম বাহাল আছে। এই সময় ভারতবর্ষে রেলের রাস্তার বিস্তার হয় নাই বলিয়া সাহেবগণ বিলাত হইতে আগত জাহাজ ভাড়া করিয়া সমুদ্রে বেড়াইতে যাইতেন। রাজা, মহারাজা ও ধনী ব্যক্তিগণ বজরা বা নৌকাযোগে কাশী, এলাহাবাদ ইত্যাদি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ১৬ই এপ্রেল ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে থানা পর্য্যন্ত রেল লাইন খোলা হয়, ইহাই ভারতবর্ষে প্রথম রেল লাইনের সূত্রপাত। ১৫ই আগষ্ট ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া হইতে হুগলি পর্য্যন্ত রেলের রাস্তার বিস্তার হয়।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম রেল লাইন খোলা হয়। ইহার ২০ বৎসর পরে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের বঙ্গদেশে রেল রাস্তা বিস্তার কল্পে বিলাতে দুইটী কোম্পানির সৃষ্টি হয়, একটীর নাম ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি (East Indian Railway Company) অপরটীর নাম গ্রেট ওয়েষ্টরন অফ্ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি (Great Western of Bengal Railway Company), এই কোম্পানিদ্বয়ের মূলধন চারি কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা (£3000000/-) নির্দ্ধারিত হয়। পরে এই দুই কোম্পানি মিলিয়া একটী কোম্পানি হয়। এই রেল ল্যাইন পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি হইবে লর্ড ডালহাউসি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। এই রেল লাইনের কাজ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়।

হাওড়া হইতে হুগলি—১৫ই আগষ্ট ১৮৫৪ সালে খোলা হয়।

হুগলি হইতে পাণ্ডুয়া—১লা সেপ্টেম্বর ১৮৫৪ সালে খোলা হয়।

পাণ্ডুয়া হইতে রাণীগঞ্জ—১৮৫৮ সালে খোলা হয়।

হাওড়া হইতে রাণীগঞ্জের মধ্যে পানাগড়। এই পানাগড় ষ্টেসন ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে খোলা হয়। এই পানাগড় ষ্টেসন হইতে লোকে সোণামুখী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিত। (History of E. I. Railway's in India by G. Huddeston C. I. E) বেঙ্গল নাগপুর রেল লাইন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম খোলা হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে খড়্গপুর (Khargapur) ষ্টেসন খোলা হয়।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত হাওড়া হইতে কিউল ষ্টেসন পর্য্যন্ত

নিম্ন লিখিত ষ্টেসনগুলি বর্ত্তমান ছিল। যথা:—হাওড়া, হুগলি ব্যাণ্ডেল, পাণ্ডুয়া, বর্দ্ধমান, খানা জংসন, পানাগড়, অণ্ডাল, রাণীগঞ্জ, আসানশোল, সীতারামপুর, আলিপুর, মধুপুর, দেওঘর, ঝাঁঝা ও কিউল।

কলিকাতা হইতে সোণামুখী পর্য্যন্ত হাঁটা পথ ছিল। এখনও সে পথগুলি আছে। এই হাঁটা পথে যাতায়াত করিতে দুই দিন সময় লাগে। যাঁহারা বলেন, বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন যে জয়রাম সোণামুখীতে সন্ন্যাসীর আগমন স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া তৎপর দিন প্রাতঃকালে সোণামুখীতে পৌছিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ।

জয়রাম ও অন্যান্য গালার আড়তের লোকেরা ৺দুর্গা পূজার সময় যে যার বাড়ীতে যাইতেন। জয়রাম তাঁর মনিব ও সম্পর্কের খুড়া নফরচন্দ্রের বাড়িতে আসিয়া উঠিতেন। নফরচন্দ্র ইত্যাদি বন্দ্যোপাধ্যায় বংশধরগণ, যাঁহাদের শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দর কুলদেবতা, তাঁহারা কেহই অদ্যাবধি প্রতিমা-পূজা করেন না। জয়রাম পূজা অন্তে মাতুলালয় বেলিয়াড়া গ্রামে গিয়া থাকিতেন। বেলিয়াড়া গ্রামকে চলিত কথায় বেলেড়া গ্রাম বলিয়া থাকে, গ্রামটী দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে অবস্থিত। সোণামুখীর দক্ষিণে ১৯ মাইল দূরে বি, এন, রেলের ভেদুয়াশোল ষ্টেসন (B. N. Ry. Bheduasole Station) হইতে ১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই সময় জয়রামের বয়স ২৮ বৎসরের অধিক হইয়াছিল। জয়রাম তাঁর সঞ্চিত অর্থের অর্দ্ধেক নফর চন্দ্রের নিকট ও অপর অর্দ্ধেক তাঁর মাতুলানি, রামতনু মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীর নিকট গচ্ছিত রাখিতেন। এইভাবে জয়রাম এক হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। অর্থাৎ নফর চন্দ্রের নিকট পাঁচ শত টাকা ও মাতুলানীর নিকট পাঁচ শত টাকা জমা করিয়াছিলেন। ১২৪০ সালের ৺দুর্গা পূজার সময় জয়রাম সোণামুখীতে আসিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় নফরচন্দ্র ও অন্যান্য আত্মীয়গণ সকলে একত্রে জয়রামকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আকুমার ব্রহ্মচারী পরম পবিত্র চরিত্র মধুর ভাষী জয়রামকে সকলেই ভালবাসিত—যিনি একবার জয়রামের সঙ্গে কথা কহিতেন তিনিই মুগ্ধ হইতেন। সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হওয়া বা ভেক লইয়া বৈষ্ণব হওয়া জয়রাম অনুমোদন করিতেন না—পাগল হরনাথও ইহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর অর্থ সঞ্চয়ের কথা বলিলে তিনি বলিতেন, বৃদ্ধ বয়সের জন্য সংস্থান করিতেছেন। জয়রাম অতি নম্রভাবে নফর চন্দ্রের চরণ ধারণ করিয়া বিবাহ করিবার আদেশ না করেন এই প্রার্থনা করেন। সকলে আশা করিয়াছিলেন যে জয়রামকে সংসারী করিয়া

সুখী হইবেন কিন্তু এ বিষয়ে হতাশ হইয়া বৃদ্ধ নফরচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলেন ও রাধাশ্যামসুন্দরের নিকট প্রার্থনা করেন যেন তিনি জয়রামকে সুমতি দেন। এ যাত্রায় জয়রাম বেলিয়াড়া গ্রামে যাইলে তাঁর মাতুল ও মাতুলানী বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। জয়রাম মধুরবচনে তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করেন।

পূজার ছুটীর অন্তে জয়রাম কলিকাতায় গিয়া পৌঁছেন ও আড়তের কাজ আরম্ভ করেন। বিবাহ করিবার কথা মনের কোণেও স্থান দেন নাই। এ জীবনে বিবাহ করিবেন না এই ধারণাই তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছিল।

ভগবানের হাতে আমরা ক্রীড়ার পুতুল মাত্র—যে কাজ করিব মনে করি তাহা করা হয় না। আবার যে কাজ করিব না ঠিক করি তাহা বাধ্য হইয়া করিয়া থাকি। ঈশ্বরের অচিন্ত্য কৌশলে ১২৪১ সালে বিবাহ করিব না এই স্থির সিদ্ধান্তটীকে জয়রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন ও শীঘ্র বিবাহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন ও ১২৪২ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ মাসে, ৩০ বৎসর বয়সে সোণামুখীর ব্রাহ্মণ পাড়ার প্রসিদ্ধ তর্কলঙ্কার বংশের কার্ত্তিক চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কন্যা ভগবতী দেবীকে বিবাহ করেন। ভগবতী দেবীর মাতার নাম দাসু ঠাকুরাণী। পরে এই দাসু ঠাকুরাণীর ঐকান্তিক আগ্রহে কুসুম কুমারীর সহিত হরনাথের বিবাহ হয়। এই বিবাহের ঘটকালি দাসু ঠাকুরাণী করিয়াছিলেন।

জয়রাম বিবাহ করিবার পূর্ব্বে কলিকাতার গালার আড়তেই থাকিতেন, বৎসরে একবার সোণামুখীতে আসিতেন, কোন কোন বৎসর আসিতেন না একাকী কলিকাতায় থাকিতেন। সোণামুখীতে যে ছয় কাঠা জমি পাইয়াছিলেন তাহাতে কোন প্রকার ঘর ছিল না বা তিনি নিজেও কোন গৃহ নির্ম্মাণ করেন নাই, আর মাঝিডাঙ্গার জমি বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের চক্রান্তে বেদখল হইয়াছিল—ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সোণামুখীতে তাঁর নিজের আত্মীয় বলিতে কেহ ছিলেন না, এই সকল কারণে তিনি কলিকাতা থাকিতে ভালবাসিতেন। ১২৪১ সালে মহামারীরূপে কলিকাতায় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। শতকরা পাঁচ জন বসন্ত রোগী রক্ষা পাইয়াছিল কি না সন্দেহ। জয়রাম এই রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। ৫।৭ দিনের মধ্যে তাঁহার সর্ব্বশরীরে বসন্ত দেখা দিল। তিনি জ্বরে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। বসন্তের ঘা সর্ব্ব শরীরে লেপিয়া পড়িল, ক্ষতের পচা গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। চক্ষু মেলিয়া চাহেন না—জ্বরের ও সীমা নাই—জীবনের আশা একেবারেই ছিল না। গালার আড়তে যাহারা কাজ করিত তাহারা সকলেই সোণামুখীর লোক, তাহারা

বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইবার ভয়ে ঘরে ঢুকিত না। সকাল সন্ধ্যায় দরজার নিকট হইতে মৃত্যু হইয়াছে কিনা দেখিয়া যাইত। একজন শীতলার ব্রাহ্মণ প্রত্যহ একবার দেখিয়া যাইত, নিকটে একঘটী গঙ্গা জল থাকিত। এই অবস্থায় সাত দিন গত হইলে পর, জয়রাম চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, উঠিবার শক্তি নাই গলার মধ্যে বসন্ত বাহির হওয়ায় কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দারুণ পিপাসা, চারি দিকে চাহিলেন নিকটে ছোট ঘটী দেখিতে পাইলেন, উহা হস্তে গ্রহণ করিয়া সব জলটুকু পান করিলেন—পিপাসা মিটিল না, উঠিবার চেষ্টা করিলেন পারিলেন না, ঘরে কেহ নাই বা কেহ আসে না যে ইঙ্গিত করিয়া জল দিতে বলিবেন। যে সন্ধ্যার সময় ধুনা গঙ্গা জল দিতে আসিল, প্রদীপ রাখিয়া গেল, জয়রাম তাহাকে ইঙ্গিতে জল খাইবেন দেখাইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে যন্ত্রনায় ছটফট করিতেছে এইরূপ ভ্রম হওয়ায় সেই লোকটী শীঘ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—সে রাত্রে সে ঘরে আর কেহ আসিল না। তিনি পিপাসায় সারারাত্রি ছটফট করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে শীতলার ব্রাহ্মণের সহিত ২।৩ জন লোক দরজার নিকট দাঁড়াইলেন, তাহাদিগকে জল দিবার ইঙ্গিত করিলেন। এক জন লোক মুখে কাপড় দিয়া দুধ ও জল রাখিয়া পলাইয়া গেল। লোকদিগের ভয়, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ব্যবহার দেখিয়া জয়রাম ভাবিতে লাগিলেন যে তিনি বিবাহ না করিয়া কি ভুল করিয়াছেন। আজ তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা থাকিলে নিশ্চয়ই তাহারা এইরূপ ব্যবহার করিত না। এই বসন্ত রোগই তাঁর মত পরিবর্ত্তনের কারণ হইল ও তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া বিবাহ করিলেন। এই বসন্ত রোগ আক্রমণের বিশিষ্ট দুইটী চিহ্ন তাঁর মুখমণ্ডলে ছিল। একটী তাঁর কপালে, অন্যটী তাঁর বামদিকের গালে।

জয়রামের গায়ের বর্ণ হরনাথের বড় ভাই শিবনারায়ণের গায়ের বর্ণের মত ছিল অর্থাৎ তিনি হরনাথের অপেক্ষা কাল ছিলেন। তিনি উচ্চতায় মধ্যম আকারের ছিলেন—শিব মন্দিরের দরজা তাঁর মাথায় ঠেকিত না, ইহাতে অনুমান হয় তিনি উচ্চে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি ছিলেন, তিনি হরনাথ অপেক্ষা ৪ ইঞ্চি ছোট ছিলেন। হরনাথের উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি ছিল। তিনি কখন গোঁফ বা দাড়ি রাখেন নাই। মাথায় শিখা ছিল, মধ্যে মধ্যে কেবল শিখা রাখিয়া মস্তক মুণ্ডন করিতেন। খুব মোটা বা কৃশ ছিলেন না। শিবনারায়ণ বা হরনাথের ন্যায় দোহারা ছিলেন। ঠাকুর হরনাথ বাল্যকাল হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৃশ ছিলেন। ৫০ বৎসরের পর ঠাকুরের আকৃতি দোহারা হয়।

জয়রাম বিবাহের কয়েক মাস পূর্ব্বে পৈত্রিক ছয় কাঠা জমির উপর তিন খানি উলু খড় দিয়া ছাওয়া ঘর নির্ম্মাণ করেন। এই তিনখানি ঘরের মধ্যে একখানি ঘর দ্বিতল মাট কোঠা। এই মাট কোঠাটী উত্তর দ্বারী, একখানি ঘর পূর্ব্ব দ্বারী, আর একখানি ঘর দ্বিতল মাট কোঠার সম্মুখস্থিত দক্ষিণ দ্বারী এই ঘরখানি রান্নাঘররূপে ব্যবহৃত হইত। পরে আর একখানি ঘর নির্ম্মাণ করেন। এই ঘরখানি দক্ষিণ দ্বারী। এই ঘরে গরু থাকে—অর্থাৎ গোয়াল ঘর। আবশ্যক হইলে এই গোয়াল ঘর আঁতুড় ঘর স্বরূপে ব্যবহৃত হইত। এখন পর্য্যন্ত এই ঘরগুলি বিদ্যমান আছে অর্থাৎ উলু ইত্যাদির নানা প্রকারের পরিবর্ত্তন ঘটিলেও যে যে স্থানে ঘরগুলি ছিল এখনও ঘরগুলি সেই সেই স্থানেই আছে। শেষোক্ত গোয়াল ঘরখানিতে হরনাথের জন্ম হয়। পাগল হরনাথ এই ঘরের দাওয়ায় বা বারাণ্ডায় ভক্তগণ সমেত বসিয়া ১৯২৪ সালে ফটো তুলাইয়াছেন। জয়রাম ঘরগুলি নির্ম্মাণ করিয়া একজন কামিনদার বা ঝি বিমলি হাড়িণীকে রাখিয়া কলিকাতায় রওনা হন।

১২৫২ সালে জয়রামের মাতুলদের অবস্থা খারাপ হয়। মাতুলদিগের জমি জায়গা দ্বারিকেশ্বর নদী গ্রাস করাতে তাহাদের বিশেষ কষ্ট হয়, এই জন্য তিনি পাঁচ জন মাতুল পুত্রকে মাঝডোবায় বাস করান। তিনি মাঝডোবায় ১৭৯ বিঘা জমি নিজে খরিদ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রজাগণ নূতন খরিদদারকে খাজনা দিত না এই কারণে বলিষ্ঠ মাতুলপুত্রগণকে মাঝডোবায় জমি ও অর্থ সাহায্য করিয়া বাস করাইয়াছিলেন।

জয়রাম ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১২৪২ সালে ৩০ বৎসর বয়সে সোণামুখীর ব্রাহ্মণপাড়া নিবাসী উজ্জ্বল তর্কালঙ্কার বংশের কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর (কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের, রাজ উপাধি চক্রবর্ত্তী) কন্যা ভগবতী দেবীকে বিবাহ করেন।

উপরোক্ত চক্রবর্ত্তী বা চট্টোপাধ্যায় বংশের ইতিহাস খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। এ বংশে অনেক সাধক ও সিদ্ধ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিম্ন লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে জয়রামের বংশ যেমন প্রাচীন ভগবতীর বংশও সেইরূপ অতি প্রাচীন। দিলাকাশে কোন একজন কাপালিক ভৈরবী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি অমাবস্যায় এই ভৈরবী দেবীর সম্মুখে এক একটী ব্রাহ্মণ কুমারকে নরবলি প্রদত্ত হইত। ভুরিশ্রেষ্ঠপুরের অনার্য্য রাজগণ এই কাপালিকদিগের শিষ্য ও পরম ভক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণকুমারের যজ্ঞোপবীত না হইলে তাহাকে বলির জন্য গ্রহণ করা হইত না। প্রাচীনকালে

৭।৮ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মণ কুমারের যজ্ঞোপবীত হইত। এইরূপ বালকগণকে রাজাদের চণ্ডাল ডাকাতগণ চুরি করিয়া লইয়া যাইত। ৬৯৫ খ্রীঃ বনবিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ আদি মল্ল দ্বারা মল্ল রাজত্ব স্থাপনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ বালক অপহৃত হইত। কথিত আছে সোণামুখী নিবাসী নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পুত্রকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। পুত্রটী তার মাতার সহিত পুষ্করিণীতে পানীয় জল আনিতে গিয়াছিল, সেই সময় তস্করেরা যজ্ঞোপবীতধারী ৭ বৎসরের বালককে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। ইহাতে বালকের পিতা ও মাতা অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই নারায়ণ চক্রবর্ত্তী হরনাথের মাতুলবংশের পূর্ব্ব পুরুষের বংশধর। পাগল হরনাথের মাতা ভগবতী দেবীর বংশাবলীর পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মহেশ্বর চক্রবর্ত্তীর (চট্টোপাধ্যায়)—তিন পুত্র—মধ্যমের নাম লক্ষ্মীনাথ—তৎপুত্র বিষ্ণু—তৎপুত্র দিগম্বর—তৎপুত্র ধ্রুবানন্দ—তৎপুত্র শ্রীকণ্ঠ—তৎপুত্র—রঘু—তৎপুত্র অনিরুদ্ধ—তৎপুত্র কন্দর্প, তৎপুত্র বক্রেশ্বর, তৎপুত্র রামচন্দ্র (রাম চন্দ্রের স্থাপিত মন্দির আছে) তৎপুত্র রঘূত্তোম, রঘূত্তোমের দুই পুত্র—প্রথম পুত্র উমাকান্ত তর্কালঙ্কার (এই উপাধি বর্দ্ধমানের মহারাজার পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা প্রদত্ত) দ্বিতীয় পুত্রের নাম কার্ত্তিকচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রীর নাম দাসু ঠাকুরাণী, কার্ত্তিকচন্দ্রের—দুই পুত্র ও দুই কন্যা (১) প্রতাপচন্দ্র অপুত্রক। (২) কীর্ত্তিচন্দ্র—তৎপুত্র হরি, কালীকান্ত, নলিন ও কন্যা সত্যবালা (৩) কন্যা ভগবতী (পাগল হরনাথের মাতা) ও (৪) কন্যা কমলা।

ভগবতী দেবীর জেঠা উমাকান্ত সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন তিনি নানাস্থানে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ৩।৪ ঘণ্টা সংস্কৃতে কথা কহিতে পারিতেন। চারিদিকে তাঁর পাণ্ডিত্যের যশ প্রচারিত হইয়া পড়ে। সে সময় সোণামুখী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা বর্দ্ধমানাধিপতি তেজচন্দ্রের কর্ণে গিয়া পৌঁছে। তেজচন্দ্র বাহাদুর সাগ্রহে উমাকান্তকে তাঁর সভা পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। এই তেজচন্দ্র বাহাদুর ১৭৪৮ শকে (বঙ্গাব্দ ১২৩৪ সালে, ইংরাজি ১৮২৭—২৮ সালে) মহাতাপ চাঁদ বাহাদুরকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে তেজচন্দ্র বাহাদুর পরলোক গমন করিলে, রাজমহিষী কমলকুমারী দেওয়ানের সাহায্যে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১৭৬৫ শকে (বঙ্গাব্দ ১২৫০ সালে ইংরাজি ১৮৪৩—৪৪ সালে) রাজমহিষী কমলকুমারী মহাতাব চাঁদ বাহাদুরকে ২৩ বৎসর বয়সে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। এই

মহাতাব চাঁদ বাহাদুর পণ্ডিত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বে সমগ্র মহাভারতের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ১৮০১ শকে (বঙ্গাব্দ ১২৮৬ সালে ইংরাজি ১৮৭৯—৮০ সালে) ৫৯ বৎসর বয়সে মহাতাব চাঁদ বাহাদুর পরলোক গমন করেন, তাঁর পরলোক গমনের ১০ বৎসর পূর্ব্বে তর্কলঙ্কার উমাকান্ত অতি বৃদ্ধ বয়সে বর্দ্ধমানাধিপতির সভা পণ্ডিত পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। উমাকান্ত, তেজচন্দ্র ও মহাতাব চাঁদ বাহাদুরদ্বয়ের সভা পণ্ডিত ছিলেন। তর্কালঙ্কার উপাধি মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের আমলে প্রদত্ত হয়। তেজচন্দ্র বাহাদুর উমাকান্তের পাণ্ডিত্যে বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতের সঠিক মূল সংস্কৃত শ্লোকের বিশুদ্ধ বাংলা তরজমা, মহারাজ তেজচন্দ্র ও মহারাণী কমলকুমারী উমাকান্তের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইতেন। মহারাজা ও মহারাণী আন্তরিকভাবে উমাকান্তকে ভক্তি করিতেন। মহারাজ তেজচন্দ্র এই দুই গ্রন্থের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করেন। মহারাজ মহাতাব চাঁদ বাহাদুর আংশিকভাবে এই বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর উমাকান্তকে সভা পণ্ডিত নিয়োগের কিছুকাল পরে তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। গোঁফ, দাড়ী ও মাথার চুলের পারিপাট্য করিবার মহারাজের বিশেষ সখ ছিল, এই কারণে গোঁফ, দাড়ী ও মাথার কেশ না কামাইয়া শাস্ত্র মতে মাতার পারলৌকিক কার্য্য হইতে পারে কি না, সভা পণ্ডিত-গণের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। সভার পণ্ডিতগণ ক্ষৌরকার্য্য না করিয়া মাতার পারলৌকিক কার্য্য হইতে পারে এইরূপ মত দেন, একমাত্র পণ্ডিত উমাকান্ত এই বিষয়ের ঘোর প্রতিবাদ করেন। এই কার্য্য উপলক্ষে নানা দেশের বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাবেশ হয়। ক্ষৌরকার্য্যের পূর্ব্বদিনে এই বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য পুনরায় পণ্ডিতগণের এক সভা হয়—এই সভায় মহারাজা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত উমাকান্ত দুই ঘণ্টা কাল দেবভাষায় বক্তৃতা করেন ও নানা শাস্ত্র হইতে শ্লোক পড়িয়া শোনান। সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করেন যে এরূপ সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বঙ্গদেশে কেহ আছেন তাহা তাঁহারা জানিতেন না ও উমাকান্তের মস্তক মণ্ডনের যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য ব্যবস্থা নাই এই কথাই সকলে একবাক্যে বলেন। পণ্ডিত-মণ্ডলী পণ্ডিত উমাকান্তকে তর্কলঙ্কার উপাধি প্রদান করিবার অনুরোধ জানান। পণ্ডিত-মণ্ডলী মহারাজ বাহাদুরকে শাস্ত্র অনুসারে মস্তকের কেশমুণ্ডন করিতে

হইবে এই অনুরোধ জানাইলেন, আরও তাঁহারা বলেন যে তিনি মস্তক ইত্যাদির কেশ মুণ্ডন করিলে সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের ভিতর কোনকালে পিতা মাতার তিরোধানের সময় মস্তকের কেশ মুণ্ডনের সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না হয়, তাই বিশেষ বিচার করিয়া আমরা সকলে এই ব্যবস্থা দিলাম, অন্য ব্যবস্থা নাই জানিবেন। সূর্য্যবংশীয় রামচন্দ্রের উদাহরণ কোন সময়ে কাহার প্রতি ব্যবহার্য্য নহে জানিবেন। মহারাজ তেজচন্দ্র যুক্তকরে পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করেন ও পণ্ডিত উমাকান্তকে "উজ্জ্বল তর্কালঙ্কার শিরোমণি" উপাধি দিলেন বলিয়া ঘোষণা করেন। তৎপর দিন মহারাজ তেজচন্দ্র মস্তক ইত্যাদির কেশ মুণ্ডন করিয়া প্রথমে ১০০১৲ এক হাজার এক টাকা উমাকান্তের চরণতলে রাখিয়া প্রণাম করেন ও ২০০ দুই শত বিঘা নিষ্কর জমি দান করিলেন ঘোষণা করেন। অদ্যাপি এই নিষ্কর জমি তাঁর ও তাঁর ভ্রাতাদের বংশধরেরা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তিনি এই অর্থ ও জমির অর্দ্ধেক অংশ তাঁর ভ্রাতা কার্ত্তিকচন্দ্রকে (ঠাকুর হরনাথের মাতামহকে) দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় হরনাথ ও কুসুম কুমারীকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। ঠাকুর হরনাথের বিবাহের পর তাঁর মৃত্যু হয়। হরনাথ শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধ তর্কালঙ্কার মহাশয় হরনাথের সহিত শাস্ত্রের অনেক জটিল বিষয়ের আলোচনা করিতেন—হরনাথের এরূপ আলোচনা বিশেষ ভাল লাগিত—তাই তিনি প্রত্যহ মামার বাড়ীতে যাইতেন।

ভগবতী দেবীর আকৃতি খর্ব্বাকৃতি ছিল, গায়ের বর্ণ ঠাকুর হরনাথের ন্যায় ছিল, বৃদ্ধ বয়সেও বেশ চলিতে পারিতেন। কুসুমকুমারী দেবীর ন্যায়, ভগবতী দেবী লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু হিসাবে বিচক্ষণা ছিলেন। এমন কি হাজার টাকার হিসাবে ভুল হইত না। মজুত ধান কড়াইয়ের হিসাবে, কোন্ প্রজার নিকট কত প্রাপ্য বা কলিকাতার গালার আড়তের হিসাবে ভুল হইত না। তিনি কড়ি গণ্ডা গণ্ডা করিয়া হিসাব করিতেন।

সন ১২৭৫ সালের ৯ই পৌষ শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে দিবা বেলা ১৷৷০টার সময় জয়রাম ৬৩ বৎসর বয়সে সোণামুখী নিজ বাটীতে জ্বর ও পেটের অসুখে সজ্ঞানে মন্ত্রজপ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর শ্রাদ্ধ গঙ্গা-তীরে হয়। অর্থাভাবে পুষ্করিণীর বা যে কোন নদীর তীরে শ্রাদ্ধ হইলে—গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ হইয়াছে বলিয়া থাকে। ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি বাড়িতে হইয়াছিল। ভগবতী দেবী ঋণ না করিয়া খুব সাধারণ ভাবে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।

১২৭২ সালের বৈশাখী পূর্ণিমার দিন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও হরনাথের অন্নপ্রাশনে, জয়রাম যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা সমস্তই ব্যয় করিয়াছিলেন। স্বামীর পারলৌকিক কার্য্যাদি ভগবতী দেবী নিজেই করিয়াছিলেন, কারণ জয়রামের মৃত্যুর সময় কন্যা কমলার বয়স ৯ বৎসর, শিবনারায়ণের বয়স ৫।৭ মাস, হরনাথের বয়স ৩।৬ মাস ও কনিষ্ঠ কন্যা বগলার বয়স ১।১০ মাস মাত্র হইয়াছিল।

জয়রাম কলিকাতায় যে গালার আড়ত খুলিয়াছিলেন সেই আড়তের কাজ ভগবতী দেবী স্বামী বিয়োগের পর ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত চালাইয়াছিলেন। মানকর নিবাসী অম্বিকাচরণ রায় নামক এক ব্যক্তিকে জয়রাম কলিকাতার গালার আড়তে ধুনা গঙ্গাজল, গদিঘর পরিষ্কার ও তামাক সাজিবার জন্য পেটভাতায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, পরে তাহাকে গালার কাজ শিখান, অম্বিকাচরণ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন—অল্পদিনের মধ্যে গালার কাজ বেশ শিখিয়াছিলেন, জয়রামও ১২৭৩ সালের বৈশাখ মাসে নূতন আড়ত খুলিলে অম্বিকাচরণকে নিজ কারবে আনেন তখন তার মাসিক ৭৲ টাকা বেতন ছিল। জয়রামের তিরোধানের পর ভগবতী দেবী অম্বিকাচরণকে মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে বাহাল রাখেন; সে তাঁর তরফে কলিকাতার আড়তের কাজ দেখিত ও লক্ষ্মীনারাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সোণামুখীতে থাকিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বড়া গালা খরিদ করিত। এই লক্ষ্মীনারাণও জয়রামের আমলের লোক। ১৭ বৎসর কাজ করিবার পর অম্বিকাচরণ কলিকাতার গালার আড়ত হইতে বহু টাকা চুরি করিয়া পলাইয়া যায়; এইজন্য ভগবতী দেবীকে অনেক টাকার দায়িক হইতে হয়; ইহার কিছু পূর্ব্বে লক্ষ্মীনারাণ পরলোক গমন করে। এই দুই কারণে ভগবতী দেবী বাধ্য হইয়া আড়তের কাজ বন্ধ করেন। সে সময় শিবনারায়ণের বয়স ২৩ বৎসর ও হরনাথের বয়স ২০ বৎসর হইয়াছিল। দুই পুত্রই কাজের বাহির হইয়াছিলেন। শিবনারায়ণ ছিলেন আহ্লাদে গোপাল কেবল তাস পাশা খেলা করিয়া বেড়াইতেন, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখেন নাই ও হরনাথ ছিলেন উদাসীন, তখন কুচিয়াকোল স্কুল হইতে Entrance Ex: দিয়াছেন। কাজে কাজেই ভগবতী দেবী কাজ দেখিবার লোকের অভাবে গালার আড়তের কাজ ১২৯২ সালে ইংরাজি ১৮৮৬ সালে বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন তখন তাঁর ৬০ বৎসর বয়স হইয়াছিল; ভগবতী দেবী কাজ বন্ধ করিলে মানকর নিবাসী নিমু কুণ্ডু একা নিজ নামে গালার কাজ করিতেন। কলিকাতা

৪১নং বাঁশতলা লেনে পূর্ব্বে যেখানে আড়ত ছিল সেই স্থানেই নিমু কুণ্ডু আড়তের কাজ চালাইয়াছিলেন—এইস্থানে থাকিয়া হরনাথ দ্বিতীয় বার ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে City Collegeএ (সিটি কলেজে) বি, এ, প'ড়য়াছিলেন। এক বৎসর বাড়িতে বসিয়া থাকার পর দাদার তাড়নায় সন ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে হরনাথ ১২৮নং বারানসি ঘোষ ষ্ট্রীটে (Baranoshi Ghose St.) মেসে থাকিয়া সিটি কলেজে পড়েন। এই মেসের যে ঘরে থাকিতেন—সেই ঘরে তুইটা স্থান ছিল। হরনাথ একটি seatএ থাকিতেন অন্য seatএ সোণামুখীর মহেশচন্দ্র বন্দ্যোর পুত্র রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যো ছিলেন; রাধিকাপ্রসাদ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৬ সালে সোণামুখীর আনন্দ মিলনে উপস্থিত ছিলেন। এই মহেশচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী (ডাক নাম খুগি ঠাকুরাণী) হরনাথের ভিক্ষা বাপ ও মা ছিলেন; এই রাধিকাপ্রসাদ সেই সময় চোরবাগানস্থিত মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটস্থ আর্য্য মিসন ইনষ্টিটিসনের Entrance classএ পড়িতেন, এই সময় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পাগল হরনাথের সেবক ভাগবতচন্দ্রও রাধিকাপ্রসাদের সহিত ঐ ক্লাসে পড়িতেন; আর এই বৎসর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে শঙ্কর অবতার ভূতানন্দ স্বামীর সমীপে পাগল হরনাথের সহিত সেবক ভাগবতের পরিচয় হয়। আর্য্য মিশন স্কুলের স্বত্বাধিকারিদ্বয়ের নাম পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য (রাজযোগী) ও বড়বাজারের বিখ্যাত জগৎ শেঠের বংশধর কানাইলাল সেট। হেড মাষ্টার রামদয়াল মজুমদার, দক্ষিণেশ্বরের হরিপদ ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি ও ১৬৮নং অপার সার্কুলার রোডস্থিত হরনাথের সম্বোধিত দাদা নারায়ণচন্দ্র ঘোষ শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। পাগল হরনাথের সেবক ভাগবতই সর্ব্ব প্রথম ১৮৯২ সালে হরনাথের সহিত পরিচিত হন। তিন বৎসর পরে মহাত্মা অটলবিহারী নন্দী ১৮৯৫ সালে হরনাথের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। সেই সময় ঠাকুর হরনাথের বয়স ২৭ বৎসর মাত্র ও ভাগবতের বয়স ২০ বৎসর। সে সময় ভাগবত তাঁহাকে কি প্রকার দেখিয়াছিলেন ও তার কি প্রকার ধারণা হইয়াছিল এই সকল কথা বিশদভাবে হরনাথ জীবনীতে দ্রষ্টব্য।

ঠাকুর হরনাথের পূর্ব্বপুরুষ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জামবুনী গ্রাম হইতে সোণামুখী আসিয়া বাস করেন ও দৌহিত্র সূত্রে কমলকলতা দেবীর অবর্ত্তমানে কষ্ঠী পাথরের জাগ্রত বিগ্রহ শ্যামসুন্দরকে পাইয়াছিলেন। যজ্ঞেশ্বরের পুত্র রামমুরলী শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির সহিত পৃথক স্বর্ণ ধাতু নির্ম্মিত শ্রীমতী রাধার মূর্ত্তি ও উভয় মূর্ত্তির নিম্নে স্বর্ণ নির্ম্মিত পদ্মাসন যোজনা করেন। এই শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মূর্ত্তিই এই সময় হইতে বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের কুল দেবতা স্বরূপে পূজিত হইতেছেন।

যজ্ঞেশ্বরের বংশের কোন বাঁড়ুয্যের বাড়িতে অদ্যাবধি অন্য কোন প্রকারের মূর্ত্তি পূজা হওয়া নিষিদ্ধ—এইরূপ প্রবাদ চলিত আছে যে যদি কেহ অন্য কোনরূপ শক্তি মূর্ত্তি বা বিগ্রহ পূজা করেন তাহা হইলে তাহার বংশ লোপ হইবে। জয়রাম যে শিব স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার ভিতর গূঢ় কারণ নিহিত আছে। বালক হরনাথ এই ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ও সকলের নিষেধ অমান্য করিয়া সন ১২৮২ সালে (ইংরাজি ১৮৭৬ সালে) দশ বৎসর বয়সে তাঁর বড় ভাই শিবুর সহিত সরস্বতী দেবীর মৃন্ময় প্রতিমা মূর্ত্তির পূজার আরম্ভ করেন ও ১৩২২ সাল পর্য্যন্ত এই পূজা চলিয়াছিল। তিনি যে সময় কাশ্মীরে ছিলেন সে সময় শিবনারায়ণ এই পূজা করিতেন, পরে উভয় ভ্রাতারা ১৩২২ সালে (1916) পূজা বন্ধ করিয়া দেন।

জয়রাম গালার কাজে একজন অদ্বিতীয় বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। সেই সময় রালি ব্রাদার্স (Messrs Ralli Brothers), পিটরো কচিনো ব্রাদার্স (Messrs Petrocohino Brothers) ও মিসন রো স্থিত গালার হাটে (Shellac Mart of Mission Row) গালার কাজ খুব জোর চলিত। এই সকল ফারমের সাহেবগণ ও অন্যান্য মহাজনগণ গালার সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিবার জন্য জয়রামের নিকট আসিতেন। তিনি ছোট নাগপুর, হাজারিবাগ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জেলার বড়া গালা দেখিয়া তাহাতে মণ করা কত খাঁটি মাল জন্মাইবে ও কি প্রকার রং হইবে বলিয়া দিতেন। তিনি গালার সম্বন্ধে মতামত দিয়া কখনও কাহার নিকট হইতে এক পয়সা গ্রহণ করেন নাই। এই বড়া গালা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ভগবতী দেবীরও জ্ঞান কিছু কম ছিল না—বরং ভগবতী দেবীর জ্ঞান অতি প্রখর ছিল, অনেক সময় জয়রামকে তাঁর জীবিতকালে বড়া গালা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ভগবতী দেবীর নিকট পরাস্ত হইতে হইয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ জয়রাম যখন কলিকাতায় থাকিতেন তখন গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লক্ষ্মীনারাণ বন্দ্যোর দ্বারা আনিত বড়া গালার নমুনা দেখিয়া কোনটা খরিদ করিবেন তাহা ভগবতী দেবী করিতেন। শিব মন্দিরের সম্মুখে যে সাবেক ইটের বাড়ী আছে,এই স্থানে জমি খরিদ হইলে পর ছোট ছোট দুইটী ইটের দালান বা গুদাম ঘর করাইয়াছিলেন। এই ঘর দুইটী পরে ভাঙ্গিয়া ভগবতী দেবী দ্বিতল বসত বাটী নির্ম্মাণ করান। প্রচুর মাল জমিলে কলিকাতায় গরুর গাড়িতে করিয়া স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন। জয়রাম যখন নফরচন্দ্রের কাজ করেন তখনও এই খরিদের তার ও কলিকাতায় পাঠান ব্যবস্থা ভগবতী দেবী করিতেন। ১২৭১।১২৭২ সালে নফরচন্দ্রের পুত্রগণ

এই বিষয়ে অযথা প্রতিবন্ধক হওয়াতে ও তাঁহাদের দ্বারা বড়া গালা খরিদের দোষ বাহির হওয়াতে জয়রাম বিরক্ত হইয়া পৃথক ফারম খুলেন। জয়রামের অবর্ত্তমানে অন্য অংশীদার থাকিলেও ভগবতী দেবী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন; কারণ তিনিই গালার কাজ বুঝিতেন। ভগবতী প্রত্যহ রাণীর বাঁধের গালার কারখানা দেখিতে যাইতেন। গালা তৈয়ারী করা কারিগরদিগকে কত রজন মিশাইতে হবে, কি প্রকার জাল দিতে হবে আদেশ করিতেন।

গালার কারখানা—একটী লম্বা চালা ঘর, সেই ঘরের মধ্যে ৭।৮টা লম্বা অগ্নি স্থান থাকিত, লম্বা জিনের থলিতে বড়া গালা ও রজন পূর্ণ করিয়া, থলিগুলির এক মুখ খোটায় বাঁধিয়া অন্য মুখ পাক দিলে—অগ্নির উত্তাপে কলা পাতের উপর টপ্ টপ্ করিয়া গলিত গালা পড়ে। এক একটা থলি ১৫।১৬ হাত লম্বা হয়। প্রতি অগ্নি স্থানে দুই মণ আড়াই মণ গালা তৈয়ারী হয়। এমন ভাবে প্রত্যহ ১৫।১৬ মণ গালা, কারখানা হইতে আসিত। সোণামুখীর কারখানা হইতে গালা আনা ও কলিকাতায় পাঠান জন্য ভগবতী দেবীর দুইখানি গরুর গাড়ি ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পুরুষ ও শ্যামসুন্দর।

ঠাকুর হরনাথের (১০ম পরিচয়ের) পূর্ব্ব পুরুষ মকরন্দ বন্দ্যোর পুত্র (১১শ) দাশরথি (দাশো) কাঁটাদিয়া গিয়া বাস করেন তাহা হইতে দাশরথীর বংশীয়গণ কাঁটাদিয়া বন্দ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। এই জন্য বসতি স্থানানুসারে—কাঁটাদিয়া সমাজ নাম হইয়াছে। উপস্থিত কাঁটাদিয়া গ্রামে দাশরথী বন্দ্যোর বংশধরের কাহারও বাস নাই। মুসলমানদিগের অত্যাচারে ১৯ ঊনবিংশতি পর্য্যায়ের ভবানন্দ, সুবানন্দ, শ্রীগর্ভ, কেশব, মাধব, শ্রীনাথ, বাসুদেব, কৃষ্ণানন্দ, কমল ইত্যাদি রাঢ়ের হরিণাকুণ্ড, ফুলিয়া, খড়দহ ইত্যাদি নানা স্থানে আসিয়া বাস করেন—এইজন্য ইঁহাদের হরিণাকুণ্ড সমাজ হয়। কিন্তু সকলেই কাঁটাদিয়া সমাজ নামে খ্যাত আছেন ও এই সমাজের নামই উল্লেখ করেন।

গোপীনাথ বন্যব্যাঘ্র চাপিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াতেন—এমন কি গ্রামের মধ্যেও আসিতেন ; কেহ কেহ বলেন বীরভূম জেলায় একজন মুসলমান ফকির ছিল, তিনি বন্যব্যাঘ্র চাপিয়া বেড়াইতেন। এই মুসলমান ফকির গুরুকে পরীক্ষা করিবার জন্য একটী থালায় গোমাংস বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া গুরুর সম্মুখে রাখেন—গোপীনাথ বস্ত্রাবরণ উন্মুক্ত করাতে দেখা যায় যে একথালা রক্তকম্বল ফুল হইয়াছে। গোপীনাথ ১৩২ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

পাগল হরনাথের (২৮) পর্য্যায় হইতে বংশধরগণকে গোপীনাথের সন্তান বলিয়া থাকে। ইহার কারণ ২৬ পর্য্যায়ের রাঘব পাঠক চক্রবর্ত্তীর পুত্র (২৭) পর্য্যায়ের গোপীনাথ একজন অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ঋষি তুল্য মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে বোবা ঋষি গোপীনাথ বলিত, বোবা হইলে বধির হয়, কিন্তু তিনি শুনিতে পাইতেন। জন্মাবধি কথা কহেন নাই। বংশের কোন বিখ্যাত ব্যক্তির নামে পরবর্ত্তী বংশধরেরা তাঁহার সন্তান বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

(২৭) পর্য্যায়ের গোপীনাথের চারিটী পুত্রের মধ্যে দুইটী পুত্র রাজারাম ও রামেশ্বর ও বর্ত্তমান গোপীনাথপুর নিবাসী অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় বংশীয় বৈষ্ণব চরণ সিদ্ধান্তরত্ন গোস্বামী মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষগণ ও অন্যান্য অনেক রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির দ্বারা ১৬শ শতাব্দির শেষভাগে আনিত হইয়াছিলেন। প্রথমে এই সকল ব্রাহ্মণগণ কোটালপুর সন্নিকট লাওগ্রামে বাস করিয়াছিলেন, পরে নিত্যানন্দপুর, অযোধ্যা, জামবুনী ইত্যাদি স্থানে গিয়া বাস করেন। (২৮ পরিচয়ের) রাজারামের পৌত্র ৩০শ পরিচয়ের জয়চন্দ্র নিত্যানন্দপুরে গিয়া বাস করেন। এই ৩০শ পরিচয়ের জয়চন্দ্রের প্রপৌত্র ৩৩শ পরিচয়ের হরি অযোধ্যায় গিয়া বাস করেন। এই হরির বংশে অযোধ্যার বিখ্যাত জমিদার রায় বাহাদুর গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত অযোধ্যা ইংরাজি হাই স্কুলের শিক্ষকরূপে হরনাথ অক্টোবর ১৮৯২খ্রী হইতে জুলাই ১৮৯৩খ্রীঃ পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

২৮ পর্য্যায়ের রাজারামের কনিষ্ঠ সহোদর রামেশ্বর প্রথমে লাওগ্রামে বাস করিয়াছিলেন—লাওগ্রামে অন্য রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস না থাকাতে, রামেশ্বরের পৌত্র গঙ্গাধর অযোধ্যায় গিয়া বাস করেন। গঙ্গাধরের পুত্র ৩১শ পরিচয়ের পৃথ্বীধর জামবুনীতে গিয়া বাস করেন পৃথ্বীধরের জামবুনীতে বসবাস কালীন তাঁর পুত্র ৩২শ পরিচয়ের সীতানাথের বিবাহ দেন। অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় গোস্বামীগণের জামবুনীতে বসবাস কালীন তাঁহাদের বংশের বিষ্ণুচরণ গোস্বামীর

এক মাত্র কন্যা অলৌকিক গুণসম্পন্না কণকলতা ঠাকুরাণী জন্মগ্রহণ করেন। এই গোস্বামী বংশ বসুধা জাহ্নবীর পরিবার। জামবুনী নিবাসী মাধব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র লক্ষণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত কণকলতা দেবীর বিবাহ হয়। কণকলতা ঠাকুরাণীর কেবল দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম নিস্তারিণী ও কনিষ্ঠার নাম অভয়া। এই জ্যেষ্ঠা কন্যা নিস্তারিণীর সহিত বন্দ্যো। পৃথ্বীধরের পুত্র সীতানাথের বিবাহ হয় ও কনিষ্ঠা কন্যা অভয়ার সহিত বাঁকুড়া জেলার পুরলিয়া গ্রাম নিবাসী দীননাথ গোস্বামীর বিবাহ হইয়াছিল।

এই গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় গোস্বামী বংশ ৩৫শ পরিচয়ের কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের কুল গুরু হন। অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় বংশের গোস্বামী উপাধি লাভের বিবরণ দেওয়া হইল।

বীরভূম জেলার একচক্র গ্রামের ব্রাহ্মণ সুন্দরামল্ল বাড়ুরীর পুত্র হাড়াই (হরাই) ওঝার (পণ্ডিতের) ঔরসে ও পদ্মাবতী দেবীর গর্ভে ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নানাবিধ পথ দেখাইবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে হইলে সন্ন্যাসী হইতেই হইবে এই সংশয় দূর করাইবার জন্য বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বিবাহ করিতে আদেশ করেন। নিত্যানন্দ প্রভু এই আদেশ পাইয়া মহাপ্রভুর উপর মনে মনে বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন, তিনি সিদ্ধান্ত করেন কুলীন ব্রাহ্মণগণের ন্যায় বহু বিবাহ করিবেন কিন্তু দুইটী বিবাহ করিবার পর বহু বিবাহ করিবার বাসনা ত্যাগ করেন। নিত্যানন্দ প্রভুর একটী পৃথকগণ, সেবক বা শিষ্যের দল ছিল। এই শিষ্যদিগের মধ্যে শিবানন্দ, রামদাস, গদাধর দাস, রঘুনাথ বেজ ওঝা, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পণ্ডিত সূর্য্যদাস ইত্যাদি বহু সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। নবদ্বীপের নিকটস্থ শালিগ্রামের পণ্ডিত সূর্য্যদাসের অনুরোধে তাঁর দুইটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন—জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম বসুধা কনিষ্ঠার নাম জাহ্নবী। কন্যাদিগের পিতা পণ্ডিত সূর্য্যদাস—তাঁর স্ত্রীর ও কন্যাদের অমতে জোর করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের পর নিত্যানন্দ প্রভু বীরভূম জেলার একচক্র গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক খড়দহ গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। জাহ্নবীর গর্ভে ইহাঁর ৮টী পুত্র ও ১টী কন্যা জন্মে। ৭টী পুত্র বিবাহ পূর্ব্বে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র ও কন্যা গঙ্গা জীবিত ছিলেন। কাহার কাহার মতে গঙ্গা বসুধার কন্যা—ইহার মীমাংসা হয় নাই, এইজন্য কন্যা গঙ্গার গর্ভজাত বংশধরেরা বলাগড়ের গোস্বামী বংশ

বসুধা জাহ্নবী পরিবার বলিয়া খ্যাত। খড়দহের গোস্বামীগণ বীরভদ্রের বংশধর। বসুধা অতি নম্র প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন, মুখে কথা বাহির হইত না আর জাহ্নবী খণ্ডিতা ধাতের স্ত্রীলোক ছিলেন। জাহ্নবীর অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা সেবাদাসী ছিলেন, দিবা বেলা ১২টার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতেন না, অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতেন, তৈলমর্দ্দন, বস্ত্র পরিবর্ত্তন, স্নান, ইত্যাদি সকল প্রকারের সেবাকার্য্য দাসীরা করিত। তাঁর মেজাজ ভীষণ কড়া ছিল, মধ্যে মধ্যে তাঁর স্বামী নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রহার করিতে ছাড়িতেন না। নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোধানের পূর্ব্বে বসুধা গত হন, আর জাহ্নবী দেবী নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোধানের পর বহু বৎসর জীবিতা ছিলেন। জাহ্নবী দেবীই তাঁর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বৈষ্ণব সমাজের একমাত্র চালক বা কর্ত্রী হইয়াছিলেন। তাঁর কথায় বৈষ্ণব সমাজ উঠিত ও বসিত। তিনি বহু সম্পত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন—তিনিই ভেট ও প্রণামির ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। তিনি একবার একচক্রায় গিয়াছিলেন ও দুইবার বৃন্দাবনে যান। তিনিই দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে গিয়া মদনমোহনের বামে রাধিকামূর্ত্তি স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীনিমাই পণ্ডিতের টোলের পড়ুয়া মাধব চট্টোপাধ্যায়ের সহিত নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গা দেবীর বিবাহ হয়। মাধবের পিতার নাম জানিবার উপায় নাই। তিনি শক্তি উপাসক ছিলেন, চণ্ডীর গান করিতেন, সদ্বক্তা ও বিদ্বান ছিলেন; লোকে তাঁকে আচার্য্য বলিত। তিনিই সর্ব্ব প্রথম গোস্বামী উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর বংশধরেরা চট্টোপাধ্যায় গোস্বামী বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। বিদ্যায় বৃহস্পতি তুল্য ব্যক্তিকে তখনকার দিনে গোস্বামী বলিত. ইহা উপাধিবিশেষ ছিল যেমন ন্যায়রত্ন, তর্কালঙ্কার ইত্যাদি। গোস্বামী বলিয়া ব্রাহ্মণের কোন গাঞি নাই। মাধবের চট্ট বা চাটুতি গাঞি ঠিক ছিল। এইজন্য ঠাকুর হরনাথের কুলগুরু বংশধরেরা অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় গোস্বামী বলিয়া পরিচিত। আবসথী বা অবসথী অর্থ চট্ট গাঞি পুত্র (১০ পঃ) সর্ব্বেশ্বর যজ্ঞের আবসথ বা অগ্নিশালা রক্ষা করিতেন বলিয়া আবসথী বা অবসথী নামে বিখ্যাত হন। ঠাকুর হরনাথের কুলগুরু বংশধরগণ এই অবসথী (১০ পঃ) সর্ব্বেশ্বর চট্টর বংশধর। মাধব চট্ট এই সর্ব্বেশ্বরের বংশধর। এই বংশটী পরে অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সন্তান বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র তাঁর ভগ্নিপতি মাধবকে গোস্বামী উপাধি গ্রহণ করিতে দেখিয়া তিনিও গোস্বামী উপাধি গ্রহণ করেন, কিন্তু নিত্যানন্দের গাঞি ঠিক ছিল না বলিয়া বীরভদ্রের বংশধরেরা কেবল গোস্বামী

বলিয়া থাকেন। গোস্বামী অর্থ বেদবিদ্যায় বৃহস্পতি। রূপ, সনাতন, জীব ইত্যাদি মহাত্মাগণ বিদ্যায় অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া গোস্বামী নামে অভিহিত হইয়াছেন। এখন গোস্বামী বংশের সন্তানগণ সকলেই গোস্বামী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই গোস্বামী উপাধি বংশগত হইয়াছে।

পাগল হরনাথের বংশের ৩২শ পরিচয়ের সীতানাথ ও তাঁর সহধর্ম্মিণী নিস্তারিণীর (কণকলতা ঠাকুরাণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা) পুত্র যজ্ঞেশ্বর। সোণামুখীর চট্টোপাধ্যায় পাড়া নিবাসী কুমুদ বন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের দুই কন্যা লক্ষ্মী ও কমলার মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা লক্ষ্মীর সহিত ৩৩শ পরিচয়ের যজ্ঞেশ্বরের বিবাহ হয়, পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে। কুমুদবন্ধুর পুত্র সন্তান না থাকাতে যজ্ঞেশ্বর জামবুনী হইতে সোণামুখী শ্বশুরালয়ে আসিয়া বাস করেন। কুমুদ বন্ধুর তিরোধানের পর যজ্ঞেশ্বরের পুত্র রামমুরলী, মাতামহের চাটুয্যে পাড়ার জমি ও পুষ্করিণী ইত্যাদিতে সমস্ত সম্পত্তি আন্দাজ ১৩০ বিঘা জমির মধ্যে অর্দ্ধেক পাইয়াছিলেন। এই ৩৪শ পরিচয়ের রাম, পাগল হরনাথের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ, ইহাঁরি পুত্র ৩৫শ পরিচয়ের কুঞ্জবিহারী তৎপুত্র ৩৬শ পরিচয়ের মদনগোপাল—তৎপুত্র ৩৭শ পরিচয়ের শ্রীকান্ত। এই শ্রীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই বিবাহ। রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতামহ কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের অর্দ্ধেক সম্পত্তি পাইয়াছিলেন বলিয়া চাটুয্যে পাড়ার (যে পাড়ায় উপস্থিত পাগল হরনাথের বাস) বাড়ুয্যেরা চট্টোপাধ্যায় বংশের দৌহিত্র সন্তান বলিয়া খ্যাত। বর্ত্তমান সময়ে চাটুয্যে বংশ লোপ হইয়াছে।

পাগল হরনাথের পিতামহ শ্রীকান্ত খৃষ্টাব্দে ১৭৫৯ সালে (বঙ্গাব্দা ১১৬৬ ও শকাব্দা ১৬৮০) সোণামুখীতে জন্মগ্রহণ করেন ও খৃঃ ১৮২০ সালে (বঙ্গাব্দা ১২২৭ ও শকাব্দা ১৭৪১) সোণামুখীতে মৃত্যু হয়। শ্রীকান্ত ৪২ বৎসর বয়সে বিবাহ রাত্রে বিবাহ ভণ্ডুল হওয়ায় কন্যার পিতাকে বিপন্মুক্ত করিতে বাধ্য হইয়া ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুরহর বংশের বেলিয়াড়া গ্রামবাসী হরিশরণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা আদরমণিকে বিবাহ করেন। আদরমণির গর্ভে ৫ই বৈশাখ ১২১২ সালে জয়রাম সোণামুখীতে জন্মগ্রহণ করেন।

যে দিন জয়রাম জন্ম গ্রহণ করেন সেই দিন শ্যামসুন্দর লইয়া চারি বৎসরের মামলার চরম সিদ্ধান্ত হয়। বর্দ্ধমানের পণ্ডিত আদালত এই রায় দেন যে কুঞ্জবিহারীর বংশধরগণ কণকলতা দেবীর শ্যামসুন্দর পূজা করিতে পারিবেন। এই পণ্ডিত আদালতের সহিত বর্দ্ধমানের রাজাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। সোণামুখী সে সময়ে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল—বর্দ্ধমান সহর জেলার সদর ছিল। হিন্দু বা

মুসলমানদের কোন ধর্ম্ম বিষয়ের বিচার করিবার সময় চারিজন হিন্দু পণ্ডিত বা চারিজন মুসলমান কাজী জজ সাহেবের সহিত বসিতেন; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের লাট সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দা ১১৯৯ সাল) এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ এই শ্যামসুন্দরের মামলা রুজু হইবার ৯ বৎসর পূর্ব্বে এই আইনের প্রচলন হইয়াছিল। এক্ষেত্রে হিন্দুর ঠাকুর শ্যামসুন্দর লইয়া বিচারের জন্য চারিজন পণ্ডিত বসিয়াছিলেন। বৎসরে দুইবার মাত্র এই আদালত বসিত। সে সময় পুলিস ষ্টেসনকে চৌকি বলিত, ইহা হইতে চৌকিদার শব্দের উৎপত্তি। সোণামুখী সে সময় বুদবুদ চৌকির অধীন ছিল; এইরূপ ১০। ১২টী চৌকি, অপেক্ষকৃত বড় চৌকির অধীন ছিল; এই সকল বড় চৌকি বর্দ্ধমানের সর্ব্বপ্রধান চৌকির অধীন ছিল। বর্দ্ধমান প্রধান চৌকির সর্ব্বময় কর্ত্তা সে সময়ে ২৫৲ টাকা বেতন পাইতেন; ইহারাই তখনকার দিনের বড়চাকুরিয়া ও মহামাননীয় বলিয়া গণ্য হইত। সে সময় মুন্সেফগণের বেতন ছিল না, কেবল কমিসন পাইতেন। বর্দ্ধমান চৌকির কর্ত্তা, পণ্ডিত বা কাজীগণকে আনাইতেন, তাহাদের বাসা ও পাথেয়র বন্দোবস্ত করিতেন। এই শ্যামসুন্দর লইয়া মামলার রায় দিবার পূর্ব্বে জজ সাহেব দুইজন পণ্ডিতকে সোণামুখীতে প্রেরণ করেন—উদ্দেশ্য ঠাকুরের স্বর্ণ পাদপদ্মের নিম্নে কাহার কাহার নাম লেখা আছে দেখিবার জন্য। এই কথা প্রতিবাদী (৩৫ পঃ) কুঞ্জবিহারীর কনিষ্ঠ সহোদর গোকুলচাঁদের বংশধরেরা বলেন। এই মামলার বাদী ছিলেন মদনগোপালের পুত্র (৩৭ পরিচয়ের) শ্রীকান্ত (হরনাথের পিতামহ) ও (৩৬পঃ) রামানন্দের পুত্র (৩৭প) রুক্মিণীকান্ত, কালীকান্ত, রমাকান্ত, যাদবেন্দ্র, গোপীকান্ত ও নফরচন্দ্র। ইহারা সকলেই যজ্ঞেশ্বরের বংশধর (যিনি কনকলতা দেবীর দৌহিত্র); জজ সাহেব হুকুম দেন বাদী ও প্রতিবাদীগণ কেহই আদালত ত্যাগ করিবেন না, তাঁহারা পণ্ডিতগণের সঙ্গে সোণামুখী যাইবেন। কিন্তু প্রতিবাদী (৩৭ পঃ) ঠাকুরদাস ও শঙ্করজ (৩৮) হারাধন, (৩৮) রামচাঁদ ও (৩৮) দামোদর যাঁহারা শ্যামসুন্দরের পূজা বন্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশেষ চতুর লোক ছিলেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ অন্য একজন লোককে সোণামুখী পাঠান ও সোণামুখীর ধুলাই কামার দ্বারা স্বর্ণ পাদপদ্মের নিম্নে তাঁহাদের নিজের ও পূর্ব্বপুরুষের নাম লেখাইবার জন্য বলিয়া দেন। গত চারি বৎসর হারাধন ও রামকানাই দিগের বাড়ীতে শ্যামসুন্দর ছিলেন—এইজন্য এই লোকটি সোণামুখী পৌছিয়া রাত্রে ধুলাই কামার দ্বারা নিম্নলিখিত নাম লেখাইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির স্বর্ণপাদপদ্মের নীচে—ঠাকুরদাস, রামকানাই, দুর্ল্লভ, হারাধন বন্দ্যো, দামোদর লেখান হইয়াছিল।

শ্রীমতী রাধিকার (পৃথক স্বর্ণ মূর্ত্তির) স্বর্ণ পাদপদ্মের নীচে—শ্রীদাম বন্দ্যো, রামচাঁদ, পূর্ণানন্দ লেখান হইয়াছিল।

তৎপর দিন পণ্ডিতগণের সহিত বাদী ও প্রতিবাদীগণ সোণামুখী আসিয়া পৌছান। পণ্ডিতগণ নাম খোদাই দেখিলেন ও নূতন লেখা বুঝিতে বাকি রহিল না। যজ্ঞেশ্বর যে এই বিগ্রহ পাইয়াছিলেন জানিতে পারেন ও যজ্ঞেশ্বরের পুত্র রামমুরলী যে শ্রীমতীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাও অবগত হন। পণ্ডিতগণ বর্দ্ধমানে ফিরিয়া গিয়া কুঞ্জবিহারীর বংশধরেরাও বিগ্রহ পাইবেন—এই রায় দেন।

যেদিন এই সংবাদ সোণামুখীতে পৌছায় সেই দিন জয়রাম জন্মগ্রহণ করেন এই জন্য পুত্রের নাম জয়রাম রাখা হইয়াছিল।

১২৩১ সালে অর্থাৎ জয়রামের বিবাহের ১০ বৎসর পূর্ব্বে রামানন্দের তৃতীয় স্ত্রীর পুত্র যাদবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির স্বর্ণপাদপদ্মের নিম্নে "রামানন্দ—সন ১২৩১ সাল" লেখাইয়াছিলেন। এই সকল খোদিত নামগুলি অদ্যাপি বিগ্রহের নিম্নে বর্ত্তমান আছে।

এই মামলার রায় বাহির হইয়াছিল ১২১২ সালে (ইং ১৮০৬ খৃীষ্টাব্দে) ইহার আপিল কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে (Calcutta Supreme Court) হয় নাই। তখন বিলাতের Privy Councilএর সৃষ্টি হয় নাই। অতএব 1806 AD. বিলাতের Privy Councilএ এই মামলার আপিল হইয়াছিল যাঁহারা বলেন বা বলিয়াছেন তাঁহারা কেন ভ্রমে পড়িয়াছেন—জানি না। অসত্য বিষয়ের কল্পনা করিয়া স্বীয় স্বীয় ধারণা মত কোন মহাপুরুষকে ঈশ্বর প্রমাণ করিতে গিয়া অনেক মিথ্যা ঘটনার যোজনা করিতে হয়। ইহাতে মহাপুরুষের প্রকৃত জীবন চরিত ঢাকা পড়িয়া যায়। পাগল হরনাথের জীবনীতে এরূপ অসত্য ঘটনার যোজনা বাংলা দেশে বহুলভাবে চলিয়াছে—অধিকন্তু মাদ্রাজ আন্ধ্রা প্রদেশেও অদ্ভূত রকমের গল্পের স্রোত প্রবলবেগে চলিয়াছে।

যে কামার নাম লিখিয়াছিল সে সেই রাত্রে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। প্রতিবাদী শ্রীদাম, হারাধন ও রামকানাই দিগের অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সন্ধান করিতে পারি নাই। নিম্নলিখিত বংশাবলী দ্রষ্টব্য। সোণামুখীর শাণ্ডিল্য গোত্রায় বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত

প্রাচীন ভদ্র মহোদয়গণের নিকট অবগত হইয়াছি যে তাঁহাদের বংশ লোপ পাইয়াছে। ধুলাই কুমারের বংশেরও কোন সন্ধান পাই নাই।

ঠাকুর হরনাথের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ (৩৪ পঃ) রামমুরলীর চারি পুত্র (১ম পুত্র) কুঞ্জবিহারী (৩৫), (২য় পুত্র) লালবিহারী (৩৫) নিঃসন্তান, (৩য় পুত্র) নরসিংহ (৩৫) নিঃসন্তান ও (৪র্থ পুত্র) গোকুলচাঁদ।

(৩৫) কুঞ্জবিহারীর সর্ব্ব কনিষ্ঠ সহোদর গোকুলচাঁদের বংশধরগণ এই মামলার প্রতিবাদী ছিলেন।

(৩৫) কুঞ্জবিহারীর কনিষ্ঠ সহোদর (৩৫) গোকুলচাঁদের দুই পুত্র, প্রথম পুত্র (৩৬) গৌরীকান্ত ও দ্বিতীয় পুত্র রামকান্ত (৩৬)।

গৌরীকান্তের (৩৬ পঃ) চারি পুত্র (১ম) উচ্ছবানন্দ (৩৭), (২য়) পূর্ণানন্দ (৩য়) শঙ্কর ও (৪র্থ) গদাধর।

(১ম) উচ্ছবানন্দ (৩৭) তৎপুত্র দুর্ল্লভ (৩৮) তৎপুত্র রামজীবন (৩৯) তৎপুত্র শ্রীনাথ (৪০), দ্বারিকা (৪০) ও রামনাথ (৪০)।

(২য়) পূর্ণানন্দ (৩৭) তৎপুত্র ক্ষুদিরাম (৩৮)।

(৩য়) শঙ্কর (৩৭) তৎপুত্র শ্রীদাম (৩৮) হারাধন, রামকানাই (৩৮), রামচাঁদ (৩৮) ও দামোদর (৩৮)।

(৩৮) রামচাঁদের পুত্র বৈকুণ্ঠ (৩৯) ও হৃদয় (৩৯) তৎপুত্র বনবিহারী (৪০), অনঙ্গ (৪০) ও বঙ্কিম (৪০)।

(৩৮) দামোদরের পুত্র বিশ্বম্ভর (৩৯) তৎপুত্র নবকৃষ্ণ (৪০) তৎপুত্র দোলগোবিন্দ (৪০)।

(৪র্থ) গদাধর (৩৭)—তৎপুত্র হলধর (৩৮) তৎপুত্র ঈশান (৩৯) ও শ্রীরাম (৩৯)।

উপরোক্ত পূর্ণানন্দ (৩৭), উচ্ছবানন্দের (৩৭) পুত্র দুর্ল্লভ, শঙ্করের (৩৭) পুত্র শ্রীদাম (৩৮) হারাধন (৩৮) (৩৮) রামকানাই, রামচাঁদ (৩৮) ও দামোদর (৩৮) ইহারাই এই শ্যামসুন্দরের মামলার প্রতিবাদী ছিলেন।

রামকান্তের (৩৬ পঃ) দুই পুত্র—প্রথম পুত্র গুরুচরণ (৩৭) ও দ্বিতীয় পুত্র ঠাকুরদাস (৩৭)।

(১ম) গুরুচরণের দুই পুত্র (১ম) সীতানাথ ও (২য়) রঘুনাথ তৎপুত্র রামপ্রসাদ (৩৯) তৎপুত্র শিবু (৪০)।

সীতানাথের (৩৮) তিন পুত্র (১ম) কৃষ্ণ (২৯) তৎপুত্র রামগতি (৪০) (২য়) চন্দ্র (৩৯) তৎপুত্র ক্ষুদিরাম (৪০) (৩য়) রমণ (৩৮)।

(২য়) ঠাকুরদাস (৩৭) ইহার দুই পুত্র (১ম) গঙ্গানারায়ণ ও (২য়) লক্ষ্মীনারায়ণ

(১ম) গঙ্গানারায়ণের (৩৮) পাঁচ পুত্র—(১ম) রামবিষ্ণু (৩৯) তৎপুত্র কালীপদ, (২য়) কেশব (৩৯) তৎপুত্র অজিত, (৩য়) ক্ষুদিরাম (৩৯) তৎপুত্র শুহিরাম (৪০) ও বিজয় (৪০) তৎপুত্র হাবলা (৪১), (৪র্থ) তিনকড়ি—ইহার চারি পুত্র (১ম) নিরঞ্জন তৎপুত্র সুধা, (২য়) কানাই (৪০) (৩য়) শ্রীরাম (৪০) ও (৪র্থ) শান্তিরাম।

এই গঙ্গানারায়ণের বাড়ীতে শিবনারায়ণ ও হরনাথ সন্ধ্যার সময় পড়িতে যাইতেন ও ইহার বাড়ীর উত্তর পশ্চিম কোণে মহাপুরুষের সহিত দেখা হয়।

(২য়) লক্ষ্মীনারায়ণ—ইহার চারি পুত্র (১ম) রামপদ (৩৯) তৎপুত্র শম্ভুনাথ তৎপুত্র জানকী (২য়) রামনিধি তৎকন্যা কালীমতি তৎপুত্র ব্যোমকেশ, (৩য়) রামময় (৩৯) তৎপুত্র সত্য (৪০), গণেশ (৪০) ও শ্যাম (৪০) ও (৪র্থ) রামকিশোর তৎপুত্র বুদ্ধদেব (৪০)।

উপরোক্ত ঠাকুরদাসের (৩৭) নাম, তাঁর বিনা অনুমতিতে, প্রতিবাদীরা পাদপদ্মের নিম্নে লেখাইয়াছিলেন, ইহা পরে প্রকাশ হইয়াছিল।

নিম্নে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের পালার তালিকা দেওয়া হইল—এই তালিকা ১৩৪২ সালে সংগৃহীত।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয়

সোণামুখীর যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের শ্যামসুন্দরের

পালাক্রমে পূজা ও সেবার

বিবরণ।

বঙ্গাব্দা ১৩৪২ সালে সংগৃহীত

খ্রীষ্টিয় ১৯৩৫ সাল।

(১) ৺দর্পনারায়ণ বন্দ্যোর ভাগিনা

শ্রীবিকর্ত্তন মুখোপাধ্যায় — ১লা চৈত্র হইতে ৪ঠা বৈশাখ

(২) ৺ত্রৈলোক্য বন্দ্যো দিং — ৫ই বৈশাখ হইতে ২৬শে বৈশাখ

(৩)	শ্রীগোকুলচন্দ্র বন্দ্যো (হরনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র)	২৭শে বৈশাখ হইতে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ
(৪)	শ্রীঅনুকুলচন্দ্র বন্দ্যো (হরনাথের পুত্র)	১৪ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ৩২শে জ্যৈষ্ঠ
(৫)	শ্রীমৃগেন্দ্র বন্দ্যো দিং	১লা আষাঢ় হইতে ১৫ই আষাঢ়
(৬)	শ্রীবষিরাম বন্দ্যো	১৬ই আষাঢ় হইতে ৩২শে আষাঢ়
(৭)	শ্রীরামময় বন্দ্যো	১লা শ্রাবণ হইতে ১৫ই শ্রাবণ
(৮)	শ্রীবঙ্কিম বন্দ্যো	১৬ই শ্রাবণ হইতে ৩০শে শ্রাবণ
(৯)	শ্রীমণিন্দ্র বন্দ্যো	১লা ভাদ্র হইতে ১৫ই ভাদ্র
(১০)	শ্রীকুলদাপ্রসাদ বন্দ্যো দিং	১৬ই ভাদ্র হইতে ৩২শে ভাদ্র
(১১)	শ্রীকালীপদ বন্দ্যো দিং	১লা আশ্বিন হইতে ১৫ই কার্ত্তিক
(১২)	শ্রীরামকিশোর বন্দ্যো দিং	১৬ই কার্ত্তিক হইতে ৩০শে অগ্রহায়ণ
(১৩)	শ্রীবনবিহারী বন্দ্যো দিং	১লা পৌষ হইতে ১১ই মাঘ
(১৪)	শ্রীমন্মথ বন্দ্যো দিং	১২ই মাঘ হইতে ৩০শে ফাল্গুন

(শ্রীমন্মথ তাঁর পালা করে না—তাঁর এক ভ্রাতৃজায়া ৭ দিন করে অবশিষ্ট ৪২ দিন ১নং হইতে ১৩নং পর্য্যন্ত জ্ঞাতিরা বিভাগ করিয়া সেবা করেন)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কনকলতা ঠাকুরাণীর উপাখ্যান।

পাগল হরনাথের বংশের ৩২ পরিচয়ের সীতানাথ জামবুনীর গঙ্গানন্দ বংশীয় গোস্বামী বংশের কন্যা কনকলতা ঠাকুরাণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা নিস্তারিণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। জামবুনীর কনকলতা দেবীর শ্বশুর বংশের শ্যামসুন্দরজীউ কুল দেবতা ছিলেন। স্বামীর অবর্ত্তমানে কনকলতা বিগ্রহের সেবা করিতেন। কনকলতা দেবী তাঁর তিরোধানের পর তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা নিস্তারিণী ও জামাতা সীতানাথকে বিগ্রহের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। সীতানাথের পুত্র যজ্ঞেশ্বর জামবুনী হইতে সোণামুখীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। নিস্তারিণী দেবী তাঁর স্বামী বিয়োগের পর তাঁর পুত্র যজ্ঞেশ্বরের নিকট আসিয়া বাস করেন। এই সময় কনকলতা দেবীর পূজিত

শ্যামসুন্দরজীউ যজ্ঞেশ্বরকে স্বপ্নাদেশ করেন যে তিনি শীঘ্র জামবুনী হইতে তাঁহাকে সোণামুখীতে আনিয়া প্রতিষ্ঠা ও পূজা করুন। কনকলতা দেবী যে দিন অন্তর্ধ্যান করেন সেই রাত্রে যজ্ঞেশ্বর এই স্বপ্নাদেশ পাইয়াছিলেন, তিনি কনকলতা দেবীর পুষ্করিণীতে অদ্ভুত তিরোধানের বিষয়ও স্বপ্নে অবগত হন। যজ্ঞেশ্বর তাঁর স্বপ্নের কথা পাড়ার সকলকে জ্ঞাপন করেন; লোক মুখে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে অনেকেই যজ্ঞেশ্বরের সহিত জামবুনী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে যজ্ঞেশ্বর অন্যান্য গ্রামবাসীর সহিত জামবুনীর শ্যামসুন্দরের মন্দিরে পৌছিলে দেখিতে পান যে তাঁর মাসি মাতা অভয়া, কনকলতা দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা রোদন করিতেছেন ও ঠাকুরাণীর পুরলিয়া নিবাসী কনিষ্ঠ জামাতা দীননাথ গোস্বামী বহু লোক দ্বারা কনকলতা দেবীর মৃত দেহের জন্য মাছধরা জাল ইত্যাদি দ্বারা পুষ্করিণী অন্বেষণ করিতেছেন। পূর্ব্ব দিনের অপরাহ্নে কন্যা ও জামাতার সম্মুখে বৃদ্ধা কনকলতা স্নান করিবার জন্য পুষ্করিণীতে নামেন ও ডুব দেন কিন্তু আর উঠেন নাই। এই ঘটনা কন্যা, জামাতা ও যাঁহারা প্রসাদ পাইতেছিলেন তাঁহাদের সম্মুখে ঘটে। সকলে দেবীর জলমগ্ন হওয়া দর্শন করিয়া তখনি তাঁকে জল হইতে উদ্ধার করিবার বহু চেষ্টা করেন। সেই রাত্রি পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে সারা রাত্র অনুসন্ধান চলিয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকাল হইতে সকলে দ্বিগুণ উৎসাহে অনুসন্ধান করিতে থাকেন। মধ্যাহ্নকালে সোণামুখী হইতে সকলে উপস্থিত হইয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত সকল সত্য বুঝিতে পারেন ও মৃতদেহের অনুসন্ধান করিতে নিষেধ করেন। যজ্ঞেশ্বর স্বপ্নাদেশ মত ও পূর্ব্বে কনকলতার আদেশ মত শ্যামসুন্দরকে লইয়া সোণামুখী রওনা হন। যজ্ঞেশ্বর সোণামুখীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অদ্যাবধি যথারীতি বিগ্রহ পূজা হইয়া আসিতেছে। বংশ বিস্তারের সহিত শ্যামের পূজার পালা হইয়াছে।

বহু পূর্ব্বে এই শ্যামসুন্দর বিগ্রহ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের কুল দেবতা ছিলেন না; ইহার বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, দৌহিত্র সূত্রে এই বিগ্রহ তাঁরা পান। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জামবুনী গ্রামে এই বিগ্রহের শ্রীমন্দির, ভোগশালা, নাটমন্দির, তৎসম্মুখে কনকলতা নামে একটী বিল বা পুষ্করিণী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শ্রীমন্দিরটী প্রস্তরের নির্ম্মিত, ইহার অবস্থা মন্দ নহে, ভোগশালা ও নাটমন্দিরের ভগ্নাবস্থা, তবে একেবারে ভূমিস্মাৎ হয় নাই; আর এই কনকলতা নামীয় বিল বা পুষ্করিণীটী মজিয়া গিয়াছে, অতিকষ্টে ইহাতে স্নান করা যায়। জামবুনীর লক্ষণ মুখোপাধ্যায় এই বিগ্রহের সেবায়েৎ

ছিলেন। স্বামীর বংশের পুরুষের অভাবে গোস্বামী বংশের কন্যা কনকলতা দেবী বিগ্রহের সেবা করিতেন। পুরোহিত পূজা করিতেন আর কনকলতা ঠাকুরাণী স্বয়ং ভোগ রাঁধিতেন। নানা প্রকারের ব্যঞ্জন ইত্যাদি রন্ধন করিয়া শ্যামসুন্দরের ভোগ দিতেন। এই বিগ্রহের নামে যথেষ্ট জায়গা জমি ছিল; তাহার আয় হইতে প্রত্যহ অন্ততঃ ১২জন ব্রাহ্মণ, সাধু, বৈষ্ণব প্রসাদ পাইতেন। দেবী অপ্রকট হইলে জায়গা জমি দেবীর পূর্ব্ব আদেশে তাঁর ছোট জামাতা পুরলিয়া গ্রাম নিবাসী দীননাথ গোস্বামী পাইয়াছিলেন। এই, পুষ্করিণী ইত্যাদির কোন রেজিষ্টারী দানপত্র না থাকাতে ১৩৩৮ সালে পুরলিয়ার জমিদার ললিতমোহন বসুর সহিত দীননাথ গোস্বামীর বংশধর-দিগের দেওয়ানি ও ফৌজদারী মামলা হইয়াছিল। মকদ্দমার ফলে গোস্বামীগণ পুষ্করিণী ইত্যাদির পুনরায় অধিকার পাইয়াছেন। কনকলতা দেবী সকলের উপযুক্ত অন্ন ব্যঞ্জন ইত্যাদি একাকী রন্ধন করিতেন। শ্যামসুন্দরের ভোগ হইবে বলিয়া এই রন্ধনকার্য্যে কাহারও সাহায্য লইতেন না। তাঁর ভয় হইত অন্যে রন্ধন করিলে পাছে শ্যামসুন্দরের তৃপ্তি না হয়। তিনি বাৎসল্যভাবে বিভোর হইয়া শ্যামসুন্দরের সেবা করিতেন। পুত্ররূপে শ্যামসুন্দরকে পাইলে কোলে লইতে পারিতেন এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সত্য সত্যই বিগ্রহকে কোলে উঠাইয়া লইতেন। পুরোহিত ও অন্যান্য লোকে বিগ্রহের অঙ্গহানি হইবে এই ভয় দেখাইলে তিনি একার্য্যে নিরস্ত হইতেন; কিন্তু মাঝে মাঝে বিগ্রহকে কোলে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। প্রকৃতিস্থ হইলেই তাড়াতাড়ি বিগ্রহ রাখিয়া দিতেন। পুত্ররূপে শ্যামসুন্দরকে পাইলে মনের সাধে সেবা করিতে পারিতেন এই কথাই কেবল ভাবিতেন। যত সেবাই করেন ততই সেবার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে—শান্তি পান না। বিগ্রহের ভোগ অন্তে ঐ অতিথি-গণকে তিনি স্বয়ং পরিবেশন করিতেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, শ্যামসুন্দরজী কনকলতার সহিত কথা কহিতেন। প্রত্যহ ভোগের দ্রব্য কি প্রকার হইয়াছে তাহারও উল্লেখ করিতেন। রসিকশেখর শ্যামসুন্দর এই যত্নের রন্ধন লইয়া ভাগ্যবতী কনকলতার সহিত খেলা করিতেন। ব্যঞ্জনে লবণ দেওয়া হইলেও শ্যামসুন্দর বলিতেন অমুক ব্যঞ্জনে লবণ দিতে ভুলিয়া গিয়াছ। লঙ্কা, মরিচ ঝাল দ্রব্য দিতেন না, কনকলতা ঠাকুরাণী শ্যামসুন্দরকে শিশুজ্ঞান করিতেন, তাই ব্যঞ্জনে লঙ্কা মরিচাদি না দিয়া রন্ধন করিতেন—এইভাবে রন্ধনে লঙ্কা মরিচ ঝাল দ্রব্য না দিলেও তিনি বলিতেন ঐ ব্যঞ্জনে অতিরিক্ত ঝাল হওয়াতে তাঁর

আহারের কষ্ট হইয়াছে। কনকলতা তাঁর ভ্রম হইয়াছে বা গোপাল মিথ্যা কথা বলিতেছে কিনা জানিবার জন্য পরিবেশনকালে ব্রাহ্মণদিগকে ঐসকল ব্যঞ্জনে লবণ দিয়াছেন কিনা বা অতিরিক্ত ঝাল হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন। শ্যামসুন্দর যেমন বলিতেন ব্রাহ্মণগণও সেই রকম আস্বাদ পাইতেন। ব্রাহ্মণগণের মুখে নিত্যই এইরূপ কথা শুনিয়া হায় কিরূপ রন্ধন করিলাম বলিয়া কনকলতা ক্রন্দন করিতে করিতে পরিবেশন করিতেন। ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন যে শ্যামসুন্দর কনকলতার সহিত কথা কহেন। ভক্তের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ দ্বারা এই বিষয়টী প্রচারিত হইয়া পড়িল। তিনি বৃদ্ধা হইয়াছেন তাই তাঁর রন্ধনে প্রায়ই ভ্রম হয়। এই কারণে তাঁর একজন আত্মীয়া রন্ধন করিবেন কিনা শ্যামসুন্দরকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন অন্যের রন্ধনে তাঁর রুচি নাই। অন্য কেহ রন্ধন করিলে তিনি অভুক্ত থাকিবেন। এই কথা শুনিয়া তিনি যেমন রন্ধন করিতেছিলেন সেইভাবে রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। শ্যামসুন্দর কনকলতার সহিত অন্য প্রকারের খেলা আরম্ভ করিলেন —রন্ধনের আর ভ্রমের কথা বলেন না। প্রত্যহই রন্ধনের সুখ্যাতি করেন ও ভোগের অপূর্ব্ব গন্ধ বাহির হয়। ভোগের সুগন্ধে সকলের প্রাণ মাতাইয়া তুলে। অতিথিরা সকলেই বলিতে লাগিলেন তাঁরা জীবনে এরূপ অমৃততুল্য ভোগ আস্বাদন করেন নাই। দিন দিন প্রসাদপ্রার্থীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যে পাকপাত্রে কনকলতা পূর্ব্বে রন্ধন করিতেন সেই পাত্রেই এখনও রন্ধন করেন; কিন্তু শ্যামসুন্দরের প্রভাবে বণ্টনে কোনদিন কম পড়ে না। সকলকে প্রসাদ বণ্টন করিয়া তিনি নিজে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। তিনি প্রসাদ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শঙ্খধ্বনি করিতেন। যদি প্রসাদপ্রার্থী কেহ থাকেন আসিয়া প্রসাদ পাও এই বলিয়া শঙ্খধ্বনি করিয়া ডাকিতেন। যত লোক আসুক না কেন প্রসাদ বণ্টনে কাহারও কম পড়ে না। তিনি যে পাকপাত্রে রন্ধন করিতেন সেই পাকপাত্রেই রন্ধন করেন—১২ জনের স্থানে এখন ৩০।৪০ জন প্রসাদ পায় কিন্তু কাহারও কম পড়ে না। পূর্ব্বে যে পরিমাণ চাউল রন্ধন করিতেন এখনও সেইরূপই করেন অথচ ৪০ জন অতিথির সঙ্কুলান হয়—সকলেই এই বিষয় লইয়া প্রত্যহ আলোচনা করেন; ক্রমশঃ এই বিষয়টী লোক মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িল। প্রত্যহ এই অলৌকিক কার্য্য দেখিবার জন্য বহুদূরস্থিত গ্রাম হইতে লোকসকল আসিতে লাগিলেন। একদিন কনকলতা প্রসাদ পরিবেশন করিতেছেন, তাঁর দুই হস্ত জোড়া আছে, মস্তকের বস্ত্রাভরণ নাই এমন সময় তাঁর কনিষ্ঠ জামাতা,

কন্যা ইত্যাদি লোকমুখে এই বিষয় অবগত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জামাতাকে দেখিয়া লজ্জায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরিবেশন পাত্র হস্তে পশ্চাৎ হাটিতে থাকেন। ভক্তের এই অবস্থা দেখিয়া শ্যামসুন্দর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাই পশ্চাৎদিক হইতে দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া কনকলতার মস্তকের কাপড় টানিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণগণ ও তাঁর জামাতা ইহা দর্শন করিয়া তাঁদের আহার পরিত্যাগ করিয়া তাঁর চরণে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কনকলতা ঠাকুরাণী হস্ত ধৌত করিবার অছিলায় সম্মুখের পুষ্করিণীতে নামিলেন ও জলে ডুবিলেন, আর উঠিলেন না। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁকে পাওয়া গেল না। সেই অবধি এই পুষ্করিণীর নাম কনকলতা সায়র হইয়াছে। কনকলতা দেবী অপ্রকট হইলে পর কনকলতার দৌহিত্র যজ্ঞেশ্বরকে শ্যামসুন্দরজী স্বপ্নাদেশ করেন যে আমার সেবায়েৎ অপ্রকট হইয়াছে, তুমি আমাকে সোণামুখীতে লইয়া চল। তোমাদিগকে কৃপা করিব ও তোমাদের সেবা গ্রহণ করিব। ঠাকুর হরনাথের কুলদেবতা ৺রাধাশ্যামসুন্দরের ভোগ রন্ধনের পূর্ব্বে ও অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজা, বনভোজন ইত্যাদি ক্রিয়াকার্য্যের রন্ধনের পূর্ব্বে অর্থাৎ জোলে হাঁড়ি বা পাকপাত্র চাপাইবার পূর্ব্বে কনকলতা ঠাকুরাণীর পূজা ও শঙ্খধ্বনি করা হয়। এই পূজা হাঁড়ি চাপাইবার পূর্ব্বে জোলেই হইয়া থাকে। বাঁকুড়া জেলার বিশেষ প্রকারের চুল্লি, চুলা, উনান বা অগ্নিস্থানকে জোয়াল বা জোল বলে। এই জোলে একসঙ্গে এক জ্বালে পাঁচ ছয়টী পাকপাত্রে রন্ধন হয়। অদ্যাবধি সোণামুখীতে এই প্রথা প্রচলিত আছে কিন্তু কনকলতা ঠাকুরাণী কে বা তাঁর পূজা হয় কেন অনেকেই অবগত নহেন।

কনকলতা ঠাকুরাণীর অন্যান্য অলৌকিক কার্য্যাবলীর বিবরণ :—

(১) নাটমন্দিরের একখানি শাল কাঠের কড়ির পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হওয়াতে কনকলতা একটী শালগাছ কাটাইয়া লোক দ্বারা কড়ি বাহির করেন। কড়ি মন্দিরে আসিলে মিস্ত্রিরা মাপ করিয়া বলেন যে কড়িটী লম্বায় এক হাত ছোট হইবে। এই বিষয় দেবী তাঁর গোপালকে জানান, তাহাতে গোপাল বলেন কড়ি এক হাত বড় হইবে মিস্ত্রীদিগের মাপিতে ভুল হইয়াছে, মিস্ত্রীদিগকে বলাতে তাহারা পুনরায় মাপ করিয়া দেখেন যে সত্যই কড়িটী এক হাত বড় হইয়াছে।

(২) প্রত্যহ গোপালের জন্য শাক ভাজা হয়। একদিন কোন স্থানে শাক পাওয়া না যাইলে দেবী ভোগ রন্ধনের পূর্ব্বে গোপালকে জানান। গোপাল

বলেন তিনদিন পূর্ব্বে ক্ষেতে যে শাকের বীজ বুনিয়াছ তুমি স্নান করিয়া দেখিবে ঐ ক্ষেতে অনেক শাক জন্মিয়াছে। কনকলতা স্নান করিয়া আসিয়া ঐ ক্ষেত হইতে যথেষ্ট শাক সংগ্রহ করেন। সেই অবধি প্রত্যহ প্রচুর শাক ক্ষেত হইতে পাওয়া যাইত। ভগবতী দেবী, যাঁহাকে সকলে কনকলতা ঠাকুরাণী বলিত, তিনি নিজে ইহার বর্ণনা করিতেন। সেবক ভাগবত ও হরনাথের স্ত্রী কুসুমকুমারী স্বকর্ণে ইহা শুনিয়াছেন। ভগবতী দেবীর বর্ণনা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা বলিয়া ধারণা করিতেন। ভগবতী দেবী জাতিস্মর ছিলেন না অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সকল বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারিতেন না, ইহা সত্য। তিনি বলিতে পারিতেন না যে পূর্ব্ব জন্মে তিনিই কনকলতা দেবী ছিলেন; তবে তিনি বলিতেন যেন স্বপ্নে দেখার মত এই ক্ষেত, মন্দির, পুষ্করিণী ইত্যাদি দেখিয়াছেন।

(৩) একদিন বনবিষ্ণুপুরের রাজা জামবুনীর নিকট জঙ্গলে মৃগয়া করিতে আসেন। সন্ধ্যা হইয়া যাইলে তাহারা পথ হারাইয়া ফেলেন, মন্দিরের আলো দেখিয়া তথায় আসেন ও পথ প্রদর্শন জন্য আলোর প্রার্থনা করেন। রাজার মশালধারী ভৃত্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া কে কোথায় গিয়াছিল তাহার সন্ধান ছিল না, কনকলতার একটী প্রদীপ ছাড়া অন্য আলো ছিল না। শ্যামসুন্দর, দেবীর নিকট ইহার বিষয় অবগত হইয়া বলেন, রাজা এখানে আসিবেন আমি জানি, তাই একজন লোককে মন্দিরের নিকট বসাইয়া রাখিয়াছি। ঐ লোককে বলিলে সে রাজাকে পৌঁছিয়া দিবে। কনকলতা ঐ লোককে ডাকিয়া রাজাকে রাজপ্রাসাদে পৌঁছিয়া দিতে বলেন। ঐ লোকের নিকট একটী মশাল ছিল, ঐ মশাল জ্বালাতে শত মশালের আলো হয় ইহা দেখিয়া রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হন। জামবুনী হইতে বিষ্ণুপুরে যাইতে ৭।৮ ঘণ্টা সময় লাগে; কিন্তু ঐ লোকটী অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাজাকে রাজপ্রাসাদে পৌঁছিয়া দেন ও ত্বরিত পদে ফিরিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হন। সেই অবধি কিছুকাল ধরিয়া প্রতি পূর্ণিমার দিন রাজা শ্যামসুন্দরের পূজা পাঠাইয়া দিতেন।

(৪) এক সময়ে একটী বৃহৎ বাঘ আসিয়া মধ্যাহ্নের রৌদ্রে নাট মন্দিরের উপর আশ্রয় লয়। যাঁহারা প্রসাদ পাইতে আসিয়াছিলেন তাহারা ভয়ে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করেন। তখন সবে মাত্র ভোগ দেওয়া হইয়াছে। কনকলতা লোকদিগের মুখে বাঘের কথা শুনিয়া নিজে বাঘ দেখিতে আসেন ও একটী লাঠি লইয়া তাহাকে কুকুরের মত মারিয়া তাড়াইতে চেষ্টা করেন। বাঘ

লাঠির আঘাত খাইয়া গড়াগড়ি দিতে থাকে ও ভীষণ গর্জ্জন করে; অগত্যা কনকলতা মন্দিরের লোক সরাইয়া তাঁর গোপালকে এই বাঘের কথা বলেন, গোপাল দৈববাণীতে একটী বড় থালায় বাঘকে প্রচুর প্রসাদ দিতে বলেন। দেবী থালা-পূর্ণ প্রসাদ বাঘের সম্মুখে রাখেন। বাঘ সানন্দে সব প্রসাদ খাইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিয়া তথা হইতে চলিয়া যায়। সেই অবধি জামবুনীতে বাঘের উপদ্রব ছিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শিব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার বিবরণ।

সোণামুখীর শিব স্থাপন ঠাকুর হরনাথের পিতা জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় করেন। জয়রাম বাল্যকালে মাতুলালয় বেলিয়াড়া গ্রামে অবস্থিতির সময় ৺দামোদর শালগ্রামশিলার পূজা করিতেন ও ১৬ বৎসর বয়সে মাতুলালয় হইতে সোণামুখী ফিরিয়া আসিয়া নিজেদের কুল দেবতা ৺রাধাশ্যামসুন্দর জীউর সেবায়েৎরূপে পূজা করিতেন। এখনও প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুর হরনাথের পরিবারবর্গের বিগ্রহ সেবার পালা পড়ে। জয়রাম বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রাধাগোবিন্দের পূজা করিয়া হঠাৎ তাঁর শিবলিঙ্গ স্থাপনের ইচ্ছা হইল কেন? এই ইচ্ছার ভিতর গূঢ় রহস্য আছে।

উপরোক্ত বিষয়ের আলোচনার পূর্ব্বে ঠাকুরের বংশাবলীর পুনরাবৃত্তি করিব। অতি প্রাচীন বংশাবলীর উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে এখন ঠাকুরের অতি বৃদ্ধ পিতামহ (৩৫) কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিব। কুঞ্জবিহারীর দুই পুত্র প্রথম পুত্র (৩৬) মদনগোপাল—ইনিই ঠাকুরের প্রপিতামহ। দ্বিতীয় পুত্র (৩৬) রামানন্দ। (৩৬) মদনগোপালের এক পুত্র (৩৭) শ্রীকান্ত—এই শ্রীকান্তই ঠাকুরের পিতামহ। শ্রীকান্তের দুই বিবাহ প্রথম স্ত্রী ভদ্রকালী, দ্বিতীয় স্ত্রী আদরমণি—ইনিই (৩৮) জয়রামের মাতা ও হরনাথের পিতামহী। ভদ্রকালীর গর্ভে চারি পুত্র ও একটী কন্যা হয়। তাঁহাদের নাম (১ম) হংসেশ্বর—তৎপুত্র দর্পনারায়ণ (অপুত্রক), (২য়) বিশ্বেশ্বর—তৎপুত্র রাজারাম এই রাজারাম ১২৭০ বঙ্গাব্দে শিবমন্দিরের জমি ২৫৲ টাকায় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জয়রামকে বিক্রয় করেন

ও নিত্যানন্দপুরে গিয়া বাস করেন। (৩য়) রামদয়াল—তৎপুত্র ক্ষেত্রনাথ ত্রৈলক্যনাথ, গিরীশ ও কন্যা বগলা (বগলা বিবাহের পূর্ব্বে মৃত) ইহাদের বংশধরেরা এখনও সোণামুখীতে বাস করেন। (৪র্থ) জগন্নাথ (অপুত্রক)—শিব মন্দিরের সম্মুখে যে সাবেক দ্বিতল বাটী আছে এই বাটীর জমি ১২৭০ সালে ঠাকুরের পিতা জয়রাম তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জগন্নাথের নিকট হইতে ৩১৲ টাকায় ক্রয় করেন। এই জমির উপর ভগবতী দেবী দ্বিতল বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই বাটীর উত্তর অংশ হরনাথের দখলিভুক্ত ও দক্ষিণ অংশ শিবনারায়ণের দখলিভুক্ত আছে। (৫ম) কন্যা মন্দাকিনী, বিধবা হইয়া অপুত্রক। ঠাকুর হরনাথের পিতামহ শ্রীকান্তের দ্বিতীয় স্ত্রী আদরমণির গর্ভে—বঙ্গাব্দ ১২১২ সালে একমাত্র পুত্র ঠাকুরের পিতা জয়রামের জন্ম হয়। জয়রামের বংশাবলীর পরিচয় পরে যথাস্থানে উল্লেখ করিব।

এই পর্য্যন্ত (৩৫ পঃ) কুঞ্জবিহারীর প্রথম পুত্র (৬৩ পঃ) মদন গোপালের বংশাবলীর পরিচয় দিয়াছি এখন কুঞ্জবিহারীর দ্বিতীয় পুত্র রামানন্দের বংশাবলীর বর্ণনা করিব। এই বংশধরগণের সহিত ঠাকুর হরনাথের জীবনীর অনেক সম্বন্ধ আছে, এই কারণ ইহার উল্লেখ আবশ্যক।

কুঞ্জবিহারীর দ্বিতীয় পুত্র (৩৬ পঃ) রামানন্দের তিন বিবাহ। এই তিন স্ত্রীর গর্ভে ছয়টী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে (৩৭পঃ) রুক্মিণীকান্ত, "ক" দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে (৩৭) কালীকান্ত "খ" ও তৃতীয় স্ত্রীর গর্ভে চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, যথা—(১) রমাকান্ত "গ" (২) যাদবেন্দ্র "ঘ" (৩) গোপীনাথ "ঙ" ও (৪) নফরচন্দ্র "চ"

"ক" (৩৭পঃ) রুক্মিণীকান্তের তিন পুত্র (১) নদেরচাঁদ, (২) মহেশচন্দ্র ও (৩) জনার্দ্দন।

(১) নদের চাঁদের তিন পুত্র—(১ম) বনমালী তৎপুত্র মৃগেন্দ্র, নৃপ ও রতি (৪০পঃ) এই নদেরচাঁদের সহিত জয়রাম গালার আড়তের কাজ করিয়াছিলেন। জয়রামের মৃত্যুর পর ভগবতী দেবীও ইহাঁর সহিত গালার কাজ করিয়াছিলেন। ইনি দুই আনার অংশীদার ছিলেন ও ১৩০৬ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন, সে সময় গালার কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(২য়) রামকিঙ্কর (৩৯পঃ)—ইহাঁর পুত্র কন্যা মৃত হওয়ায়, বংশ লোপ হইয়াছে, ইনি ১৩৪৩ সাল শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন

ও বাঁড়ুয্যে বংশের ইতিহাস সংগ্রহের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

(৩য়) আশুতোষ (৩৯পঃ) তৎপুত্র (৪০পঃ) গৌরীশঙ্কর, হরিশঙ্কর (সন্ন্যাসী হইয়া নিরুদ্দেশ), ও ভবানীশঙ্কর (মৃত)

(২) মহেশচন্দ্র (৩৮পঃ) স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী, ডাক নাম ঘুগি ঠাকুরাণী; ইহাঁরা ঠাকুর হরনাথের ভিক্ষা বাপ ও মা। ইহাঁদিগের ছয় পুত্র যথা (১ম) কেদার (মৃত) (২য়) বিপীনবিহারী তৎপুত্র পুলিন (৪০) তৎপুত্র অনুকূল, অজিত, আদিত্য, অর্দ্ধেন্দু ও দুই কন্যা রসময়ী ও কালিন্দী (৩য়) রামসদয় (৩৯পঃ) তৎপুত্র বিজন, (৪র্থ) বিভূতি, (৫ম) রাধিকা ইনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে হরনাথের সহিত ১২৮নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতার মেসে এক ঘরে ছিলেন। তৎপুত্র ভোলানাথ, ভূতনাথ, অমরনাথ ও দুই কন্যা ঊষাবতী ও সরস্বতী। ভোলানাথের পুত্র রবি। (৬ষ্ঠ) বৈদ্যনাথ (মৃত)

(৩) জনার্দ্দন (৩৮পঃ) ইহাঁর দুই পুত্র ও তিন কন্যা যথা (১ম) মহেন্দ্র, (২য়) উপেন্দ্র (নিঃসন্তান) ও কন্যা মল্লিকা, নিতু ও প্রমদা।

(১ম) মহেন্দ্র (৩৯পঃ)—ইহাঁর ছয় পুত্র যথা (১) মণীন্দ্র, (২) নরেন্দ্র তৎপুত্র বাদল (৩) গিরীন্দ্র তৎপুত্র পচাই ও সনাতন, (৪) ফণীন্দ্র (মৃত) (৫) জ্ঞানেন্দ্র তৎকন্যা পরিতোষ ও সন্তোষ ও (৬) বিনোদ (মৃত)।

"খ"—(৩৭ পঃ) কালীকান্ত—তৎপুত্র রাসবিহারী ও জগৎচন্দ্র। জগৎচন্দ্রের পুত্র (১) বলরাম তৎপুত্র নৃসিংহ, অবনী ও হরি (২) বসন্ত (মৃত) ও (৩) দেব তৎপুত্র অনাথ।

"গ" (৩৭ পঃ)—রমাকান্ত—তৎপুত্র (১) উদয় ও (২) হারাধন।

"ঘ" (৩৭পঃ)—যাদবেন্দ্র—তৎপুত্র (১) ভৈরব (৩৮) নিঃসন্তান ও (২) প্রতাপ (৩৮)। প্রতাপের দুই পুত্র (১ম) প্যারি (৩৯) তৎপুত্র বঙ্কিম ও গঙ্গা (৪০) (২য়) রামলাল (৩৯) তৎপুত্র ফটিক (৪০)।

"ঙ" (৩৭পঃ)—গোপীনাথ—তৎপুত্র গোরাচাঁদ (৩৮) ও শশীভূষণ (৩৮) তৎপুত্র (৩৯) গোবিন্দ (৩৮) গোরাচাঁদের তিন পুত্র (১ম) বনওয়ারি (৩৯) তৎপুত্র গোপাল (৪০) (২য়) মণীন্দ্র (৩৯) ও (৩য়) নলিন (৩৯)। এই (৩৮ পর্য্যায়) শশিভূষণকে হরনাথ "কাকা-বিহাই" বলিয়া সম্বোধন করিতেন অর্থাৎ খুল্লতাত বা খুড়া বা কাকা ও বৈবাহিক

এই দুই শব্দ একত্রে কাকাবেহাই। সাধারণতঃ পুত্র বা কন্যার শ্বশুরকে বৈবাহিক বলিয়া থাকে। আবার পুত্র বা কন্যা স্থানীয়ের শ্বশুর স্থানীয় আত্মীয়কে বৈবাহিক বলিয়া থাকে। হরনাথ ছিলেন ৩৯ পরিচয়ের ও শশিভূষণ ছিলেন ৩৮ পরিচয়ের অতএব শশিভূষণ ছিলেন সম্বন্ধে হরনাথের খুড়া বা কাকা, আর শশিভূষণের পুত্র গোবিন্দের বিবাহ হইয়াছিল যে কন্যার সহিত, সেই কন্যাটী হরনাথের কন্যাস্থানীয়া ছিলেন। এই দুই কারণে হরনাথ শশিভূষণকে কাকা বেহাই বলিতেন। শশিভূষণ সোণামুখী বারুইপাড়া সাগর মাতা আশ্রমের হরিসভার এক জন সভ্য ছিলেন ও হরনাথের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। ইহাঁকে হরনাথ বিশেষ মান্য, ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন।

হরনাথ শশিভূষণের সম্মুখে তামাক খাইতেন না, তাঁর অসাধারণ সরলতা ও নির্ম্মল চরিত্র দেখিয়া ভক্তি করিতেন। শশিভূষণের সেবা করিয়া তিনি প্রীতিলাভ করিতেন। শশিভূষণের পায়ে ৪০ বৎসরের একটী নালী ঘা ছিল উহার অস্ত্রোপচার করেন নাই—মধ্যে মধ্যে ঐ ক্ষত হইতে পুঁজ নির্গত হইত। হরনাথ ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া ঐ ক্ষত স্থান হইতে পুঁজ নির্গত করিয়া দিতেন।

"চ" (৩৭পৃঃ) নফরচন্দ্র—ইহাঁর তিন বিবাহ—আট পুত্র—প্রথম স্ত্রীর দুই পুত্র, দ্বিতীয় স্ত্রীর দুই পুত্র ও তৃতীয় স্ত্রীর চারি পুত্র (১ম) কার্ত্তিক (৩৮), (২য়) কীর্ত্তিচন্দ্র (৩৮) তৎপুত্র কুলদা (৩৯) তৎপুত্র দ্বিজ (৪০), বনবিহারী (৪০) জীতেন (৪০) ও শম্ভু (৪০), (৩য়) হরিশ (নিঃসন্তান). (৪র্থ) সুচাঁদ তৎকন্যা ননীবালা, (৫ম) পূর্ণ (নিঃসন্তান), (৬ষ্ঠ) সুরেশ (৩৮) তৎপুত্র প্রফুল্ল (৩৯), অনিল ৩৯) ইত্যাদি, (৭ম) তেজচন্দ্র (মৃত) ও (৮ম) রতন (৩৮) তৎপুত্র (৩৯) ভোলানাথ (মৃত) ও (৩৯) ভুতনাথ।

উপরোক্ত (৩৭পৃঃ) রুক্মিনীকান্ত, কালীকান্ত, রমাকান্ত, যাদবেন্দ্র, গোপীনাথ, নফরচন্দ্র ও ঠাকুর হরনাথের পিতামহ (৩৭পৃঃ) শ্রীকান্তের সহিত শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর লইয়া মামলার বাদী ছিলেন।

নফরচন্দ্র ঠাকুর হরনাথের পিতা জয়রামকে কলিকাতার গালার আড়তে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

জয়রাম তাঁর কলিকাতায় অবস্থানকালে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন, পথে

যে সকল দেবালয় ছিল তথায় প্রণাম করিতেন; কিন্তু শিব মন্দির দেখিলে তথায় দাঁড়াইতেন না। শিবমূর্ত্তি পূজা বা প্রণাম করিতেন না। তিনি শিবের উপাসক নয় বলিয়া শিব মূর্ত্তিকে প্রণাম করিতে কেমন একটা দ্বিধা বোধ করিতেন। ১২৭০ সালে তিনি এই দ্বিধা পরিত্যাগ করিবার জন্য স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন দেখা অলীক বা মিথ্যা বলিয়া তাঁর বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি স্বপ্ন দেখা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ববৎ স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতেন শিব মূর্ত্তিতে গঙ্গাজল বা পুষ্প দেওয়া ত দূরের কথা, মস্তক বা হস্ত দ্বারা প্রণামের ভাবও দেখাইতেন না। তিনি একপ্রকার শক্তি ও শিব বিদ্বেষী ছিলেন। জয়রাম পুনরায় স্বপ্ন দেখেন। এবার তাঁর স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে দেখেন যে তিনি ঘর্ম্মাক্ত কলেবর ও স্বপ্ন দর্শনকালে ক্রন্দন করিয়াছেন বুঝিতে পারেন। তিনি জাগ্রত হইয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া কাঁদিতে থাকেন ও শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া তাঁর কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে মাতুলালয়ে দামোদর শালগ্রামশিলা পূজা করিবার সময় যে সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিলেন তাঁহাকেই স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "তুমি চিরকাল ধ'রে গোপালের উপাসক হইয়া তাঁকে লাভ করিবার জন্য বহু তপস্যা করিয়াছ কিন্তু সর্ব্বভূত মহেশ্বর সদাশিবকে ভিন্ন ভাবিয়া অবজ্ঞাবশতঃ তাঁর পূজা না করিয়া বিশেষ অপরাধী হইয়াছ। আমি পূর্ব্বে তোমাকে দৈবজ্ঞরূপে দর্শন দিয়াছিলাম। আমিই বসন্তরোগরূপে আক্রমণ করিয়াছিলাম, আমিই তোমাকে আরোগ্য করিয়াছি—তুমি দার পরিগ্রহ করিয়া উত্তম করিয়াছ। তুমি চতুর্থ পুত্র পাইয়াছ এইবার সদাশিব মহেশ্বরকে পঞ্চম পুত্ররূপে পাইবে; কিন্তু তোমার এরূপ ভেদজ্ঞান থাকাতে, তুমি তাঁকে পাইবে না অধিকন্তু তোমাকে বহু জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। আমি যাহা আদেশ করি তাহা পালন কর, তোমার মঙ্গল হইবে। তুমি শীঘ্র শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া অভিন্নভাবে নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া তাঁর পূজা করিতে থাক।" জয়রাম এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া কাঁদিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁর কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি গঙ্গাস্নানে বাহির হইয়া পড়িলেন। স্নানান্তে ফিরিবার সময় বড়বাজার হুকাপটীর গলির সম্মুখস্থ শিব মন্দিরে তাঁর পূর্ব্ব পরিচিত ৺কাশীধামের পণ্ডিত যোগন শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে কাশীধাম হইতে কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি আনাইয়া দিবার অনুরোধ করিলেন ও বাসায় ফিরিয়া আসিয়া সোণামুখী রওয়ানা হইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ৫।৭ দিনের মধ্যে সোণামুখীতে আসিলেন ও ভগবতী দেবীকে তাঁর স্বপ্ন বৃত্তান্ত

বলিলেন ও কোথায় শিব স্থাপন করিবেন এই চিন্তাই করিতে লাগিলেন। কারণ সোণামুখীতে যে ছয় কাঠা জমি পাইয়াছিলেন তাহাতে ৪ খানি চালা ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এই স্থানের মধ্যে মন্দির করিবার সুবিধা দেখিলেন না। ঠাকুরের যে স্থানে বাড়ী এই পাড়াকে চাটুয্যে পাড়া বলে—এই চাটুয্যে পাড়ার সকলেই জয়রামের শিবলিঙ্গ স্থাপনের কথা শুনিলেন। একজন প্রস্তাব করিলেন যে নিত্যানন্দপুর নিবাসী তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র রাজারাম শিব মন্দিরের জন্য জমি বিক্রয় করিতে চান। এই স্থানটী ২৫৲ টাকার মূল্যে ক্রয় করা হইল। এই জমি খরিদের পর শালী নদীর ধারে ইট তৈয়ারীর জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। ৪।৫ মাসে ইট প্রস্তুত হইল, মন্দিরের কার্য্যও আরম্ভ হইল। ইষ্টকের অভাবে মন্দিরের কার্য্য সম্পূর্ণ শেষ হইল না। তাই পুনরায় আর এক পাঁজা ইট প্রস্তুত করাইলেন। বিষ্ণুপুর হইতে মন্দির নির্ম্মাণে অভ্যস্থ রাজমিস্ত্রি আনাইয়া মন্দির নির্ম্মাণের কাজে নিযুক্ত করেন। ছোট ছোট ইষ্টক দ্বারায় এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটী আকারে ছোট হইলেও ইহার গাত্রে নানা প্রকারের কারুকার্য্য আছে ও এই সকল কারুকার্য্য নানা প্রকারের রং দ্বারা চিত্রিত হইয়াছিল। আজ ৭০ বৎসর গত হইয়াছে তথাপি স্থানে স্থানে এই সকল রং করা কাজ দেখা যায়। ইতোমধ্যে ১২৭১ সালে ৩১শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার (ইং ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ সাল) রাখী পূর্ণিমার দিন বৈকালে একজন গৌরবর্ণ, উন্নত-মস্তক বিশাল-বক্ষঃস্থল, পক্ক কেশ-শ্মশ্রু-বিশিষ্ট, কৌপীন-পরিহিত, কমণ্ডলুধারী এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হন। ভগবতী দেবী তাঁর ৪।৮ মাসের কন্যা কমলা এক বৎসর তিন মাসের শিশু শিবনারায়ণ ও তাঁর আত্মীয়া প্রসন্নময়ী, মন্দাকিনী, বরদা প্রতিবেশিনীগণ যে ঘরের রোয়াকে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান ও বলেন, "আমি অমরেশ্বর তীর্থ হইতে আসিয়াছি, আমাকে থাকিবার স্থান দিন।" এই সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ভগবতী দেবী ও সকলে যত্নের সহিত তাঁকে শিব মন্দিরে, যাহার কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইয়াছিল, তথায় লইয়া যান ও থাকিবার স্থান করিয়া দেন। তাঁর মুখে স্বয়ম্ভু তুষার-লিঙ্গ অমরেশ্বর মহাদেবের বর্ণনা শুনিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁর আহারের কথা বলাতে তিনি বলেন পূর্ণিমার জন্য মধ্যাহ্নে যে রুটী ও ছোলার ডাল হইয়াছে ও তোমার কন্যার জন্য যাহা আছে তাহা হইতে সামান্য কিছু দিলেই হইবে—রন্ধন করিতে হইবে না। সন্ন্যাসীকে মন্দিরে রাখিয়া ভগবতী দেবী ও সকলে তাঁদের গৃহে গমন করেন। রাত্রে ভগবতী

দেবী স্বপ্নে দেখেন সন্ন্যাসী তথায় নাই। সন্ন্যাসী স্বপ্নে বলেন আমি তোমার নিকট থাকিবার জন্ম আসিয়াছি তাই তোমার গর্ভে স্থান লইলাম। আমাকে কোথায়ও খুজিয়া পাইবে না। তোমার স্বামীকেও ইহার বিষয় জানাইলাম। যে সকল লোক মন্দিরে কাজ করিতেছিল তাহারা রাত্রে ঐ মন্দিরেই ছিল কিন্তু তাহারা কেহই সন্ন্যাসীর কোন সংবাদ দিতে পারে নাই।

শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি ১২৭২ সালের বুধবার ২৯ বৈশাখ (ইং ১০মে ১৮৬৫ সালে) পূর্ণিমার দিন ঠাকুরের পিতা জয়রাম ও তাঁর মাতা ভগবতী দেবী একত্রে প্রতিষ্ঠা করেন। শিব প্রতিষ্ঠার দুই মাস পরে বা ভগবতী দেবীর নিকট সন্ন্যাসীর আগমনের ২৯০ দিন পরে বা দশ মাস পরে ১৮ই আষাঢ় ১২৭২ সালে (ইং ১ জুলাই ১৮৬৫ সাল) ঠাকুরের জন্ম হয়। ঠাকুরের পিতা জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী ভগবতী দেবীর সহিত একত্রে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলে সোণামুখীর শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণমণ্ডলী ইহাতে আপত্তি করেন, এই কারণে ১২৭১ সালের ফাল্গুন মাসে ভিন্ন গ্রামের পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া জয়রাম একটী পণ্ডিত সভার অধিবেশন করান। সমবেত পণ্ডিতগণ জয়রাম ও তাঁর পূর্ণ গর্ভবতী সহধর্ম্মিণী একত্রে এই শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। প্রথমে পণ্ডিতগণ সোণামুখীর ব্রাহ্মণগণের মতই সমর্থন করিয়াছিলেন। জয়রাম একাকী শিব প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন কিন্তু তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়া পারেন না এই মতই দেন। পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া জয়রাম দুঃখে ও ক্ষোভে সভা ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। ভগবতী দেবী পণ্ডিতগণের মত অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ একখানা পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আবেশভাবে যেন ভূতে পাইয়াছে এইভাবে ...তে বাটীর সন্নিকটস্থ রাসতলায় পণ্ডিতগণের সম্মুখে উপস্থিত হন। জয়রাম তাঁর স্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। পুরুষগণের সভায় স্ত্রীলোকের গমন করা সে সময়ে একেবারে অসম্ভব হইলেও ভগবতী দেবীর কোন দ্বিধা হইল না। তিনি পণ্ডিতগণের সভায় প্রবেশ করিয়া করযোড়ে নতমস্তকে প্রণাম করিয়া পণ্ডিতগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন—আপনারা অন্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অন্য কোন দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে না, সদাশিব মহাদেবের লিঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে—বালক, বালিকা, স্ত্রীলোক, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেরই শিবমূর্ত্তির পূজার অধিকার আছে। অতএব শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার জন্য লিঙ্গপুরাণে যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহাই এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পালনীয়। এই সকল ব্যবস্থা বিবেচনা

করিয়া আপনারা শাস্ত্র বিধি নির্ণয় করুন। স্ত্রীলোকের মুখে জ্ঞানীর ন্যায় শাস্ত্রীয় কথা শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হন ও তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া জয়রাম সস্ত্রীক শিব স্থাপন করিতে পারেন একবাক্যে সকলে ব্যবস্থা দেন। পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা অবগত হইয়া ভগবতী দেবীর আবেশ ভাব তিরোহিত হয়, যেন ভূত ছাড়িয়া গেল। কিন্তু তিনি অসুস্থতা বোধ করেন ও সেই স্থানেই শুইয়া পড়েন ও সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য লোপ হয়। মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পায়। সকলে পূর্ণগর্ভা ভগবতী দেবীর এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া ভীত হইয়া পড়েন ও সকলের সাহায্যে জয়রাম তাঁকে গৃহে আনেন। বহুক্ষণ পরে তাঁর জ্ঞান হয়। জ্ঞান হইলে তিনি পণ্ডিত সভায় গিয়াছিলেন ইত্যাদি বিষয়ের কিছুই স্মরণ করিতে পারেন নাই। এই ঘটনার পর হইতে সকলেই তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবতী দেবী জ্ঞান করিতেন। ভগবতী দেবী ৺রাধাশ্যামসুন্দরের সেবা ও পূজা, ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি, গরীব লোকের উপর দয়া ও প্রত্যহ ২।৩ জন ক্ষুধাতুরকে অন্নদান না করিয়া নিজে অন্নগ্রহণ করিতেন না। কোনদিন কেহ অন্নগ্রহণ করিতে না আসিলে তিনি নিজে পাড়ায় বাহির হইয়া লোক ডাকিয়া আনিতেন। মাতাকে সাহায্য করিবার জন্য কমলা, শিবনাথ ও অতি শিশু হরনাথ ভগ্নীর কোলে উঠিয়া লোক ডাকিতে যাইতেন। হরনাথকে না লইয়া গেলে ধুলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেন। ৭।৮ মাসের শিশু হরনাথ কেমন করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে উপবাসী অন্নহীনের সন্ধানে যাইতেছেন—মার নিকট এই শিক্ষাটী তাঁর মজ্জাগত হইয়াছিল। হরনাথ মহোৎসবের অছিলায় কেবল সকলকে আহার করাইতে ভালবাসিতেন, কাহাকে আহার করিতে দেখিলে বাল্যকালের স্মৃতি জাগিয়া উঠিত ও তাঁর প্রাণ আনন্দে ভরিয়া যাইত। পাড়ার লোক সকল ভগবতী দেবীর এই সকল কার্য্য দেখিয়া তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবতীরূপী কনকলতা ঠাকুরাণী আসিয়াছেন বলিতেন। দশ মুখে ধর্ম্ম; তাই সকলের এই ধারণা ভ্রম বলিতে সাহস হয় না, কারণ কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে তিনি ভগবতীরূপে আসেন নাই। সকলের উপাস্য হরনাথকে যিনি পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন তিনি নিশ্চয়ই কনকলতা ঠাকুরাণী বা তাঁর অপেক্ষা উচ্চস্তরের কোন দেবী হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগবতী দেবী সদা সর্ব্বদা হরনাথের অলৌকিক কার্য্যকলাপাদি দেখিয়া মা যশোদার ন্যায় বাৎসল্য স্নেহে অভিভূত হইয়া হরনাথের মঙ্গল কামনায় নানা দেবতার পূজা অর্চ্চনা করিতেন ও করাইতেন। হরনাথের উপর কোন উপদেবতার দৃষ্টি আছে জানিয়া ভগবতী দেবী যখন তখন হরনাথকে পঞ্চগব্যে স্নান করাইতেন।

ঠাকুর হরনাথ দেবের কুল দেবতা শ্যামসুন্দরকে কনকলতা ঠাকুরাণী বাৎসল্যভাবে সেবা করিয়াছিলেন। শ্যামসুন্দরকে গর্ভে পুত্ররূপে পান নাই এই তাঁর মর্ম্মবেদনা ছিল। বোধ হয় তাঁর আন্তরিক মনোবাসনা হরনাথ ভগবতীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করায় পূর্ণ হইয়াছে।

জয়রাম নিজে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে তাঁর জ্ঞাতিগণের কাহার অংশ নাই। এই শিব মন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য জয়রামের প্রায় দেড় হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। মহাত্মা অটল বিহারীর "ঠাকুর হরনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে" অনেক প্রমাদ লক্ষিত হয়। তিনি এই মন্দির নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্যে ২৫০০০, টাকা ব্যয় হইয়াছে লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ২৫০০৲। ৩০০০৲ টাকার বেশী ব্যয় হইতে পারে না—৭০ বৎসর পূর্ব্বে ৫।৭ শত টাকায় এইরূপ মন্দির হওয়া উচিত। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ ভোজন অর্থ—মুড়ি, চিড়ে, মুড়কি ইত্যাদির ফলার—ইহাতেই বা কত ব্যয় হওয়া সম্ভব। ঠাকুর হরনাথের বংশে বা তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে কখন কাহার সর্পাঘাত হয় নাই—ইহার বিষয় তাঁর বংশের কেহই জানেন না। পাগল হরনাথের স্ত্রীকে সর্পাঘাত করিয়াছিল, এই বিষয় তিনি নিজেও জানেন না। অটল বাবুর ভ্রম হওয়ার প্রধান কারণ—দীর্ঘ ছুটি অন্তে তাঁর দেশ শ্রীপুর হইতে হাতরাসে ফিরিবার পথে পানাগড়ে নামেন ও সোণামুখীতে আসেন; সে সময় ঠাকুর কাশ্মীরে ছিলেন, বেলা ১২টার সময় সোণামুখীতে আসেন ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে রওনা হন। আহারাদির পর এক ঘণ্টার মধ্যে ঠাকুরের জীবনী সংগ্রহ করেন ও হাতরাসে ফিরিয়া গিয়া ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য্য দ্বারায় জীবনী লেখান। সত্যাসত্য বিচার না করিয়া বৃন্দাবনের দেবকীনন্দন ছাপাখানায় প্রেরণ করেন। আবার ইহাই বিনা বিচারে বেদবাক্য বলিয়া অন্যে গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রত্যহ শিবপূজা ইত্যাদির জন্য পুরোহিত নিযুক্ত আছেন। শিবনারায়ণ ও হরনাথ দুই ভ্রাতারা তাঁহাদের জীবিত অবস্থায় দুই জনে পৃথক অন্ন হইয়াছিলেন। বিষয় সম্পত্তি তাঁহারা পৃথক করিয়া লইয়াছিলেন। কাজে কাজে মহাদেবের পূজার পালা, ছয় মাস শিবনারায়ণ করিতেন আর বাকি ছয় মাস আমাদের ঠাকুর করিয়া থাকিতেন। এখনও এই ভাবে পালা চলিয়া আসিতেছে। ফাল্গুন মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত এই ছয় মাস শিবনারায়ণের পালা—উপস্থিত তাঁর পুত্র গোকুলচন্দ্র করিয়া থাকেন ও ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত এই ছয় মাস হরনাথের পালা—উপস্থিত তাঁর দুই পুত্র অনুকূলচন্দ্র ও কৃষ্ণদাস করিয়া থাকেন।

জয়রাম, হরনাথ ও মাতাঠাকুরাণী কুসুমকুমারীর হস্তাক্ষর।

ফিরিস্তী কাগজ—
মোঃ কলীকার্ত্তা রঙ্গবটী ও গালা—
বিক্রীর ওজণ অক্ষবঙ্গীয় রশীদ—
বহি সরকার শ্রীযুত জয়রাম বন্দোপাধ্যায়—
সাঃ শোনামখী—জেলা বর্দ্ধমাণ—
সন ১২৭০ সাল—২১ কার্ত্তীক—

আজ ১৬ই পৌষ ৩১শে December ১৯২১ আমার সাক্ষাৎ শিবতুল্য পিতৃদেবের স্বহস্ত লিখিত এই অক্ষর-কটা দেখিয়া সাক্ষাৎ পিতৃ দর্শনের পূর্ণানন্দ অনুভব করিলাম ও নিজেকে মহা ভাগ্যবান মনে করিলাম—

শোনামুখী ১৬ই পৌষ ১৩২৮ } শ্রীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী কুসুম কুমারী দেবী

ফিরিস্তী কাগজ—

মোঃ কলীকার্ত্তা রঙ্গবটী ও গালা—

বিক্রীর ওজণ অক্ষবঙ্গীয় রশীদ—

বহি সরকার শ্রীযুত জয়রাম বন্দোপাধ্যায়—

সাঃ শোনামখী—জেলা বর্দ্ধমাণ—

সন ১২৭০ সাল—২১ কার্ত্তীক—

ফিরিস্তী—বর্ত্তমান বানান—"ফিরিস্তি" অর্থ—ফর্দ্দ, তালিকা, কাগজের খণ্ড, list, inventory, leaf or sheet of paper.

ফিরিস্তী কাগজ—অর্থ ফর্দ্দের কাগজ।

মোঃ—অর্থ মোকাম বা ঠিকানা।

কলীকার্ত্তা—বর্ত্তমান বানান "কলিকাতা" পূর্ব্বে ইহার বানান ঠিক ছিল না।

রঙ্গবটী—অর্থ বর্ণ, রঙ, রঞ্জক দ্রব্য, কীট দ্বারা স্রষ্ট্য হইয়া গাছের গাত্রে উচু উচু আব বিশেষ, যাহা হইতে অগ্নি উত্তাপে গালা নির্গত হয়।

গালা—Shellac যাহা অনেকেই দেখিয়াছেন—এই গালা হইতে চাঁচ গালা তৈয়ারী হয়।

বিক্রীর—অর্থাৎ বিক্রয়ের ওজন রসিদ বহি।

অক্ষ—অর্থাৎ অক্ষয় যাহার নাশ নাই।

বঙ্গীয়—অর্থাৎ বাংলা।

রশীদ বহি—যে বহিতে ক্রেতা এত মণ মাল পাইলাম লিখিয়া সহি করেন।

সরকার—সরকারের কার্য্য আমদানি ও রপ্তানি মালের ওজন লেখা ও প্রতি হিসাবের নিম্নে তাহাকে নাম ও নিজ বাটীর ঠিকানা ও তারিখ লিখিতে হয়।

শ্রীজুত—বর্ত্তমান বানান "শ্রীযুক্ত" বর্ত্তমান কালে ইংরাজিতে কাহার নাম লিখিতে হইলে মিষ্টার, শ্রীযুক্ত বা বাবু (Mr., Srijukta or Babu) লিখিয়া নাম লেখার পদ্ধতি নাই—ইহা পাশ্চাত্য পদ্ধতি। কিন্তু আমাদের দেশে নাম লিখিতে হইলে নামের পূর্ব্বে "শ্রী বা শ্রীযুক্ত" না লিখিলে অনম্রতা ও অশিক্ষার পরিচায়ক হইত।

জয়রাম বন্দোপাধায়—বর্ত্তমানে "বন্দ্যোপাধ্যায়" এই বানান লিখিয়া থাকেন। কারণ গ্রামের নাম "বন্দ্যঘটী" ও বৈদিক কার্য্যের নাম "উপাধ্যায়"।

সাঃ—অর্থ সাং অর্থাৎ সাকিম বাড়ির ঠিকানা।

শোনামখী—বর্ত্তমানে "সোণামুখী" এই বানান লেখা হয়।

জেলা বর্দ্ধমাণ—সন ১২৭০ সালে—সোণামুখী গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সন ১২৭০ সাল—২১ কার্ত্তীক—বর্ত্তমানে "কার্ত্তিক" লিখিত হয়। ২১এর পর ২১শে—যেমন ৪ঠা ৭ই, ৮ই ইত্যাদি কেমন করিয়া বাংলা

লিখিত ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে—বলা কঠিন। জয়রাম যে কেবল "২১" লিখিয়াছেন—এই পদ্ধতি বর্ত্তমানে পঞ্জিকায় দেখা যায়।

উপরি লিখিত কয় ছত্রে ঠাকুর হরনাথের জীবনীর অনেক কথা জানা যায়। জয়রামের হস্তাক্ষরের তারিখ ২১ কার্ত্তিক ১২৭০ সাল অর্থাৎ ঠাকুর হরনাথের জন্মের ১ বৎসর ৮ মাস পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এই ১।৮ মাসের মধ্যে জয়রাম যে সরকার সেই সরকারই ছিলেন। তখন তাঁহাকে জমিদার বা ধনী লোক বলা চলে না। যাহারা বিনা অনুসন্ধানে হরনাথ সঙ্গতিপন্ন গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ লিখিয়াছেন তাহা কখনই সত্য নহে।

জয়রাম ২৭।২৮ বৎসর বয়সে স্বাধীনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করেন ও দুই তিন বৎসর মধ্যে সোণামুখীর মধ্যে তিনি একজন সঙ্গতিপন্ন লোক হইয়াছিলেন—এই সব কথা বিনা অনুসন্ধানে উপন্যাস লেখার ন্যায় অমিয় হরনাথ জীবনীতে কেন যোজনা করিয়াছেন জানি না। আত্ম মোহ বশতঃ শ্রীমদ্ভাগবত বা গীতার বেদব্যাস বা সঞ্জয় ইত্যাদি দিব্য চক্ষুষ্মান সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানিগণের আসন অধিকার করিয়া ভ্রমপূর্ণ অসত্য বর্ণনাকারিগণের কার্য্যাদি ভাল কি মন্দ ইহা বিচার করিবার বিদ্যা, বুদ্ধি বা সামর্থ্য আমার নাই।

চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের ন্যায় হরনাথও দরিদ্র ব্রাহ্মণ জয়রামের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবান মানবরূপে অবতার গ্রহণ কালে সম্রাট মহারাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করা কিছু অসম্ভব নয় কিন্তু এক বুদ্ধদেব ব্যতীত সকল অবতারগণই যাঁহাদের নামে বর্ত্তমানে ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে সকলেই দরিদ্রের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরনাথও অর্থবানের গৃহে জন্ম গ্রহণ না করিয়া ধার্ম্মিক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—ইহাতে ভগবানের গৌরব ছাড়া অগৌরব কোথায়। দরিদ্রেরা ধনী ব্যক্তিগণের পদলেহন, পাদুকা বহন করিবার জন্য শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছায় ইহ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন—তাঁহাদিগের স্বাধীনতা কোথায়। এই দুঃখ দারিদ্রতার মধ্যে অল্পাহারে, অনাহারে তাঁরা কেমন করিয়া শ্রীগোবিন্দকে স্মরণ করিয়া থাকেন ইহাই আস্বাদন ও রসানুভব করিবার জন্য শ্রীহরিকে বাধ্য হইয়া দরিদ্রের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

এখন হস্তাক্ষর সম্বন্ধে কিছু আলোচনার আবশ্যক। এই লেখা দেখিয়া বেশ বুঝা যায়—এই লেখা কঞ্চি বা খাঁকের কলমে লেখা—সে সময়ে ষ্টিল নিভে (Steel nibs) লেখা আরম্ভ হয় নাই। জয়রামের হাতের লেখা দেখিয়া ৪৫০

বৎসর পূর্ব্বের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর, নিত্যানন্দ প্রভু, রূপ, সনাতন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইত্যাদি প্রভুগণের হস্তাক্ষরের স্মরণ হয়। ঐ সকল লেখার নকলপরে প্রদত্ত হইবে। বর্ত্তমান কালে হস্তাক্ষর সম্বন্ধে অনেক রহস্য উদ্ঘাটন হইয়াছে। হাতের লেখা দেখিয়া ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিক, ধনী কি দরিদ্র, পণ্ডিত কি মূর্খ নানা বিষয় অবগত হওয়া যায়। এই হস্তলিপি সম্বন্ধে Dr. R. H. Chandler ইত্যাদি মহাত্মাগণের অনেক পুস্তক আছে। এই বিষয় সম্বন্ধে আর আলোচনা করিব না। জয়রামের হস্তাক্ষর সনাতন গোস্বামীর হস্তাক্ষরের অনুরূপ। জয়রামের মধুর চরিত্র সনাতন গোস্বামী প্রভুর চরিত্রের সহিত অনেক মিল পাওয়া যায়।

সনাতন, রূপ ও বল্লভ প্রভুর পিতার নাম কুমারদেব ও মাতার নাম রেবতী। এই বল্লভের পুত্রের নাম জীব গোস্বামী। ছয় জন গোস্বামীগণের মধ্যে ইঁহারা তিন জন ছিলেন। সনাতনের নাম অমর, জন্ম ১৪৮৮ খ্রীঃ ও তিরোধন ১৫৫৮ খ্রীঃ। রূপের নাম ছিল সন্তোষ, জন্ম ১৪৮৯ খ্রীঃ ও তিরোধান ১৫৬৩ খ্রীঃ। জীব গোস্বামীর নাম অনুপম।

সনাতন ও রূপ উভয় ভ্রাতাই গৌড়েশ্বর হুসেন খাঁর উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী এবং অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। ইহাদিগের অত্যাচার জগাই মধাইএর অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। ঘোর অত্যাচারী ও অতুল বিষয়োপভোগ করিয়া অন্তরের বৈরাগ্য বহ্নি নানা প্রকারের বিলাসিতা ভোগে নিস্তেজ হয় নাই, ক্রমশই প্রজ্জলিত হইতেছিল, কৃষ্ণকে কি উপায়ে পাওয়া যায় ইহাই তাঁহাদের অন্তরের বাসনা ছিল। রূপ ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্রে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বিন্দাবনে সাধন সমরে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর সনাতন ঘোর সংসারী হইয়া উঠিলেন এবং ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া কেবল স্বার্থসাধনের সুবিধা করিয়া লইতে লাগিলেন। এই সময় সনাতনের কার্য্য কুশলতা প্রদর্শন করিয়া গৌড়েশ্বর প্রীত হইয়া তাঁহাকে রাজমন্ত্রী করেন। নিজ ভদ্রাসন প্রসারিত করা অভিপ্রায়ে সনাতন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাস্তুভূমির উচ্ছেদ করিয়া জোর করিয়া উহা অধিকার করেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া পদব্রজে বৃন্দাবনে যাইয়া রূপের শরণাপন্ন হইলেন। রূপ ব্রাহ্মণের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়া সনাতনকে একখানি পত্রে "য—ল্পী, র—লা, ই—রং, ন—য়" এই আটটী অক্ষর লিখিয়া দিয়া ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। উভয় ভ্রাতাই সংস্কৃত বিদ্যায় বিলক্ষণ সুপণ্ডিত ছিলেন। সনাতন এই অষ্টাক্ষর দ্বারা এই শ্লোকটি পূরণ করিয়া লইলেন :—

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতে ক গতোত্তর কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃস্থিরং,
নশ্বরং জগদিদমবধারয় ॥"

শ্লোকের মর্ম্মার্থ হৃদগত হইলে, সনাতনের চৈতন্যোদয় হইল। অতঃপর ইনি ব্রাহ্মণকে স্ববাসে থাকিতে দিলেন এবং নিজে সংসার ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কথিত আছে সনাতন সন্ন্যাসী হইয়া বৃন্দাবনে বাস কালিন পরশ মণি বা পাথর পান। এই পরশ পাথর লৌহ দ্রব্যে স্পর্শ করিবা মাত্র স্বর্ণ হইয়া যাইত। তিনি এই পাথরখানি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দিয়াছিলেন। এখন কিন্তু এরূপ পাথরের কথা শুনা যায় না। রূপ ও সনাতন ঈশ্বর ব্যতীত সকল দ্রব্যই তুচ্ছ ও নশ্বর বুঝিয়াছিলেন।

আমাদের জয়রাম ও তৎপুত্র হরনাথ নির্লিপ্তভাবে সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে তিরোধান দিন পর্য্যন্ত জয়রাম ও হরনাথ শ্রীহরি যে জগতে সর্ব্বেশ্বর এ কথা কখন ভুলেন নাই। কমলা, শিবনারায়ণ ও হরনাথকে সর্ব্বদাই জয়রাম বলিতেন আকাশের জল, গাছের ফল, ইত্যাদি সকল দ্রব্যই শ্রীহরির। জয়রাম মাঝ ডোবার ১৭৯ বিঘা জমি খরিদ করিয়া—সকল সম্পদই নশ্বর জ্ঞানে দখল করিতে পারেন নাই। জয়রাম পরপীড়ন কাহাকে বলে জানিতেন না, মাঝির ডাঙ্গার পৈত্রিক জমির উপসত্ত্ব বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। সংসারী হইয়াও যখন পূজায় বসিতেন তখন তাঁর চৈতন্য থাকিত না—গভীর ধ্যানে বা সমাধিতে দুই তিন ঘণ্টা মগ্ন থাকিতেন। শিব রাত্রের দিন জয়রাম মধ্যাহ্নে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তৎপর দিন মধ্যাহ্নে ও ধ্যান মগ্ন থাকিতেন। ভগবতী দেবী ও কমলা অনেকবার চেষ্টা করিয়া তাঁর চৈতন্য উৎপাদন করিতে পারিতেন না। লোভ বা ক্রোধ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। জয়রামকে একদিনও কেহ ক্রোধ করিতে দেখেন নাই। মিষ্ট কথা ছাড়া কটুকথা তাঁর মুখ হইতে বাহির হইত না। তিনি কখন কাহাকেও তুই বা তুমি বলিতে পারিতেন না, সর্ব্বদাই সকলকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। হরনাথ তাঁর পিতৃদেবের পূর্ণ ছবি ছিলেন। জয়রামের হস্তাক্ষরের নিম্নে হরনাথ সত্য কথাই লিখিয়াছেন "আমার সাক্ষাৎ শিবতুল্য পিতৃদেবের স্বহস্ত লিখিত এই অক্ষরকটা দেখিয়া সাক্ষাৎ পিতৃদর্শনের পূর্ণানন্দ অনুভব করিলাম ও নিজেকে মহা ভাগ্যবান মনে করিলাম।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জয়রামের বংশাবলী।
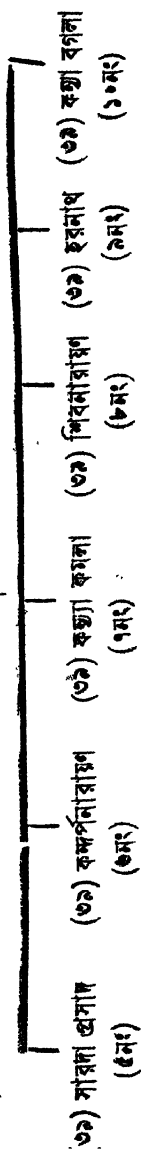
(১নং) কুঞ্জবিহারী—জন্ম ১১২২ সাল (ইং১৭১৬) ৫৮ বৎসরে মৃত্যু ১১৮০ সাল (ইং ১৭৭৪ সাল) সোণামুখীতে গালা ও পাটের (রেশমের) কাজ করিতেন। পিতার নাম ৩৪ পঃ রামচন্দ্র বা রামমুরলী—রামমুরলীর চারি পুত্র—জ্যেষ্ঠের নাম (১ম) কুঞ্জবিহারী, (২) 'লবিহারী, (৩য়) নরসিংহ ও (৪র্থ) গোকুল। এই চারি ভ্রাতার বংশলতা পরে প্রদত্ত হইবে। ইহাঁদের বংশ বিস্তারের বিবরণ ২৭ পাতায় দেওয়া হইয়াছে। ৩৪পঃ রামমুরলীর দীক্ষাগুরু একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। এই সন্ন্যাসী তাঁর শিষ্য রামমুরলীর নিকট সোণামুখীতে বাস করিতেন। রামমুরলীর পিতা ৩৩পঃ যজ্ঞেশ্বরের (চতুর্থ পাতা দ্রষ্টব্য) কে দীক্ষাগুরু ছিলেন তাহা অবগত হইতে পারা যায় নাই। কুঞ্জবিহারীর দীক্ষাগুরু ছিলেন গোপীনাথপুর নিবাসী বন্ধু জাহ্নবীর পরিবার অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় বংশের সন্তান (১নং) বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী মহাশয়। এই বৈষ্ণবচরণ গোস্বামীর বংশের ৫পঃ শিতিকণ্ঠ গোস্বামী মহাশয় পাগল হরনাথ ও ক্ষ্যেপী ঠাকুরাণীর দীক্ষাগুরু ছিলেন। মহাপ্রভু ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—এত অল্প সময়ের মধ্যে মহাপ্রভুর বংশের চারি প্রকারের বিভিন্ন বংশলতার আবির্ভাব হইয়াছে এমন কি মহাপ্রভুর পূর্ব্ব পুরুষের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে গোল দেখা যায় যথা শ্রীহট্ট কি যাজপুর। যদি আমাদিগের আরাধিত পাগল ঠাকুর ও ক্ষ্যেপী ঠাকুরাণী ৫।৭ শত বৎসর পরেও, ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হন, তখনকার ভক্তগণের তিল মাত্র সন্দেহ যাহাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে এই কড়চা রচিত হইয়াছে। লেখকের দৃঢ় ধারণা এই আসল হীরক খণ্ডের জ্যোতি এখন পূর্ণ বিকাশিত না হইলেও সময়ে ভূমণ্ডলকে আলোকিত করিবে। পাগল হরনাথের বংশলতার এত আলোচনা করিতেছি ইহার জন্য আমাকে স্নেহের চোখে দেখিয়া ক্ষমা করিবেন।

(২নং) মদন গোপাল—জন্ম ১১৪৬ সালে (ইং ১৭৩৯ সাল) ৫১ বৎসরে মৃত। মৃত্যু সন ১১৯৬ সাল (ইং ১৭৯০ সাল)। গালা ও পাটের

কাজ করিতেন। বেলিয়াড়া গ্রামে বিবাহ করেন। এই বেলিয়াড়া গ্রামে (চলিত কথায় বেলেড়া গ্রাম বলে) মদন গোপালের একমাত্র পুত্র শ্রীকান্ত বিবাহ করিয়াছিলেন। মদন গোপালের কনিষ্ঠ সহোদরের নাম রামানন্দ, এই রামানন্দের বংশলতা পরে প্রদত্ত হইবে। ইঁহার বংশ বিস্তারের বিবরণ ৩৬ পাতায় দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ব লিখিত বৈষ্ণব চরণ সিদ্ধান্তরত্ন গোস্বামী প্রভুর পুত্র (২য় পঃ) বামনচন্দ্র গোস্বামী। এই প্রভু বামনচন্দ্র গোস্বামী মদনগোপালের দীক্ষাগুরু ছিলেন।

(৩নং) শ্রীকান্ত—জন্ম সন ১১৬৬ সাল (ইং ১৭৫৯ সাল) ৬১ বৎসরে মৃত। মৃত্যু সন ১২২৭ সাল (ইং ১৮২০ সাল) প্রথম স্ত্রীর নাম ভদ্রকালী—ইহার গর্ভের সন্তানাদির বিবরণ ৩৫ পাতায় দ্রষ্টব্য। গোপীনাথপুর নিবাসী প্রভুপাদ বামন চন্দ্রের পুত্র নবীন মোহন, শ্রীকান্তের দীক্ষাগুরু, তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী আদরমণিরও দীক্ষাগুরু ছিলেন।

দ্বিতীয় স্ত্রী আদরমণি—জন্ম সাল ১১৯৭ (ইং ১৭৯০ সাল) বিবাহ সন ১২০৮ সাল (ইং ১৮০১ সাল) ২৯ বৎসর বয়সে মৃত। মৃত্যু সন ১২২৬ সাল (ইং ১৮১৯ সাল) শ্রীকান্তের মাতুলালয় ও দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুরালয় বেলিয়াড়া গ্রাম।

(৪নং) জয়রাম—জন্ম ৫ বৈশাখ ১২১২ সাল (ইং ১৮০৫ সাল) বিবাহ ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২ সাল (ইং ১৮৩৫), মৃত্যু ৯ পৌষ ১২৭৫ সাল (ইং ২২ ডিসেম্বর ১৮৬৮) মৃত্যুর সময় ৬৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ১৪ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়। ১৫ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হয়। ৩০ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন।

পত্নী ভগবতী দেবী—৩ আশ্বিন ১২৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন (ইং সেপ্টম্বর ১৮২৪ সাল)। মৃত্যু ২১ ফাল্গুন শুক্ল ষষ্ঠী বৃহস্পতিবার ১৩০৯ সাল (ইং ৫ মার্চ্চ ১৯০৩ সাল) মৃত্যুর সময় ৭৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ১০ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। ১২ বৎসর বয়সে প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ বৎসর বয়সে দ্বিতীয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ৩৪ বৎসর বয়সে কন্যা কমলার জন্ম হয়, ৩৮ বৎসর বয়সে তৃতীয়

পুত্র শিবনারায়ণের জন্ম হয়। ৪০ বৎসর বয়সে চতুর্থ পুত্র হরনাথের জন্ম হয়। ৪১ বৎসর বয়সে কন্যা বগলার জন্ম হয়। ৪৩ বৎসর বয়সে বিধবা হন। ৬০ বৎসর বয়সে গাঁলার ব্যবসা বন্ধ করেন।

(৫নং) জয়রামের প্রথম পুত্র সারদাপ্রসাদ, ১২৪৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ৯ বৎসর বয়সে তাঁর উপনয়ন হয়। এই উপনয়ন হবার কয়েক মাস পরে পরলোকগমন করেন। সারদাপ্রসাদ বাল্যকাল হইতে ধীর প্রকৃতির বালক ছিলেন।

(৬নং) জয়রামের দ্বিতীয় পুত্র কন্দর্পনারায়ণ ১২৪৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। এই পুত্র ১০ বৎসর বয়সে ১২৫৬ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রথম পুত্র সারদা প্রসাদ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কন্দর্পনারায়ণকে বিশেষ ভালবাসিতেন। তাঁহাদের দুই ভ্রাতার আকৃতি গলার স্বর চলন ভঙ্গি ঠিক যমজ ভ্রাতার ন্যায় ছিল—দুই ভাই সর্ব্বদাই এক সঙ্গেই থাকিতেন। দুই ভ্রাতার ভিন্ন দেহ হইলেও তাঁহারা হরিহর আত্মা ছিলেন। ১২৫৩ সালে সারদাপ্রসাদ ৯ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইবার সময় কন্দর্পনারায়ণের বয়স মাত্র ৭ বৎসর কিন্তু কন্দর্পনারায়ণ বড় ভ্রাতার মৃত্যুতে মূহ্যমান হইয়া পড়েন ও সর্ব্বদা তাহার শোকে বিমর্ষ থাকিতেন—হাসি খেলা চলিয়া গিয়াছিল। এইরূপ ভাবে থাকিতে থাকিতে কন্দর্পনারায়ণ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন—তাঁর হাঁপানি কাশীর লক্ষণ দেখা যায়। সোণামুখীতে দুই বৎসর যাবৎ তাহার কবিরাজি চিকিৎসা হয়—ইহাতে কিছু না হওয়াতে, জয়রাম তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া সাত আট মাস চিকিৎসা করাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। তাই তিনি বাধ্য হইয়া তাহাকে সোণামুখীতে আনেন ও ১২৫৬ সালে—১০ বৎসর বয়সে মারা যায়।

(৭নং) জয়রামের তৃতীয় কন্যা কমলা ১২৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ তখন ভগবতী দেবীর বয়স ৩৪ বৎসর আর জয়রামের বয়স তখন ৫৪ বৎসর। দ্বিতীয় পুত্র কন্দর্পনারায়ণের ১২৫৬ সালে মৃত্যু হইলে পর, ১০ বৎসর পরে এই কন্যার জন্ম হয়—কাজে কাজেই কমলা বড় আদরের কন্যা ছিলেন। জয়রাম ও ভগবতী দেবী কমলাকে

প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতেন। ভগবতী দেবীর দ্বিতীয় পুত্র কন্দর্প নারায়ণের মৃত্যুর ৭।৮ বৎসর পর তাঁর আর পুত্র কন্যা হইবে না, এরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল, প্রতিবেশিনীরা আর সন্তান হইল না বলিয়া দুঃখ করিতেন। ভগবতী দেবী সর্ব্বদাই তাঁদের কুলদেবতার নিকট পুত্র কামনা করিতেন। একদিন স্বপ্নে শুনেন যেন তাঁদের শ্যামসুন্দর বলিতেছেন তুমি প্রত্যহ অন্ততঃ একজন অতিথিকে অন্ন দান করিলে শীঘ্রই সন্তান লাভ করিবে। সেই অবধি প্রত্যহ অতিথি ভোজন করাইতেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই কন্যা কমলাকে লাভ করেন। ভগবতী দেবী তাঁর শেষ দিন পর্য্যন্ত এই অতিথি সেবা ব্রত পরিত্যাগ করেন নাই। সত্য বলিতে কি—সেই ব্রত অদ্যাপি হরনাথ সংসারে সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে।

জয়রাম ১২৭৬ সালের বৈশাখ মাসে কমলার বিবাহ দিবার স্থির করিয়াছিলেন। গাত্র হরিদ্রাদি শুভকার্য্য সকলও করিয়াছিলেন। বাঁকুড়ার সন্নিকট শুশুনা নিবাসী শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ দিবার স্থির করেন কিন্তু কমলার বিবাহ তিনি দিয়া যাইতে পারেন নাই কারণ ৯ পৌষ ১২৭৫ সালে তিনি ইহলীলা শেষ করেন। ১২৭৬ সালের মাঘ মাসে কালাশৌচ যাইলে ভগবতী দেবী কমলার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। কমলার পাঁচটী পুত্র সন্তান হয়। প্রথম পুত্র শরৎচন্দ্র, ২য় পুত্র হেমচন্দ্র, ৩য় পুত্র মণীন্দ্র, ৪র্থ পুত্র নলিন ও ৫ম পুত্র পুলিন। হরনাথের তিরোধানের পর ৫ আষাঢ় ১৩৩৬ সালে (ইং ১৯ জুন ১৯২৯ সাল) কমলার ৬৯ বয়সে মৃত্যু হয়।

কমলা দেবী হরনাথকে সর্ব্বদা কোলে করিয়া বেড়াইতেন। আঁতুড় হইতে তিন চার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হরনাথ কমলার কোলে কোলে থাকিতেন। এই কমলা পূর্ব্ব জন্মে কে ছিলেন জানি না, তবে হরনাথের উপর তাঁর স্নেহ ভগবতী দেবীর অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। আমি এই কমলা দেবীর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। হরনাথের বাল্য জীবনের অনেক

কথা তিনি বলিয়াছেন ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ৺পুরীধামের রথযাত্রা উপলক্ষে রথে জগন্নাথদেবের নব কলেবর দেখিবার জন্য সমবেত পাঁচ লক্ষ যাত্রিদের মধ্যে কমলা দেবী ও শিবনারায়ণের জ্যেষ্ঠ কন্যা বিনোদিনী হারাইয়া যায়। হরনাথ আহার পরিত্যাগ করিলে রাত্রে ভাগবত একাকী হরনাথের আশীর্বাদে পাঁচ লক্ষ যাত্রিগণের মধ্য হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া হরনাথ সমীপে উপস্থিত করিয়া তার জীবনকে ধন্য করিতে পারিয়াছে। ঠাকুর হরনাথ আলিঙ্গন করিয়া ৫০০৲ শত টাকা বেতন হউক বলিয়া ভাগবতকে আশীর্বাদ করেন। তখন ভাগবত ৪০৲ টাকা বেতন পাইতেন। সময়ে অর্থাৎ ১৯২০ খ্রীঃ ভাগবত পূর্ণ ৫০০৲ টাকা বেতন পাইতেন অধিকন্তু এই ৫০০৲ টাকার উপর ১২৫৲।১৫০৲ টাকা মাসিক বেশি পাইতেন। ঠাকুর হরনাথ ইহা দেখিয়া গিয়াছেন।

(৮নং) জয়রামের চতুর্থ পুত্র শিবনারায়ণের ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৭০ সালে জন্ম হয়। শিবনারায়ণ যে পাঠশালায় ভর্তি হন সেই পাঠশালায় হরনাথ এক বৎসর পরে ভর্তি হইয়াছিলেন। শিবনারায়ণের পাঠশালার সহপাঠীগণের নাম (১) রামবিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায় (২) তেজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩) গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও (৪) মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০ চৈত্র ১২৭৯ সালে শিবনারায়ণ ও হরনাথের একসঙ্গে উপনয়ন হয়। উপনয়ন কালে শিবনারায়ণের বয়স প্রায় ১০ বৎসর ও হরনাথের বয়স প্রায় ৮ বৎসর হইয়াছিল। স্কুল ছাড়িবার পূর্ব্বে ভগবত দেবী শুক্ল সপ্তমী বৃহস্পতিবার ১৩ শ্রাবণ ১২৮৩ সালে (ইং ২৭ জুলাই ১৮৭৬ সাল) বাঁকুড়া জেলার গোপবাদী গ্রামে বিবাহ দেন। শিব নারায়ণের স্ত্রীর নাম গোলাপ সুন্দরী ওরফে বিহারিণী। বিবাহ সময় শিবনারায়ণের ১৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল ও তাঁর স্ত্রী গোলাপ সুন্দরীর ১১ বৎসর বয়স হইয়াছিল। বাল্যকালে কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বিবাহ সময়ে গোলাপ সুন্দরীকে ৮,৯ বৎসরের বালিকা বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

৩ মাঘ ১২৮৮ সালে শিবনারায়ণ ও তাঁর স্ত্রী একত্র বাঁকুড়া জেলার গোপীনাথপুর নিবাসী তাঁহাদের কুল গুরু বিশ্বম্ভর গোস্বামী দ্বারা দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

শিবনারায়ণের একটী কন্যা ও দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম কন্যার নাম বিনোদিনী, ইনি ও হরনাথের ভগ্নী কমলা জগন্নাথদেবের নবকলেবর ও রথযাত্রা উপলক্ষে হরনাথের সহিত পুরী গিয়া হারাইয়া গিয়াছিলেন। শিবনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র গোকুল চন্দ্র, ইনি কাশ্মীরে হরনাথের নিকট থাকিতেন ও পঞ্জাব হইতে মেট্রিক পাস করিয়াছেন। তৃতীয় পুত্র নকুলচন্দ্র, নকুলচন্দ্র বিবাহের পূর্ব্বে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

(ক) কন্যা বিনোদিনীর জন্ম কৃষ্ণ দ্বিতীয়া সোমবার ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৩ সাল (ইং ১৩ ডিসেম্বর ১৮৮৬) ১৩ আষাঢ় ১৩০৩ সালে (ইং ২৬ জুন ১৮৯৬) শুশুনার কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। ২৭ পৌষ ১৩২৫ সালে (ইং ১১ জানুয়ারী ১৯১৯ সাল) স্বামী বিয়োগ হয়। ঠাকুর হরনাথ নিজে কালীকে কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আনেন ও কলিকাতা ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হইবার নবম দিনে মৃত্যু হয়, তাঁকে নিমতলা ঘাটে সৎকার করা হইয়াছিল। হরনাথ ঠাকুর সেই সময় কলিকাতায় ছিলেন। ৩১ শ্রাবণ ১৩৩৭ সালে (ইং ১৬ আগষ্ট ১৯৩০ সাল) বিনোদিনীর মৃত্যু হইয়াছে। বিনোদিনী দুই পুত্র (ফকিরচাঁদ ও দ্বিজপদ) ও দুই কন্যা (রাণী ও রেনুকা) রাখিয়া গিয়াছেন।

(খ) পুত্র গোকুল চন্দ্র--জন্ম ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ সাল (ইং ৭ জুন ১৮৯০ সাল) দুই বিবাহ প্রথম স্ত্রীর নাম মিরণবালা বা কুলকুমারী—কুলকুমারীর গর্ভে কন্যা কনকলতা ও পুত্র নন্দলাল জন্মগ্রহণ করে।

দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম—যমুনা সুন্দরী।

(গ) পুত্র নকুলচন্দ্র—জন্ম ৩ আশ্বিন ১৩০৮ সাল (ইং ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০১ সাল) ১০ শ্রাবণ ১৩২৫ সালে মৃত্যু হয়। ১৭ বৎসর বয়সে মৃত। বিবাহ হয় নাই।

(৯নং) জয়রামের পঞ্চম পুত্র হরনাথ—
জন্ম ১৮ আষাঢ় ১২৭২ সাল (১ জুলাই ১৮৬৫)
অন্নপ্রাসন—১৪ ফাল্গুন ১২৭২ (২৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৬)
বিদ্যারম্ভ—১২ মাঘ ১২৭৬ (২৪ জানুয়ারী ১৮৭০)
উপনয়ন—২০ চৈত্র ১২৭৯ (১ এপ্রেল ১৮৭৩)
বিবাহ—১১ মাঘ ১২৮৫ (ইং ২৯ জানুয়ারী ১৮৭৯)
দীক্ষা—৫ চৈত্র ১২৯০ (ইং ১৭ মার্চ্চ ১৮৮৪)
তিরোভাব—১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ (ইং ২৫ মে ১৯২৭)

ঠাকুর হরনাথের তিন কন্যা ও দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দ্রষ্টব্য।

(১০নং) জয়রামের ষষ্ঠ কন্যা বগলা—জন্ম ২০ চৈত্র ১২৭৩ সাল। মৃত্যু ৭ চৈত্র ১২৮০ সাল। ৭ বৎসর বয়সে বসন্তরোগে মৃত্যু হয়।

হরনাথের দুই পুত্র ও তিন কন্যার বিবরণ।

(ক) কন্যা ইন্দুমতী—জন্ম ৯ শ্রাবণ ১২৯৪ সাল (মামার বাড়িতে জন্ম হয়) ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩০৩ সালে সোণামুখীর সিদ্ধান্তপাড়া নিবাসী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। ইনি বি, ডি, আর রেলে (B. D. R. Railway) কাজ করিতেন। ২৩ ভাদ্র ১৩০৯ সালে মৃত্যু হয়। কোন সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করে নাই।

(খ) দ্বিতীয় পুত্র অনুকুল—জন্ম মামার বাড়িতে ১১ বৈশাখ ১২৯৭ সাল শুক্ল চতুর্থী বুধবার (ইং ২৩ এপ্রেল ১৮৯০) দুই বিবাহ প্রথম বিবাহ কোচ ডিহি গ্রামে—স্ত্রীর নাম সন্তোষ কুমারী। সন্তোষ কুমারীর গর্ভে প্রথম কন্যা সুষমা সুন্দরী, ডাক নাম মেনকু, কোচড়িহি মামার বাড়িতে জন্ম হয়। সুষমা সুন্দরীর চারিটী পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যথা (১) রাম (২) শ্যাম (৩) লক্ষ্মী (৪) নাম হয় নাই।

অনুকুল চন্দ্রের প্রথম স্ত্রী, দ্বিতীয়বার প্রসবান্তে প্রসূতি ও পুত্র সন্তানের সোণামুখীতে মৃত্যু হয়। ঠাকুর হরনাথের সেবক ভাগবত

পরিবারবর্গের সহিত নৈনিতাল পাহাড় হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব দিনে সোণামুখীতে পৌছিয়াছিলেন। প্রসব না হওয়াতে রোগীর এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে তখনি মৃত্যু হয়। বাড়িতে রান্না বন্ধ হইয়াছিল। সোণামুখীতে আমরা সকালে পানাগড় হইতে পৌছিয়া ছিলাম। স্নান করিয়া শিব মন্দিরের পূর্ব্বদিকের ঠাকুরের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে মধ্যাহ্নে আহার করি ও আহারান্তে সোণামুখীর সুচাঁদ কর্ম্মকার দ্বারা পানাগড় (কারণ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ছোট রেল লাইন B, D. R. Railway খোলে নাই—এই লাইনটী ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে খোলা হইয়াছে) যাইবার গোশকট ঠিক করিয়া ঠাকুরের নিকট কলিকাতা যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করি। ঠাকুর অনুমতি দিলেন না অধিকন্তু বলিলেন, সংসারে যাহা ঘটিবার ঘটুক ইহার জন্য তুমি বিচলিত হও কেন? অনেক দিন পরে তুমি আসিয়াছ, তুমি চলিয়া গেলে আমার কষ্ট হবে। অগত্যা বাধ্য হইয়া এক সপ্তাহ থাকিতে হইয়াছিল। আমার সোণামুখীতে পৌছিবার পরদিন অনুকূলের স্ত্রী মারা গিয়াছিলেন।

এখানে ঠাকুর হরনাথের বাটীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক (১) জয়রামের নির্ম্মিত চারিখানি খড়ের চালা ঘর (২) ভগবতী দেবী নির্ম্মিত ইটের দ্বিতল বাটী (৩) হরনাথ দ্বারা খরিদা জমির উপর করগেট সিটের দ্বিতল মাঠ কোটা এই জমির পার্শে কলিকাতার রামরাখাল ঘোষের নির্ম্মিত একতলা ইটের বাড়ি খরিদ করেন ও এই জমির সংলগ্ন আর এক বন্দ জমি খরিদ করিয়া তাহার উপর রান্না ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ হরনাথের জীবনীতে পাইবেন। ১৯১০ সালে হরনাথ নিজ নির্ম্মিত দ্বিতল মাঠ কোঠার উপরে থাকিতেন অনুকূল ও তাঁর স্ত্রী ভগবতী নির্ম্মিত বাটীর ঠাকুর হরনাথের অংশের দ্বিতলে থাকিতেন। অনুকূল চন্দ্রের প্রথম স্ত্রী ভগবতী দেবীর বাড়িতে মারা গিয়াছিলেন।

অনুকূল চন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহ নায়েক বাঁধ গ্রামে হয়, স্ত্রীর নাম স্নেহলতা, ১৩ বৈশাখ ১৩২১ সালে বিবাহ হয়।

দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে ৪টী পুত্র ও ৩টী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে পুত্র ও কন্যাগণের নাম—(১) রবিনারায়ণ (২) অঞ্জলি (৩) বিজয় (৪) কন্যা পুষ্প (৫) সুনীল (৬) কন্যা আরতি ও (৭) কন্যা সুনীতি। হরনাথের কুলগুরু শিতিকণ্ঠের পুত্র কুলদা গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

অনুকূল ও গোকুল কাশ্মীর অবস্থান কালে পাঞ্জাবে মেট্রিক পরিক্ষা দিয়াছিলেন। অনুকূল পাটের ব্যবসা শিক্ষা করিবার জন্য তিন বৎসর ১৬৮নং আপার সার্কুলার রোডস্থ নারাণচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

(গ) তৃতীয় কন্যা সুবাসিনী—জন্ম নিজ বাটীতে ৩ আষাঢ় ১৩০০ (ইং ২৬ জুন ১৮৯৩)। ৮ বৎসর বয়সে মামার বাড়ির পুষ্করিণীতে ঠাকুরাণীর ভগ্নী দামিনীর ৭ বৎসরের কন্যা অমূল্যরাণীর সহিত একত্রে ডুবিয়া মৃত্যু হয়। মধ্যাহ্নে আহারান্তে দুই জনে হাত ধুইতে গিয়া পুকুর পাড়ের কাঠ স্থানচ্যুত হওয়াতে দুই জনে জলে পড়িয়া গিয়া দৈবক্রমে জলমগ্ন হইয়াছিল। ঠাকুর সে সময় কাশ্মীরে ছিলেন।

(ঘ) চতুর্থ কন্যা রাইমতি—জন্ম নিজ বাড়িতে ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ সাল (ইং ৯ জুন ১৮৯৫)। কালনার মহাপ্রভুর বাটীর নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। মামার বাড়িতে ২৬ মাঘ ১৩২০ সালে একটী কন্যা প্রসব করিয়া ৯ দিন পরে মৃত্যু হয় ও কন্যাটী ২১ দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। রাইমতি অটলবিহারী নন্দী ও তাঁর স্ত্রীর নিকট হাতরাসে থাকিতেন। অটলবাবুর স্ত্রীকে সারিমা বলিয়া ডাকিত। ঠাকুর অটল বাবুর স্ত্রীকে সারি বলিতেন। ১৯০৩ খ্রীঃ হইতে বিবাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাইমতি অটল বিহারীর নিকটে ছিল। বিবাহ সময়ে অটলবিহারী ৫০০৲ টাকা দিয়াছিলেন।

(ঙ) পঞ্চম পুত্র কৃষ্ণদাস—জন্ম কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত জম্মু সহরে ৪ কার্ত্তিক ১৩০৬ (ইং ২০ অক্টোবর ১৮৯৯) জন্ম হয়।

মাঝডোবা নিবাসী জয়রামের মাতুল বংশের বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা গৌরীবালার সহিত ১২ বৈশাথ ১৩২৭ সালে বিবাহ হয়। কৃষ্ণদাসের চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পুত্রগণের নাম—সুবল সখা, বসন্ত, তুলসীদাস ও চন্দন।

গোপীনাথপুর নিবাসী কুলগুরু শিতিকণ্ঠ গোস্বামীর পুত্র কুলদাপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। অনুকূলচন্দ্রও এই কুলদাপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণদাস ২৪ নং মিডিল রোডের রামরাথাল ঘোষের বাড়িতে ৬ বৎসর থাকিয়া ম্যাট্রিক পড়েন ও পরে কটকের যোগেশচন্দ্র ঘোষের নিকট ছাপরা সহরে থাকিয়া ম্যাট্রিক দেন। এখন এই মিডিল রোডের ২৪নং বাটী হাইকোর্টের নিলামে ৪২০০০৲ টাকায় বিক্রিত হইয়া ৫৪নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটের অমিয় কুমার দে দিগের সম্পত্তি হইয়াছে। ৫৪নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটের শরৎ চন্দ্র দের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হরনাথ কলিকাতায় আসিলে এই বাড়িতে অবস্থান করিতেন। কৃষ্ণদাস ঠাকুর হরনাথের একটী কৃতী সন্তান। যেমন ধীর, তেমনি নম্র প্রকৃতি ও করুণার আধার। এমন যুবক ভবিষ্যতে একটী অমূল্য রত্নে পরিণত হইবে। মাঝডোবা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও সোণামুখী মিউনিসিপালিটীর ২নং ওয়ার্ডের একজন কমিশানার। এপ্রেল ১৯৩৭ সাল হইতে মার্চ্চ ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত চারি বৎসরের জন্য সাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁর মঙ্গল কামনা করি ও দিন দিন হরনাথ বংশকে উজ্জ্বল করুন।

(১০নং) কন্যা বগলা – জন্ম ২০ চৈত্র ১২৭৩ সাল। মৃত ৭ চৈত্র ১২৮০ সাল। ৭ বৎসর বয়সে বসন্ত রোগে মৃত্যু হয়।

"ক" পাগল হরনাথের উর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষগণের নাম।

চতুর্ব্বেদ বিশারদ শাণ্ডিল্য গোত্রে বেদব্যাস সদৃশ কলিব্যাস জন্ম গ্রহণ করেন। কলিব্যাসের পুত্র বামদেব ইত্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

কলিব্যাস
বামদেব
রামদেব
ক্ষিতীশ
(১) ভট্টনারায়ণ
(২) বরাহ
(৩) সুবুদ্ধি
(৪) বৈনতেয়
(৫) বিবুধেশ
(৬) সুভিক্ষ
(৭) ভয়াপহ
(৮) ধরণি
(৯) মহাদেব
(১০) মকরন্দ
(১১) দশো বা দাশরথী
(১২) বনমালী
(১৩) ভীম

(১৩) ভীম
(১৪) মাধব
(১৫) আদিত্য
(১৬) পীতাম্বর
(১৭) চতুর্ভুজ
(১৮) সবাই
(১৯) শ্রীগর্ভ
(২০) গৌরীকান্ত
(২১) চণ্ডীদাস
(২২) বিশ্বেশ্বর
(২৩) বলরাম
(২৪) হরিহর
(২৫) জগন্নাথ
(২৬) রাঘব পাঠক
(২৭) গোপী বা গুপি (বোবা ঋষি)
(২৮) রামেশ্বর

(২৮) রামেশ্বর
(২৯) মদনমোহন
(৩০) গঙ্গাধর
(৩১) পৃথ্বীধর
(৩২) সীতানাথ (স্ত্রী নিস্তারিণী)
(৩৩) যজ্ঞেশ্বর (স্ত্রী লক্ষ্মী)
(৩৪) রামমুরলী (স্ত্রী সুধামুখী)
(৩৫) কুঞ্জবিহারী (স্ত্রী—বরদা)
(৩৬) মদন গোপাল (স্ত্রী ভুবনেশ্বরী)
(৩৭) শ্রীকান্ত (স্ত্রী আদরমণি)
(৩৮) জয়রাম (স্ত্রী—ভগবতী)
(৩৯) হরনাথ
স্ত্রী কুসুম কুমারী

"খ" বন্দ্যঘটি বংশ

(২৬) রাঘব পাঠক চক্রবর্ত্তী ("ক" দ্রষ্টব্য)
(পাঠক চক্রবর্ত্তী রাজ উপাধি)

(২৭) গোপাল — (২৭) গোপীনাথ (গুপীনাথ)

৩ কন্যা

(২৮) রাজারাম (লাওগ্রাম) (২৮) রামেশ্বর (লাওগ্রাম) (২৮) মুরলী (মৃত) (২৮) নিশ্চিন্ত

(২৯) কামদেব — (২৯) মদন মোহন ঐ — কন্যা (বংশ লোপ)

(৩০) জয়চন্দ্র (নিত্যানন্দপুর) (৩০) গঙ্গাধর (অযোধ্যা)

(৩১) রামদেব — (৩১) পুষ্পাধব (জামবুনী)

(৩২) কানাই — (৩২) সীতানাথ ঐ

(৩৩) হরি (অযোধ্যা) — (৩৩) যজ্ঞেশ্বর (সোণামুখী)

(৩৪) লক্ষণ ঐ — (৩৪) রামমুরলী ঐ

(৩৫) বাসুদেব ঐ — (৩৫) কুঞ্জবিহারী, লালবিহারী, নরসিংহ, গোকুল

(৩৬) নিমাই (৩৬) বিনোদ (৩৬) আনন্দ

(৩৬) মদন (৩৬) রামানন্দ ''গ'

(৩৭) কৃষ্ণ, রাম, লালমোহন, গদাধর — (৩৭) বেণীমাধব, নীলমাধব

(৩৭) শ্রীকান্ত

(৩৮) ঈশান (৩৮) মহেশ

(৩৮) বেণীমাধব, ভৈরব, রাখাল, রাসবিহারী — প্রথম স্ত্রী ভদ্রকালী

(৩৮) হংসেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, রামদয়াল, জগন্নাথ,

(৩৮) বেচারাম (৩৮) আশুতোষ — (৩৮) কন্যা মন্দাকিনী

(৩৯) দর্পনারাণ, রাজারাম

(৩৯) মহিতোষ (৩৯) নীরদবরণ — ২য় স্ত্রী আদরমনি

(৪০) হরদয়াল — (৩৮) জয়রাম (স্ত্রী ভগবতী)

(পাগল হরনাথ ভজন কুটীর অযোধ্যায় বাস)

(৩৯) সারদাপ্রসাদ, কন্দর্পনারায়ণ, কন্যা কমলা, শিবনারায়ণ, হরনাথ, কন্যা বগলা

"গ" বোবা ঋষি গোপীনাথের বংশাবলী

১ম স্ত্রী   ২য় স্ত্রী   ৩য় স্ত্রী

৩৮ কার্ত্তিক ৩৮ কীর্ত্তি ৩৮ হরিশ ৩৮ সুচাঁদ ৩৮ পূর্ণ ৩৮ সুরেশ ৩৮ তেজ ৩৮ রতন

(৩৯) কুলদা   কন্যা ননীবালা

(৩৯) প্রফুল্ল   (৩৯) অনীল

৪০ দ্বিজ ৪০ বনবিহারী ৪০ জীতেন ৪০ শম্ভু

(৩৯) ভোলানাথ মৃত   (৩৯) ভূতনাথ

(৩৬ পঃ) রামানন্দজ নফরচন্দ্রের নিকট জয়রাম চাকরি করিতেন।

"ঘ" বোবা ঋষি গোপীনাথের বংশাবলী।

(৩৩) যজ্ঞেশ্বর (সোণামুখী)

(৩৪) রামমুরলী (সোণামুখী)

(৩৫) কুঞ্জবিহারী (৩৫) লালবিহারী (৩৫) নরসিংহ (৩৫) গোকুলচাঁদ "ঙ" দ্রষ্টব্য

(৩৬) মদনগোপাল "খ" দ্রষ্টব্য (৩৬) রামানন্দ

(৩৭) রুক্মিণীকান্ত (৩৭) কালী "গ" (৩৭) রমা "গ" (৩৭) যাদবেন্দ্র, "গ" (৩৭) গোপীনাথ, "গ" (৩৭) নফর "গ"

(৩৮) নদের চাঁদ (৩৮) মহেশচন্দ্র (স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী) (৩৮) জনার্দ্দন

(৩৯) বনমালি, রামকিঙ্কর, আশু (৪০) মনীন্দ্র, নরেন্দ্র, গিরীন্দ্র, ফণীন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র

বিনোদ

(৪০) মৃগেন্দ্র নৃপ, রতি

বাদল (৪১) পতাই সনাতন

(৪৪) গৌরীশঙ্কর, হরি, ভবানী

(৩৯) কেদার (৩৯) বিপীন (৩৯) রামসদয় (৩৯) বিভূতি (৩৯) রাধিকা, বৈদ্যনাথ

(৪০) পুলিন (৪০) বিজন

(৪১) অনুকূল (৪১) অজিত (৪১) আদিত্য (৪১) অর্দ্ধেন্দু

(৪০) ভোলানাথ (৪০) ভূতনাথ (৪০) অমর নাথ

(৪১) রবি

(১) (৩৭ পঃ) রুক্মিণীকান্তজ (৩৮) নদের চাঁদ জয়রামের গালার কাজের অংশীদার ছিলেন।

(২) (৩৭ পঃ) রুক্মিণীকান্তজ (৩৮) মহেশ ও তাঁর স্ত্রী হরনাথের ভিক্ষা বাপ ও মা ছিলেন।

(৩) (৩৮ পঃ) মহেশচন্দ্রজ (৩৯) রাধিকা ১২৮ নং বারাণসি ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ মেসে হরনাথের সহিত এক ঘরে থাকিতেন।

"ঙ" বোবা ঋষি গোপীনাথের বংশাবলী।

(৩৩) যজ্ঞেশ্বর (স্ত্রী লক্ষ্মী)

(৩৪) রামমুরলী (স্ত্রী সুধামুখী)

(৩৫) কুঞ্জবিহারী (স্ত্রী বরদাসুন্দরী) (৩৫) লালবিহারী, নরসিংহ, গোকুলচাঁদ

(৩৬) মদনগোপাল (৩৬) রামানন্দ (৩৬) গৌরীকান্ত (৩৬) রামকান্ত
স্ত্রী ভুবনেশ্বরী "খ" "গ"

(৩৭) উচ্ছবানন্দ (৩৭) পূর্ণানন্দ (৩৭) শঙ্কর (৩৮) গদাধর

(৩৮) ক্ষুদিরাম

(৩৮) দুর্ল্লভ (৩৮) ক্ষেত্র

(৩৯) রামজীবন

(৩৯) তারাচাঁদ (৩৯) ব্রজ

(৪০) কেদার

(৪০) শ্রীনাথ (৪০) দ্বারিক (৪০) রামনাথ

(৩৮) শ্রীদাম (৩৮) হারাধন (৩৮) রামকানাই (৩৮) রামচাঁদ (৩৮) দামোদর

(৩৯) বৈকুণ্ঠ (৩৯) হৃদয় (৩৯) বিশ্বম্ভর

(৪০) নবকৃষ্ণ

(৪০) বনবিহারী (৪০) অনঙ্গ (৪০) বঙ্কিম (৪১) দোলগোবিন্দ

(৩৭) গুরুচরণ (৩৭) ঠাকুরদাস
"চ" দ্রষ্টব্য

(৩৮) সীতানাথ (৩৮) রঘুনাথ

(৩৯) রামপ্রসাদ

(৩৯) কৃষ্ণ (৩৯) চন্দ্র (৩৯) রমণ

(৪০) শিবু

(৪০) রামগতি (৪০) ক্ষুদিরাম

(১) (৩৭) শঙ্করজ (৩৮) শ্রীদাম, হারাধন, রামকানাই, রামচাঁদ, দামোদর (৩৭) উচ্ছবানন্দজ (৩৮) দুর্ল্লভ ইহাঁরা ৺রাধাশ্যামসুন্দর লইয়া মামলার প্রতিবাদী ছিলেন।

"চ" বোবা ঋষি গোপীনাথের বংশাবলী।

(৩৩) যজ্ঞেশ্বর
স্ত্রী—লক্ষ্মী

(৩৪) রামমুরলী
স্ত্রী—সুধামুখী

(৩৫) কুঞ্জবিহারী (৩৫) লালবিহারী (৩৫) নরসিংহ (৩৫) গোকুলচাঁদ

(৩৬) মদনগোপাল (৩৬) রামানন্দ (৩৬) গৌরীকান্ত (৩৬) রামকান্ত
স্ত্রী—ভুবনেশ্বরী "খ" "গ" দ্রষ্টব্য "ঙ" দ্রষ্টব্য

(৩৭) গুরুচরণ "ঙ" (৩৭) ঠাকুরদাস

(৩৮) গঙ্গানারায়ণ (৩৮) লক্ষ্মীনারায়ণ
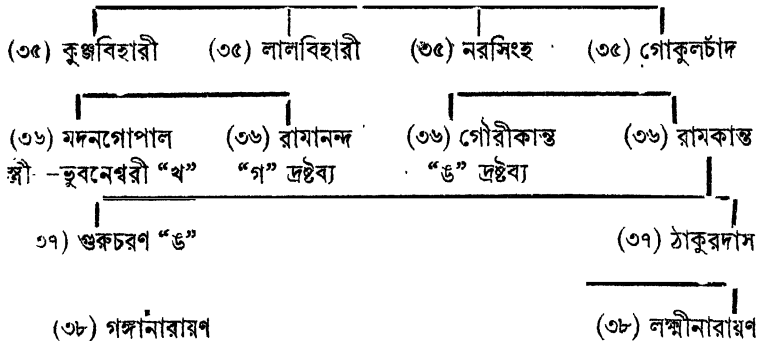
(৩৯) রামবিষ্ণু (৩৯) কেশব (৩৯) ক্ষুদিরাম (৩৯) তিনকড়ি (৩৯) রামচন্দ্র

(৪০) কন্যা রাণী

(৪০) কালীপদ, অজিত, গুহিরাম, বিজয়

(৪১) হাবলা

(৪০) নিরঞ্জন (৪০) কানাই (৪০) শ্রীরাম (৪০) শান্তিরাম

(৪১) সুধা

(৩৯) রামপদ (৩৯) রামনিধি (৩৯) রামময় (৩৯) রামকিশোর

(৪০) শম্ভুনাথ (৪০) কন্যা কালীমতি (৪০) বুদ্ধদেব

(৪১) জানকি (৪১) ব্যোমকেশ

(৪০) সত্য (৪০) গণেশ (৪০) শ্যাম

(১) (৩৭ পঃ) ঠাকুরদাসের নাম তাঁর বিনা অনুমতিতে ৺রাধাশ্যামসুন্দরের মামলার প্রতিবাদীরা শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের স্বর্ণপাদপদ্মের নিম্নে লেখাইয়াছিলেন।

(২) (৩৮ পঃ) গঙ্গানারায়ণের বাড়ীতে শিবনারায়ণ ও হরনাথ সন্ধ্যার সময় পড়িতে যাইতেন ও ইঁহার বাড়ীর উত্তর পশ্চিম কোণে মহাপুরুষের সহিত দেখা হয়।

পাগল হরনাথের মাতা ভগবতীদেবীর বংশাবলী

পাগল হরনাথের স্ত্রী কুসুমকুমারীর পিতামহ বংশ

বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য

যজ্ঞেশ্বর

কন্দর্পসুন্দর (১) স্ত্রী চন্দ্রাবলী (২) — রত্ন (নিঃসন্তান)
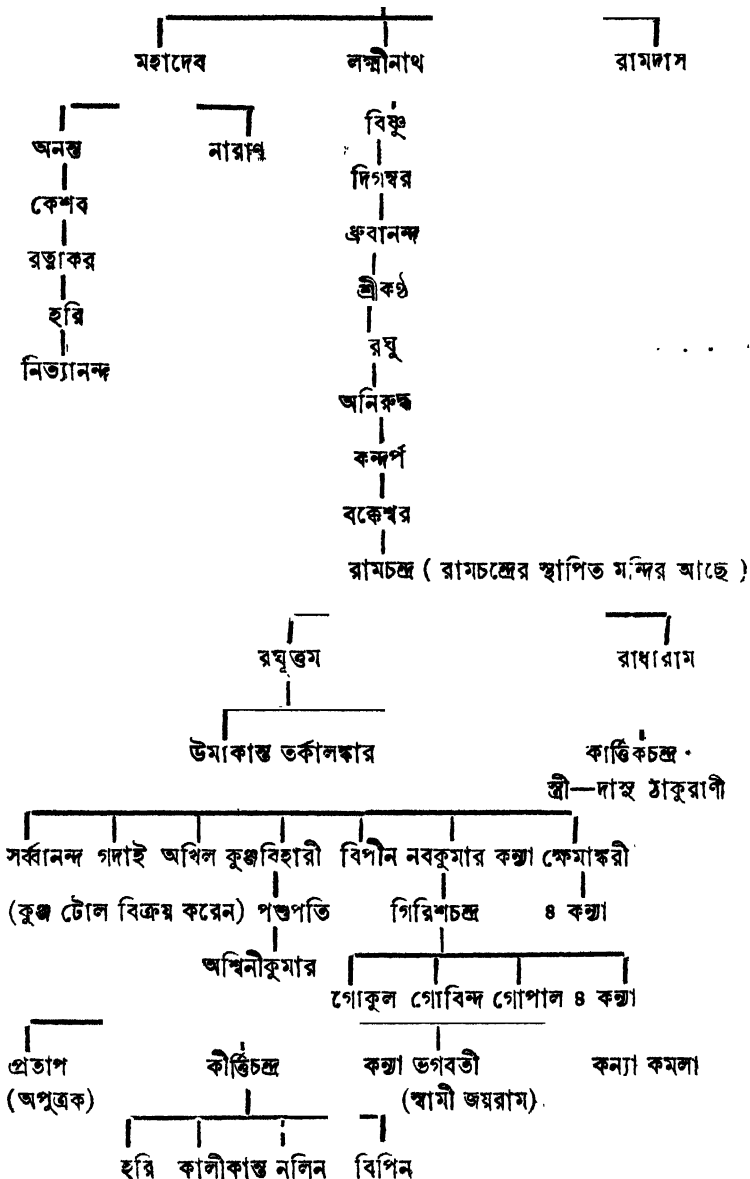
কুসুমকুমারী (৩), কন্যা দামিনী (৪), জ্যোতির্ম্ময় (৫), বিনোদ (৬), ননীবালা (৭), গোকুল (৮), কন্যামতি (৯), গোলক (১০)

(১) কন্দর্পের—জন্ম বঙ্গাব্দা ১২৩৮ ইং ১৮৩১, বিবাহ ১২৭২ সাল ইং ১৮৬৫, মৃত্যু ৯ মাঘ শুক্ল পঞ্চমী ১৩১০ (ইং ২৩ জানুয়ারী ১৯০৪) ৭২ বৎসরে মৃত্যু। ঘরা জমিদারের নায়েব ছিলেন।

(২) চন্দ্রাবলী—পিতার নাম গৌর চট্টোপাধ্যায়, কাঁটাবাঁধ। জন্ম ৪ মাঘ শুক্ল, নবমী বুধবার, ১২৬২ (ইং ১৬ জানুয়ারী ১৮৫৬) মৃত্যু ১ বৈশাখ ১৩২৭ কৃষ্ণ দশমী বুধবার (ইং ১৪ এপ্রেল ১৯২০) ১০ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। ১৫ বৎসর বয়সে প্রথম কন্যা কুসুম কুমারীর জন্ম হয়।

(৩) কুসুম কুমারী—৩০ অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণ ষষ্ঠী, বুধবার ১২৭৭ (ইং ১৪ ডিসেম্বর ১৮৭০) অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার পর জন্ম।

(৪) দামিনী—স্বামী ফেলারাম চক্রবর্ত্তী। জন্ম ১২৭৮। একমাত্র কন্যা অমূল্যরাণী—ঠাকুর হরনাথের কন্যা সুবাসিনীর সহিত একত্রে জলে ডুবিয়া মৃত। ৭ পৌষ শুক্ল প্রতিপদ শনিবার ১৩০৭ (ইং ২২ ডিসেম্বর ১৯০১ সাল) ঠাকুর সে সময় কাশ্মীরে ছিলেন।

(৫) জ্যোতির্ম্ময়—জন্ম ১২৮০ সাল, মৃত্যু ২ বৈশাখ, শুক্ল পূর্ণিমা মঙ্গলবার ১৩২৬ (ইং ১৫ এপ্রেল ১৯১৯) তৎকন্যা রাধারাণী তৎপুত্র নারান দাস ও কন্যা সত্যরাণী।

(৬) বিনোদ—জন্ম ১২৮৫ (ইং ১৮৮০) তৎপুত্র বংশীধারি, মুরলীধারি, অজিত কুমার (মৃত), নন্দলাল, কন্যা বিমলা, কন্যা দুর্গাবালা, পুত্র অমলকুমার ইত্যাদি

(৭) ননীবালা—স্বামী কালীপদ চক্রবর্ত্তী, জন্ম ১২৮৭ (১৮৮২) তৎকন্যা উষা. পুত্র মৃত্যুঞ্জয় (মৃত), মনোরঞ্জন ও কন্যা নির্ম্মলা। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র চণ্ডীচরণ। নির্ম্মলার দুই কন্যা অন্নপূর্ণা ইত্যাদি।

(৮) গোকুল—জন্ম ১২৯০ (ইং ১৮৮৫) বিবাহ করে নাই।

(৯) মতি—জন্ম ১২৯৫ (ইং ১৮৮৯) স্বামী কালীপদ অধিকারী। বিধবা হইয়া অপুত্রক।

(১০) গোলক—জন্ম ১৩০২ (ইং ১৮৯৬) তৎপুত্র নেপাল, কন্যা আরতি, শচিনন্দন (মৃত) কন্যা ভুবনেশ্বরী ও কন্যা পূর্ণিমা ইত্যাদি

পাগল হরনাথের পিতা জয়রামের মাতামহ বংশ
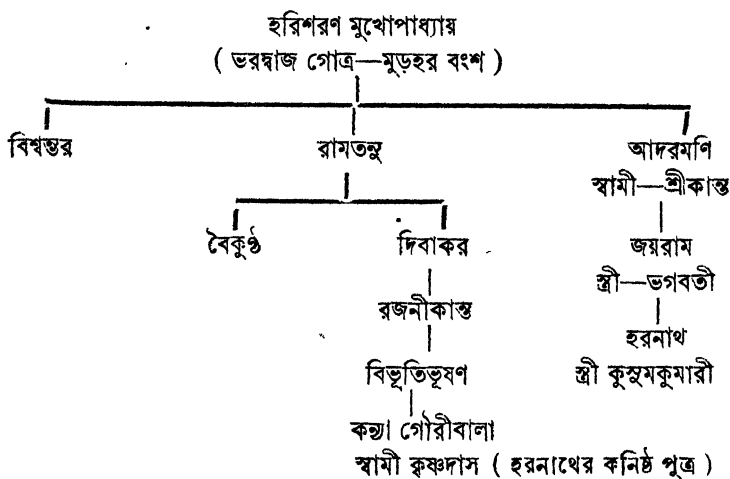
পাগল হরনাথের কুলগুরু গোস্বামীগণের বংশাবলী

বিষ্ণুপুরের রাজারা গোস্বামীগণের পূর্ব্বপুরুষগণকে বলাগড় হইতে আনিয়া নিত্যানন্দপুরে বাস করান। গোস্বামীগণের বাস অবধি এই গ্রামটী নিত্যানন্দপুর নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই গোস্বামীগণ অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সন্তান ও বসুধা জাহ্নবীর পরিবার। নিত্যানন্দপুর সোণামুখী হইতে ৯ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। পরে কেহ কেহ বাঁকুড়ার পুরলিয়া ও জামবুনীতে গিয়া বাস করেন ও এই বংশের বৈষ্ণবচরণ সিদ্ধান্তরত্ন গোস্বামী গোপীনাথপুরে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। গোপীনাথপুর সোণামুখী হইতে ১৮ মাইল উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। জামবুনী গ্রাম বি, এন, রেলের ওন্দাগ্রাম

ষ্টেসন হইতে ৬ মাইল উত্তরে ও গোপীনাথপুরের ১॥০ দেড় মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত।
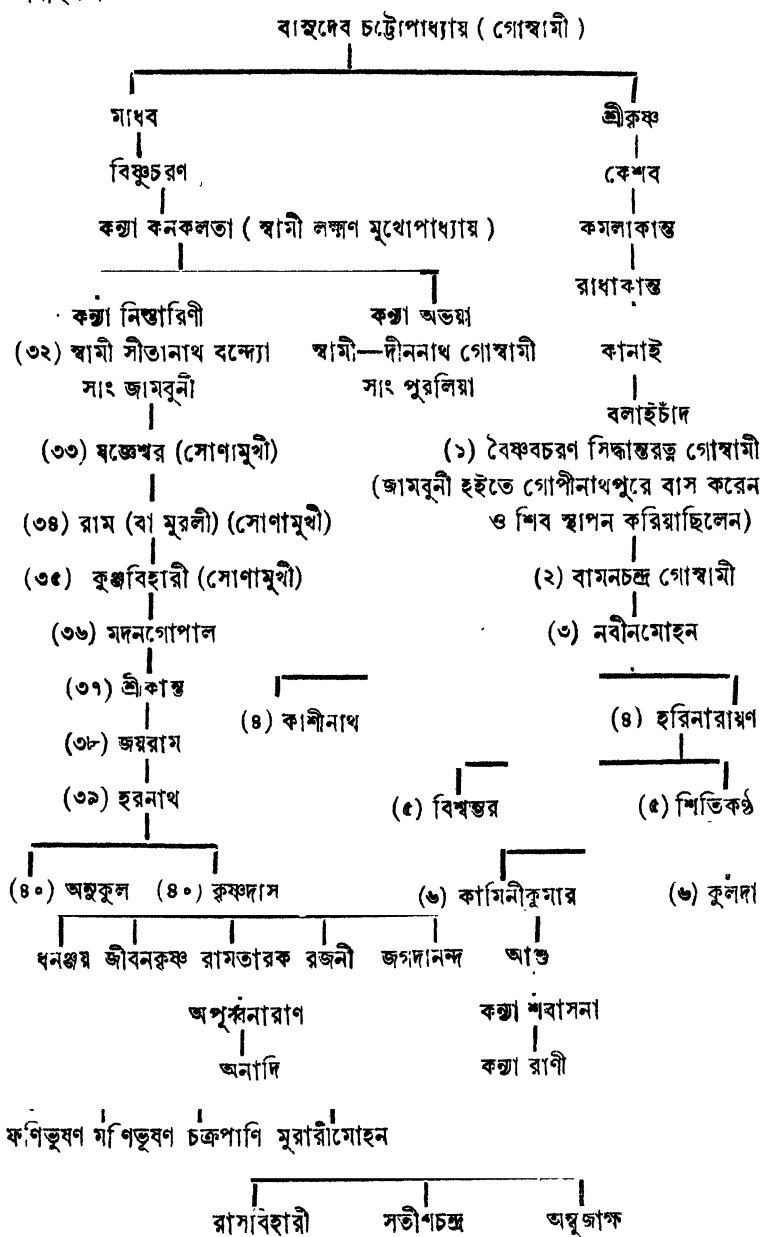
কুলগুরুর ইতিহাস।

৩৩নং পর্য্যায় যজ্ঞেশ্বরের		দীক্ষাগুরু গোপীনাথপুরের গোস্বামী বংশের কেহ ছিলেন না।
৩৪নং পর্য্যায় রামচন্দ্র বন্দ্যার	ঐ	একজন সন্ন্যাসী ছিলেন।
৩৫নং পর্য্যায় কুঞ্জবিহারী বন্দ্যার	ঐ	গোপীনাথপুরের ১নং বৈকুণ্ঠচরণ গোস্বামী।
৩৬নং পর্য্যায় মদনগোপালের	ঐ	২নং বামন গোস্বামী ছিলেন।
৩৭নং পর্য্যায় শ্রীকান্তের	ঐ	৩নং নবীনমোহন
৩৮নং পর্য্যায় জয়রামের	ঐ	৪নং হরিনারায়ণ
৩৯নং পর্যায় শিবনাথের	ঐ	৫নং বিশ্বম্ভর
৩৯নং পর্য্যায় হরনাথের	ঐ	৫নং শিতিকণ্ঠ গোস্বামী
৪০নং ঐ অনুকূলের	ঐ	৬নং কুলদা।
৪০নং ঐ কৃষ্ণদাসের	ঐ	৬নং কুলদা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আদি পুরুষের পরিচয়

ঠাকুর হরনাথ পাঞ্জাব প্রদেশের পঞ্চনদ তীরবাসী ব্রাহ্মণ আর্য্যদিগের বংশধর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঠাকুর হরনাথ আর্য্য সন্তান ও শাণ্ডিল্য মণির বংশধর এই বলিয়া গৌরব বোধ করিতেন—এই সকল কথা পত্রেও লিখিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর জীবনীতে পৃথকভাবে উল্লেখিত হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের আর্য্য ব্রাহ্মণ সন্তানগণের সহিত বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণের এত বিভিন্নতা দেখা যায় কেন? এই বিভিন্নতা এক হাজার বৎসর মধ্যে ঘটিয়াছে। বাঙ্গলার ব্রাহ্মণগণ মধ্যে গোত্র, প্রবর, বিভাগ, শ্রেণী, গাঞি, মেল, ভাগ, ভাব, যুত, সমাজ, কাহার সন্তান, কুলীন, কুল-ভঙ্গ ইত্যাদি লইয়া যত গোলযোগ ঘটিয়াছে। নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল। কেবল শাণ্ডিল্য গোত্রীয়গণের বিষয় আলোচনা করিলাম। কারণ ঠাকুর হরনাথ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বংশধর।

ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বাপর হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। এই

শীর্ষস্থান অধিকার করিবার প্রধান কারণ ব্রাহ্মণদিগের সত্যনিষ্ঠা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সদাচার, উত্তম ও সচ্চরিত্রতা। কোন ব্রাহ্মণের পরিচয় দিতে হইলে অগ্রে তাঁহার বেদ, গোত্র ও প্রবর জানা চাই। মন্ত্রকৃৎ ঋষিগণের নামেই ব্রাহ্মণগণের গোত্র প্রচলিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণীভুক্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৯২ জন মন্ত্রকৃৎ ঋষির উল্লেখ আছে।

যে ব্রাহ্মণ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশে বিবাহ করিতে পারিবেন না, ইহাই গোত্র প্রচলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই সময় হইতেই ব্রাহ্মণের সর্ব্বকার্য্যেই গোত্র নাম উচ্চারণ একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। শেষে যখন সমাজ-রক্ষক মুণিগণ দেখিলেন যে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হইল বটে কিন্তু তাহাতেও এমন অনেক বিবাহ হইতে লাগিল যাহা সভ্য সমাজের চক্ষে ভাল বলিয়া বিবেচিত নহে। তখন শাস্ত্রকারগণ সগোত্রের ন্যায় সপ্রবরে বিবাহ নিষেধ করিলেন। যে গোত্র যজ্ঞকালে যে ঋষিকে বরণ করিতেন, সেই গোত্রের সেই ঋষি প্রবর। যখন একনামে অনেক গোত্র চলিল, তখন প্রত্যেক গোত্রের বিশেষ করিয়া পরিচয় দিবার জন্য সেই সেই গোত্রের ব্যাবর্ত্তক প্রধান প্রধান ঋষিকে লইয়া প্রবর স্থির হইল। সেই জন্য এক এক গোত্রে অনেকগুলি করিয়া প্রবর দৃষ্ট হয়।

এককালে প্রায় দুই শত গোত্র প্রচলিত ছিল, প্রাচীনতম অনেক গোত্র এখন বিলুপ্ত হইয়াছে।

গোত্র—যে ঋষির বংশে যাঁহার জন্ম, গোত্র বলিবার সময় সেই ঋষির পরিচয় দিয়া থাকেন। কোন ব্রাহ্মণের পরিচয় দিতে হইলে অগ্রে তাঁহার বেদ, গোত্র ও প্রবর জানা চাই। ব্রাহ্মণের গোত্রই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের পরিচায়ক। বৌধায়ন সূত্রে—বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গোতম অত্রি, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ এই সাতজন ঋষিই আদি গোত্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই সাতজনের অপত্যগণের মধ্যে যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামেও গোত্র প্রবর্ত্তিত হয়। আর্য্য সমাজে প্রথমে বিবাহের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। প্রথমে এক বংশ বা এক পরিবার মধ্যেই বিবাহ সংঘটিত হইত, পুরাণে তাহার প্রমাণ আছে। পরে সগোত্রে বিবাহ নিষেধ হয় কিন্তু তাহাতেও সমাজের ক্ষতি হইতে থাকে। তখন শাস্ত্রকারগণ সগোত্রের মত সপ্রবরে বিবাহ নিষেধ করিলেন।

প্রবর—যে গোত্র যজ্ঞকালে যে ঋষিকে বরণ করিতেন, সেই গোত্রের সেই ঋষি—প্রবর। প্রত্যেক গোত্রে যতগুলি প্রবর নির্দ্দিষ্ট আছে, ভিন্ন গোত্রের মধ্যে তাহার একটী প্রবর উক্ত থাকিলেও পরস্পরের বিবাহ হইবে না, ইহাই নিয়ম। তদবধি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ নিয়ম করিলেন, সগোত্রে ও সমান প্রবরে বিবাহ হইলে ব্রাহ্মণ সমাজচ্যুত হইবেন। নিম্নে শাণ্ডিল্য ইত্যাদি গোত্রজ মূল ঋষি ও প্রবরের নাম প্রদত্ত হইল।

গোত্র	প্রবর
শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
বাৎস্য	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ।
ভরদ্বাজ	আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
সাবর্ণ	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।

এখনকার কালে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সর্ব্বত্র পূর্ব্বোক্ত গোত্র প্রবরের ব্যবস্থা রক্ষিত হয় না। বেদের শাখান্তর-আশ্রয়ই তাহার অন্যতম কারণ বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে এখন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নিম্নলিখিত গোত্র প্রচলিত আছে যথা :—(১) অগস্ত (২) অগ্নিবৈশ্য (৩) অত্রি (৪) অনাবৃকাক্ষ (৫) অব্য (৬) আঙ্গিরস (৭) আত্রেয় (৮) আলম্যান (৯) উদ্দালক (১০) উপমন্যু (১১) ঋষভ (১২) ঔতথ্য (১৩) কণ্ব (১৪) কপিঞ্জল (১৫) কম্বিশ (১৬) কাঞ্চন (১৭) কাণ্যায়ণ (১৮) কাত্যায়ন (১৯) কামকায়ন (২০) কাশ্যপ (২১) কুশল (২২) কৃষ্ণাত্রেয় (২৩) কৌণ্ডিন্য (২৪) কৌণ্ডিল্য (২৫) কৌশিক (২৬) কৌৎস্য (২৭) কৌস্তভ (২৮) গর্গ (২৯) গোতম (৩০) গৌতম (৩১) ঘৃতকৌশিক (৩২) তৈত্তিরীয় (৩৩) জাবালি (৩৪) জাতুকর্ণ (৩৫) জামদগ্ন্য (৩৬) জৈমিনি (৩৭) পূতিমাষ (৩৮) পরাশর (৩৯) পৈঠিনসি (৪০) পৌলস্ত্য (৪১) বৃদ্ধ (৪২) বৃহস্পতি (৪৩) ভরদ্বাজ (৪৪) ভার্গব (৪৫) মৌদ্গল্য (৪৬) মৌনস (৪৭) যাজ্ঞবল্ক্য (৪৮) রথীতর (৪৯) রোহিত (৫০) রজত (৫১) বশিষ্ঠ (৫২) বাৎস্য (৫৩) বাসুকী (৫৪) বিশ্বামিত্র (৫৫) বিষ্ণু (৫৬) শক্তি (৫৭) শাণ্ডিল্য (৫৮) শৌনক (৫৯) শুনক (৬০) সাংকৃতি (৬১) সাবর্ণ (৬২) সৌকালিন (৬৩) সৌপায়ন (৬৪) স্বর্ণকৌশিক (৬৫) সংকর্ষণ (৬৬) হারীত। যতগুলি গোত্র স্বীকার করিতে হইবে, এই বাঙ্গালা প্রদেশে তত প্রকার ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন।

পূর্ব্বে বিপ্রগণ গোত্রিয় নামে খ্যাত ছিলেন। রাজা ধরাশূর ব্রাহ্মণগণকে

"কুলাচল" ও সচ্ছোত্রিয় এই দুই অংশে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে বন্দ্য, মুখৈটী, চট্ট, কাঞ্জি, গাঙ্গুলী, হড়, গড়গড়ী, পুতিতুণ্ড, ঘোষাল, কুন্দলাল, চতুর্খী, রায়ী, কেশরকোনী, দীর্ঘাঙ্গী, পারিহাল, কুলভী, মহিন্তা, গুড়, পিপ্পলী, ঘণ্টা, ডিণ্ডী ও পীতমুণ্ডী এই ২২ গাঞি ব্রাহ্মণ কুলাচল।

পালধী, সিদ্ধল, কুশাড়ী, কাঞ্জ্যাড়ী, বাপুলি, মাস বা মাসচটক, সাহুড়িয়াল, ভুরিষ্ঠান, কুসুম, বা কুসুমকুল, বটব্যাল, অম্বুলী, বোকট্টালক বা বোকড়া, শিরাড়ী, পোড়াড়ী, তিলাড়ী, পোষলা, নন্দী, পলসাঞি, শিমুলী, শিমলাঞি, সেউ, কড়ী বা কড়াল, নাঞাড়ী, ঘোষলী, বালী, বস্বাড়ী, বড়া, পালি, ঝিক্‌রাড়ী, হিজ্জল, সাণ্ডে, মুলী ও দায়ী এই ৩৪ গাঞি সচ্ছোত্রিয় আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে সকল উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, পাণ্ডে, মিশ্র অথবা মহরট্টা দেশীয়, দক্ষিণী ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন এখন তাঁহাদের বংশধর-গণের কাহাকেও আর দশজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ হইতে বাছিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। ইহা ছাড়া সারস্ব ব্রাহ্মণগণ গৌড় মণ্ডলে অতি প্রাচীনকালে আগমন করিয়া এই দেশে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করেন। রাঢ় দেশেই তাঁহাদিগের প্রথম ও প্রধান উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থে এই রাঢ় দেশের বহুল উল্লেখ আছে। বাংলা জেলার মানচিত্রে দেখা যায় যে মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাংশে ভাগীরথী নদী যে স্থান হইতে দক্ষিণমুখী হইয়াছে সেই স্থান হইতে হাওড়া জেলা পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পশ্চিমাংশ রাঢ় দেশ নামে খ্যাত ছিল। প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ, লক্ষ্মণাবতী নগরের পরিচয় দান কালে ১২শ শতাব্দিতে এই রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমির একটী সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "গঙ্গার দুই ধারে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের দুই পক্ষ। পশ্চিমদিকে রাল (রাঢ়)। এই ধারেই লখ্‌নোর (লক্ষ্মণের) নগরী এবং পশ্চিম (উত্তর ধার লিখিতে ভুলক্রমে পুনরায় পশ্চিম লিখিয়াছেন) বরিন্দ (বরেন্দ্র) নামে খ্যাত। এই ধারেই দেওকোট নগর অবস্থিত।" এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, রাজা লক্ষ্মণসেনের সময়ে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলা রাঢ়নামে প্রসিদ্ধ এবং লক্ষ্মণপুর রাঢ়দেশের রাজধানী ছিল। সিংহলের মহাবংশে লিখিত আছে, বুদ্ধদেবের জন্মের বহু পূর্ব্বে রাঢ়দেশে সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন, সিংহপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তৎপুত্র বিজয়সিংহ হইতে সিংহল দ্বীপের (Ceylon) নামকরণ ও সিংহলে রাঢ়ীয় সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল ও

অদ্যাপি ঐ সভ্যতা বর্ত্তমান আছে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, রাঢ়দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে অর্থাৎ অন্যূন ৩০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে সুসভ্য জাতির বাস ও সুসভ্যতার বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু রাঢ়দেশে যে বেদ-বিরুদ্ধ মত প্রচলিত ছিল না, একথা বলা চলে না, কারণ প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের নিকট এই স্থান অবৈদিক ও অযজ্ঞীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। বাঁকুড়া জেলা এই রাঢ়দেশের অন্তঃর্গত। অতএব ২।৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঁকুড়ায় (সোণামুখী) যে সুসভ্য জাতির বাস ও সুসভ্যতা যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

গৌড়াধিপের আহ্বানে পঞ্চ ব্রাহ্মণের স্ত্রী পুত্র ও অপরাপর সাগ্নিক ব্রাহ্মণও আসিয়াছিলেন। রাঢ়ীর ও বারেন্দ্রগণ এক পিতারই সন্তান, এ সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন প্রমাণ আছে। একই বংশের বংশধরগণ তৎকালে বরেন্দ্র ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া বারেন্দ্র নামে অভিহিত হইলেন। ইহাদিগের নাম (১) শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দামোদর, (২) কাশ্যপ গোত্রীয় কৃপানিধি, (৩) বাৎস গোত্রীয় ধরাধর, (৪) ভরদ্বাজ গোত্রীয় গৌতম ও (৫) সাবর্ণ গোত্রীয় রত্নগর্ভ। সাড়ে তিনশত বর্ষ অতীত হইল, বৈষ্ণব কবি নিত্যানন্দদাস প্রেম-বিলাসে লিখিয়াছেন

"নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গা নাম।
মাধব আচার্য্যে প্রভু কৈলা কন্যাদান॥
রাঢ়ীতে বারেন্দ্র বিয়ে না ভাবিও আন।
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান॥
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বিয়ে হয়েছে অনেক।
দেশভেদে নামভেদ এই পরতেক॥

ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভ, এই পঞ্চ ব্রাহ্মণই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-গণের প্রথম বা আদিপুরুষ। রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ সকলেই উক্ত পঞ্চ মহাত্মার মধ্যে কাহারও না কাহার সন্তান।

রাঢ়ীয়গণ প্রথমে গোত্র ও পরে স্ব স্ব গাঞির পরিচয় দিয়া থাকেন। কিরূপে ও কোন সময়ে গাঞির উৎপত্তি হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইতেছে।

শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ এই পঞ্চগোত্র। ইহাদের মধ্যে মুনিবর শাণ্ডিল্যই সর্ব্বপ্রকারে মাননীয়। শাণ্ডিল্য গোত্রে বেদব্যাস-সদৃশ

কলিব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। কলিব্যাসের পুত্র বামদেব, তৎপুত্র রামদেব, তৎপুত্র ক্ষিতীশ, ইনিই গৌড়রাজ্যে আগমন করেন। ক্ষিতীশের সর্ব্বগুণান্বিত অনেকগুলি পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম দামোদর, শৌরি, মহামতি বিশ্বেশ্বর, লোকপ্রসিদ্ধ শঙ্কর এবং ভট্টনারায়ণ। অপরাপর কথা ছাড়িয়া বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা রাঢ়ীয় শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেই এখন আলোচনা করিব।

রাঢ়দেশে শূররাজ্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে ভূশূর-তনয় মহারাজ ক্ষিতিশূর রাঢ়দেশবাসী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণাদির সন্তানদিগের ভরণপোষণ ও বাসস্থানের জন্য ৫৬ খানি গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সেই গ্রামের নামানুসারে গ্রামী বা "গাঞি"র উৎপত্তি হইয়াছে। নিম্নে ৫৬ খানি গ্রামের নাম লিখিত হইল।

(১) বন্দ্য বা বাঁড়র (২) কুসুমকুল (৩) কুলভ (৪) গড়গড় (৫) ঘোষাল (৬) সেউ (৭) দীর্ঘ (৮) কড়ী (৯) মাস (১০) বড়া (১১) কেশরকোণা (১২) পারি (১৩) বসু বা বসুয়া (১৪) কুশ (১৫) ঝিকরা (১৬) বোকট্ট বা বোকড়া (১৭) ডিণ্ডী বা ডিংসা (১৮) রায় (১৯) মুখটী (২০) সাহুড়া (২১). চট্ট বা চাটুতি (২২) গুড় (২৩) শিমলা (২৪) পালধী (২৫) হড় (২৬) দগ্ধবাটী বা পোড়াবাড়ী (২৭) পোষ (২৮) তৈলবাট বা তিলাড়া (২৯) অম্বুল বা আমুল (৩০) ভূরি বা ভূরিশ্রেষ্ঠ (৩১) পলসা (৩২) পর্ক্কট বা পাকুড় (৩৩) মূল (৩৪) পীতমুণ্ড (৩৫) পিপুল (৩৬) ঘোষ (৩৭) পূর্ব্ব (৩৮) পূতিতুণ্ড (৩৯) বাপুল (৪০) হিজ্জল (৪১) কাঞ্জি (৪২) কাঞ্জা (৪৩) চতুর্থ (৪৪) মহন্ত (৪৫) শিমূল (৪৬) গাঙ্গে বা গাঙ্গুড় (৪৭) ঘণ্টা (৪৮) পালি (৪৯) বালি (৫০) কুন্দ (৫১) নন্দি (৫২) সিদ্ধ (৫৩) সাগুা (৫৪) দায়া (৫৫) শির বা শিহর ও (৫৬) নাঞি।

উপরোক্ত ৫৬ খানি গ্রামের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রের ভট্টনারায়ণের ১৬টী পুত্রের জন্য (১ হইতে ১৬ নম্বর পর্য্যন্ত) ১৬ খানি গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছিল।

(১ম পুত্র) বরাহ বন্দ বা বন্দিঘাট গ্রাম পাইয়াছিলেন। এই গ্রাম বর্ত্তমানে বন্দিঘাট নামেই প্রচলিত। বীরভূম জেলার অন্তর্গত কাণানদীর নিকট (অক্ষা° ২৪° ৫৫′ ৫১″ উঃ দ্রাঘি° ৮৭° ৫২′ ২৫″ পূঃ) ইহার নামানুসারে বন্দ্যগ্রামিগণ "বন্দিঘাটী" নামে পরিচিত।

(২য় পুত্র) রাম গ্রামের নাম গড়গড়। এখন গড়গড়ে নামে খ্যাত, বীরভূম জেলার সিউড়ী হইতে ৬৷৹ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত এই গ্রামের নাম হইতে গড়গড়ী গাঞি হইয়াছে।

(৩য় পুত্র) নৃপ বা নিপো গ্রামের নাম কেশর কোণা। এখনও এই নামে খ্যাত। বাঁকুড়া জেলার বড়া গ্রামের ১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের নাম হইতে "কেশর কোণী" গাঞি হইয়াছে।

(৪র্থ পুত্র) নান গ্রামের নাম কুসুম বা কুসুমকুল বর্দ্ধমান জেলার মন্তেশ্বর গ্রামের দেড় ক্রোশ দক্ষিণে দেড় ক্রোশ ব্যবধান মধ্যে "কুসুম" "কুলী" নামে দুইটী গ্রাম আছে, তাহা হইতেই "কুসুমকুলী" গাঞি হইয়াছে।

(৫ম পুত্র) বাটু গ্রামের নাম পারিহা। এখন "পারিহারপুর" নামে অভিহিত। বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া ষ্টেসনের দেড় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রাম হইতে "পারি" বা "পারিহাল" গাঞি হইয়াছে।

(৬ষ্ট পুত্র) গুয়ি বা গুঞি গ্রাম কুলভ এখন "কুলহা" নামে আখ্যাত। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ডাকঘর হইতে ৩৷৷০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রামের নাম হইতে "কুলভী" গাঞি হইয়াছে।

(৭ম পুত্র) গুণ বা গণ গ্রাম ঘোষল এখন "ঘোষলাদি" নামে অভিহিত। মানভূম জেলার বরাকর নদী হইতে অৰ্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে এবং পাণ্ডুয়া হইতে দেড় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের নামে "ঘোষলী" গাঞি হইয়াছে।

(৮ম পুত্র) দেব গ্রাম সেউ এখন "সেউর" গ্রাম নামে খ্যাত। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর হইতে ৪৷৷০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রাম হইতে "সেউ" গাঞি হইয়াছে।

(৯ম পুত্র) বুঢ় বা গুঢ় গ্রাম মাস এখন "মাসদহা" নামে আখ্যাত। বীরভূম জেলার সিউড়ী হইতে ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে এবং সাঁইথিয়া ষ্টেসন হইতে ১৷৷০ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রাম হইতে "মাস" বা "মাসচটক" গাঞির নাম হইয়াছে।

(১০ পুত্র) বিকৰ্ত্তন গ্রাম বড়া এখন বোড়া বা বৈকুণ্ঠপুর নামে খ্যাত। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর হইতে ১১ ক্রোশ পূর্ব্বে ও দারুকেশ্বর নদী হইতে ২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই বড়া হইতে "বড়াল" বা "বটব্যাল" গাঞি হইয়াছে।

(১১শ পুত্র) নীল বা নিনো গ্রাম বসু এখন বসুয়া নামে খ্যাত। মুর্শিদাবাদ জেলার দ্বারিকা নদীতীরে রামপুর হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রাম হইতে "বসুয়াড়ী" গাঞি হইয়াছে।

(১২ শ পুত্র) মধুসূদন—গ্রাম কড়ী—বর্ত্তমান নাম কড়ি বা কৌড়ি। বীরভূম জেলায় অজয় নদের দক্ষিণ কুলে অবস্থিত। এই গ্রাম হইতে "কড্যাল" বা "কড়িয়াল" গাঞি হইয়াছে।

(১৩শ পুত্র) দীন—গ্রাম—কুশ এখন "কশো" নামে খ্যাত। বর্দ্ধমান জেলার বর্দ্ধমান সহর হইতে ৩ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রাম হইতে "কুশাড়ী" বা "কুশারী" গাঞি হইয়াছে।

(১৪শ পুত্র) কাম গ্রাম ঝিক বা ঝিকৃরা মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর হইতে ৮ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রাম হইতে "ঝিকরাল" বা "ঝিকবাড়ী" গাঞি হইয়াছে।

(১৫শ পুত্র) সোম গ্রাম বোকউ বা বোকড়া এখন বোকডা নামে খ্যাত। বর্দ্ধমান জেলার হাবেলী পরগণায় রায়না হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রাম হইতে "বোকটাল" গাঞি হইয়াছে।

(১৬শ পুত্র) মহামতি গুণ্ঠ গ্রাম দীর্ঘ বা দীঘড়া এই গ্রাম হুগলী জেলায় জাহানাবাদ হইতে ২॥০ ক্রোশ দক্ষিণে দারুকেশ্বর নদীর তীরে অবস্থিত। এই গ্রাম হইতে "দীর্ঘাঙ্গী" বা "দীঘড়ী" গাঞি হইয়াছে।

বাকি ৪০ খানি গ্রামের মধ্যে ১৭ নম্বর হইতে ২০ নম্বর পর্য্যন্ত ৪ খানি গ্রাম ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষের চারি পুত্রগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল। ২১শ হইতে ৩৪ পর্য্যন্ত গ্রামগুলি কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষের ১৪ পুত্রগণকে, ৩৫ হইতে ৪৫ পর্য্যন্ত গ্রামগুলি কাশ্যপ গোত্রীয় ছান্দড়ের ১১টী পুত্রগণকে এবং তৎপরবর্ত্তী (৪৬ হইতে ৫৬) ১১ খানি গ্রাম সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভের ১১ পুত্রগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

"ভট্টনারায়ণস্তস্মাৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
তৎপুত্রা ভুবি বিখ্যাতাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পণ্ডিতাঃ॥
আদ্যো বরাহো বাটুশ্চ রামো নানো নিপস্তথা।
গুঞিগুণো গূঢ়শ্চৈব বিকো গুষ্ঠো নিনোমধুঃ॥

দেবসোমৌ তথা কামো দীনো চ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
আদ্যো বন্দ্যঘটী খ্যাতো রামো গড়গড়ী স্মৃতঃ।
কেশরকোনী নিপোকশ্চ নানঃ কুসুমকোঽভবেৎ॥
পারিহালো বাটুকোঽপি গুঞ্জিশ্চ কুলভী মতঃ।
দীর্ঘবাটী ততো গুণ্ঠো গুণো ঘোষলিরেব চ॥
বটব্যালো বিকর্ত্তনো গূঢ়ো মাসচটকশ্চ সঃ।
বসুয়াড়ী নিনোকশ্চ মধুকঃ কড়িয়ালকঃ॥
দেব সেউ স্তথা সোমো বোকট্টালঃ কুশিদীনঃ।
ঝিকরাড়ী তথা কামঃ শাণ্ডিল্যানাং কুলক্রমঃ॥
(হরিমিশ্রকৃত কুলপঞ্জিকা।)

৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ জয়ন্ত আদিশূরের সময় রাঢ়ী, বারেন্দ্র ইত্যাদি কোন শ্রেণী বিভাগ হয় নাই। পঞ্চগৌড়াধিপ জয়ন্ত (আদিশূর) যথা কালে কালের আতিথ্য স্বীকার করিলে পর তৎপুত্র ভূশূর গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। মগধাধিপ ধর্ম্মপাল গৌড় সিংহাসন জয় করিয়া বরেন্দ্রভূমে পালরাজ্যের আধিপত্য বিস্তৃত করিলেন। তখন ভূশূর রাঢ় দেশে আসিয়া পুণ্ড্রনামে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে গৌড়াগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের যে যে পুত্র সস্ত্রীক আসিয়া রাঢ়দেশে বাস করিলেন, তাঁহারা সকলেই পরে রাঢ়ী নামে পরিচিত হইলেন। আর যাঁহারা পূর্ব্বনিবাস বরেন্দ্রভূমে রহিলেন তাঁহারা পরে বারেন্দ্র নামেই অভিহিত হইয়াছিলেন। জয়ন্তপুত্র ভূশূরের সময় পঞ্চগোত্রজ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে "রাঢ়ীয়" ও "বারেন্দ্র" ও সাতশতী এই তিনটী শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেন। ব্রাহ্মণগণ মধ্যে সে সময় কোন প্রকার নিয়মাদি বিধিবদ্ধ হয় নাই।

খ্রীষ্টিয় নবম শতাব্দির প্রথমে ভূশূরতনয় মহারাজ ক্ষিতিশূর রাঢ়দেশবাসী ভট্টনারায়ণাদির সন্তানদিগের ভরণপোষণ ও বাসস্থানের জন্য ৫৬ খানি গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সকল গ্রামের নামানুসারে গ্রামী বা "গাঞির" উৎপত্তি হইয়াছে মাত্র। এই সময়েও আর কোন নিয়মাদি বিধিবদ্ধ হয় নাই।

মহারাজ ক্ষিতিশূরের বহু পরে তাঁহার প্রপৌত্র ধরাশূরের সময় অর্থাৎ "গাঞি" উৎপত্তির এক শত বৎসর পরে খ্রীঃ দশম শতাব্দিতে রাঢ়ীশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথম কুলবিধি প্রবর্ত্তিত হয়। তৎকালে বরাহ প্রভৃতি উপরোক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই কালকবলিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ

উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বে সকল ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় নামে খ্যাত হইতেন। মহারাজ ধরাশূর রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণকে "কুলাচল" ও "সচ্ছোত্রিয়" এই দুইটী ভাগে বিভক্ত করিলেন। এই বিধি অনুসারে কুলাচলেরা রাঢ়ীয় হিন্দু সমাজে সচ্ছোত্রিয় অপেক্ষা বেশী সম্মান পাইতেন। রাজ দরবারে বা ক্রিয়া কলাপে কুলাচলদিগকে অগ্রে বরণ করা হইত। রাঢ়ীশ্রেণীর কুলাচল ও সচ্ছ্রোত্রিয় মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান চলিত। সচ্ছ্রোত্রিয়ের ঘরে কন্যা দান করিলেও কুলাচলের কুলক্ষয় হইত না। কিন্তু সে সময়ে সাতশতীর ও রাঢ়ীর মধ্যে আদান প্রদান প্রচলিত ছিল না।

রাজা ধরাশূরের দুই পুরুষ পরে দাক্ষিণাত্য নরেন্দ্র বংশের মহারাজ বল্লাল সেন খ্রীষ্টিয় ১১শ শতাব্দিতে রাজা হন। তিনি যখন দেখিলেন, সম্মানিত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে অনাচার প্রবেশ করিয়াছে ও উচ্চনীচ ভেদ উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে, সেই উপযুক্ত সময়ে সনাতন ধর্ম্মরক্ষা, সমাজরক্ষা ও ব্রাহ্মণ সমাজের সম্ভ্রমরক্ষা করিবার জন্য কুলমর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি মোট ১৯ জন কুলাচলকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন হওয়ায় মুখ্য কুলীন এবং ১৪ জন গুণে একটু হীন হওয়ায় গৌণ কুলীন বলিয়া গণ্য হইলেন। বল্লালসেনের সময়ে ও তাঁহার পরবর্ত্তিকালেও গৌণ কুলীনগণ বিশেষ সম্মানিত ছিলেন এবং মুখ্যকুলীনের সহিতই তাঁহাদের আদান প্রদান এমন কি পরিবর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। গৌড়াধিপ কুলীনদিগের আচার ব্যবহারের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য কুলাচার্য্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কুলীন ভিন্নগোত্রীয় কুলীনে কন্যার আদান প্রদান করিবেন, ইহাই তাঁহাদের সনাতন ধর্ম্ম, না করিলে কুলভঙ্গ হইবে। কুলীন শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিলে তাঁহার কুলক্ষয় হইবে। কুলীনের বংশে যাঁহাদের জন্ম, অথচ কুলবিধি অনুসারে যাঁহারা আদান প্রদান করেন নাই, তাঁহারাই ভঙ্গ বলিয়া গণ্য।

১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ কুলাচার্য্য বন্দ্যঘটীয় দেবীবর মিশ্রের (গৌড়ের রাজা "যুসুফ-শাহ"র রাজত্ব কালে) চেষ্টায় এক মহাসভা হইল। সভায় নানাস্থান হইতে প্রধান প্রধান কুলীন ও ঘটক আহুত হইয়াছিলেন। দেবীবর বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে অধিকাংশ কুলীনই নব-গুণ-বিহীন হইয়াছে। তিনি দোষ দেখিয়া একপ্রকার দোষাশ্রিত কুলীনকে এক এক দলে রাখিলেন তদনুসারে এক একটী মেল হইল। এইরূপে সমস্ত কুলীনকে ৩৬ মেলে বিভক্ত করিলেন। গঙ্গানন্দ ও যোগেশ্বর উভয়েই বিচক্ষণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহারা দুইজনে মেল প্রবর্ত্তনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। নানা কুলদোষের একত্র মিলন হেতু মেলের উৎপত্তি। প্রকৃতি, উপাধি, দোষ ও গ্রাম এই চারি প্রকার হইতে বিভিন্ন মেলের নামকরণ হইয়াছে। ২২টী প্রকৃতির নামে, ৬টী গ্রামের নামে, ৩টী উপাধির নামে এবং ৫টী দোষের নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ এই ৩৬টী মেল। ২২টী প্রকৃতির নামে যথা—(১) বল্লভী (২) সর্ব্বানন্দী (৩) সুরাই (৪) চট্টরাঘবী (৫) ভৈরবঘটকী (৬) মাধাই (৭) চান্দাই (৮) বিজয়-পণ্ডিতী (৯) শতানন্দখানী (১০) মালাধরখানী (১১) দশরথঘটকী (১২) কাকুস্থী (১৩) চন্দ্রাপতি (১৪) গোপালঘটকী (১৫) বিদ্যাধরী (১৬) পরমানন্দ মিশ্রী (১৭) ছয়ী (১৮) শ্রীরঙ্গভট্টী (১৯) ধরাধরী (২০) শ্রীবর্দ্ধনী (২১) রাঘব ঘোষালী (২২) শুভরাজখানী। এই ৬টী গ্রাম নাম হইতে যথা—(১) ফুলিয়া (২) খড়দহ (৩) দেহাটা (৪) বাঙ্গাল (৫) বালী (৬) নড়িয়া। ৩টী উপাধি হইতে যথা—(১) পণ্ডিতরত্নী (২) আচম্বিতা (৩) আচার্য্য শেখরী। ৫টী দোষের নামানুসারে যথা:—(১) ছায়া-নরেন্দ্রী (২) পারিহাল (৩) শুঙ্গসর্ব্বানন্দী (৪) প্রমোদনী (৫) হরিমজুমদারী।

১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে ৫টী মেল প্রচলিত হইয়াছিল যথা—(১) ফুলিয়া (২) খড়দহ (৩) বল্লভী (৪) সর্ব্বানন্দী ও (৫) ছয়ী। ইহার পাঁচ বৎসর পরে বাকী ৩১টী মেল প্রচলিত হইয়াছিল।

১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানগণের আধিপত্য বিস্তার হইলে বিধর্ম্মীর অত্যাচারে ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববঙ্গের কাঁটাদিয়া ইত্যাদি স্থান পরিত্যাগ করিয়া আবার রাঢ়দেশে আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিলেন।

৩৬ মেলের মধ্যে ফুলিয়াই প্রধান। নাঁদা, বাঁদা, বারুইহাটী ও মুলুকজুড়ী এই চারি দোষে ফুলিয়া মেলের উৎপত্তি। নিম্নে দোষের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(১) নাঁদা দোষ—নাঁদা নামক স্থানের বাঁড়ুরীগণ বংশজ ছিলেন। ফুলিয়ার মুখ গঙ্গানন্দের জ্যেষ্ঠ সহোদর বল্লভ উক্ত নাঁদার বাড়ুরীর কন্যা বিবাহ করেন, তাহাতে তাহার কুলচ্যুতি ঘটে। এদিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত দুর্গাবর পণ্ডিতের ঘরে বল্লভের কুলকার্য্য হয়। এখন ঘটকেরা নাঁদার বাঁড়ুরীদিগকে মাষচটক নামক শ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য করিয়া দুর্গাবরের কুলরক্ষা করেন। ইহাতে ফুলিয়ার মুখ গঙ্গানন্দের কুলে নাঁদাদোষ সংক্রামিত হয়।

(২) বাঁদা দোষ—বাঁদা নামক খালের নিকট হাঁসাই নামে এক থানাদার থাকিত। শ্রীনাথ চট্টের দুই অবিবাহিত কন্যা সেই খালে জল আনিতে যায়।

হাঁসাই থানাদার তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। শ্রীনাথ চট্টের কাতর ক্রন্দনে হাঁসাই থানাদার কিছুকাল পরে এই দুই কন্যাকে ছাড়িয়া দেয় ও জবরদস্তি করিয়া কন্যাদের বিবাহ দিয়াছিলেন। ইহার এক কন্যা কংসারি পূতিতুণ্ড ও অপর কন্যা গঙ্গাধর বন্দ্যো বিবাহ করেন। গঙ্গাধরের সহিত নীলকণ্ঠ গাঙ্গের কুল হয়। আবার নীলকণ্ঠ গঙ্গানন্দের সহিত আদান প্রদান করেন। এইরূপে গঙ্গানন্দ বাঁদাদোষে দূষিত হন।

(৩) বারুইহাটী দোষ—বারুইহাটী গ্রামের ব্রাহ্মণেরা বারুই যাজন দ্বারা সমাজে হীন হইয়াছিল। এখানে কোন সদ্‌ব্রাহ্মণ কার্য্য করিতেন না। কাঁচনার মুখটী অর্জ্জুন মিশ্র সেই গ্রামে ভোজন করায় সমাজচ্যূত হইয়াছিলেন। শ্রীপতি বন্দ্যের সহিত তাঁহার কুলকার্য্য হয়। পরে ঐ শ্রীপতির সহিত কুল করিয়া গঙ্গানন্দ বারুইহাটী দোষাক্রান্ত হন।

(৪) মুলুকজুড়ি (সাতশতীর) কন্যা গ্রহণ কুলীনের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। গঙ্গানন্দের ভ্রাতৃপুত্র শিবাচার্য্য মুলুকজুড়ীর কন্যা বিবাহ করায় কুলভ্রষ্ট হন, পরে শ্রীপতি বন্দ্যের কন্যা বিবাহ করায় তাঁহার কুলরক্ষা হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে গঙ্গানন্দ ও মুলুকজুড়ি দোষে পতিত হন।

ফুলিয়া মেলের প্রকৃতি গঙ্গানন্দ মুখো, পালটী শ্রীনাথ বন্দ্য। গঙ্গানন্দ মুখো হইতে ফুলিয়া মেলের উৎপত্তি এইজন্য গঙ্গানন্দ ফুলিয়া মেলের প্রকৃতি এবং তাঁহার সহিত শ্রীনাথ বন্দ্য কুল করিয়া সমমর্য্যাদাসম্পন্ন হইয়াছিলেন এই জন্য শ্রীনাথ বন্দ্য পালটী ঘর।

দেবীবরে পর নিয়ম হইল কোন মেলী তাঁহার প্রতিযোগী মেলের সহিত কুলকার্য্য করিলে কুল নষ্ট হইবে না। ফুলিয়া মেলের প্রতিযোগী মেল খড়দহ—এই দুই মেলে কুলকার্য্য করিলেই কুল নষ্ট হইবে না। দেবীবর খ্রীষ্টিয় ১৫শ শতাব্দের প্রথমভাগে মেল প্রচার করেন। প্রথম প্রথম মেল প্রচার দ্বারা সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই, কারণ প্রথম প্রথম কুলীন কন্যার পাত্রাভাব ঘটে নাই। যতই দিন যাইতে লাগিল, নানা ভাগ, নানা ভাব ও থাকের উৎপত্তি হইল। দোষে দোষে মিলন হইলে মেল বলে। অমেলী ও দোষীর মিলনে ভাগ। দোষান্বিত মেলিদ্বয়ের মিলনে যূথ হইয়া থাকে। দেবীবর মেলের মধ্যে ভাগ, ভাব ও যূথ এই তিন প্রকার শ্রেণী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা খড়দহ মেলে ৫টী ভাগ—(১) যজ্ঞেশ্বরী, (২) পঞ্চানথী (৩) বৈদ্যনাথী (৪) হড়সিদ্ধান্তী ও (৫) হরিমিশ্রী ভাগোৎপত্তি।

ফুলিয়ামেলে ভাব দুইটী—যথা (১) নারায়ণ দাসী (২) মাধবরান্নী।

খড়দহ মেলে রজনীকরী ও সনাতনী ভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল।

ফুলিয়া মেলে বীরভদ্রী থাক উৎপত্তির কারণ যথা :—

ফুলিয়া মেলের মুখটী পার্ব্বতীনাথ ঠাকুর নিত্যানন্দাত্মজ বীরভদ্র গোস্বামীর কন্যা বিবাহ করেন। বীরভদ্রের গাঞি ঠিক ছিল না এই জন্য পার্ব্বতীনাথের কুলে দোষ পড়ে। সেইজন্য কোন কুলীন সন্তান তাঁহার স্ত্রীর গর্ভের কন্যা বিবাহ করিতে চাহিতেন না। কাজেই পার্ব্বতী জোর করিয়া গয়ঘড় বন্দ্য লক্ষীনাথ সুত হরিকে ধরিয়া কন্যাদান করেন। কিন্তু হরি বন্দ্য বাসি-বিবাহ না করিয়া পলাইয়া যান। পরদিন পার্ব্বতীনাথ হরি বন্দ্যকে না পাইয়া তাহার পুত্র রামদাসকে ধরিয়া "তুমিই পূর্ব্বরাত্রে বিবাহ করিয়াছ" এইরূপ বলিয়া বলপূর্ব্বক তাহার সহিত কন্যার বাসি-বিবাহ-দিলেন। এদিকে বরের মা ও কন্যার মা উভয়ে সহোদরা ছিলেন, অর্থাৎ পার্ব্বতী ও হরি উভয়েই ঘোষ কানু রায়ের কন্যা বিবাহ করেন, কাজেই হরিবন্দ্য বিবাহ করায় প্রথমে পার্ব্বতীর কন্যা রামদাসের বিমাতা পরে পত্নী ও ভগিনী বলিয়া প্রকাশ পাইলেন। এই দোষে বীরভদ্রী থাকের উৎপত্তি হইল।

ভঙ্গ কুলীনের উৎপত্তি—যে সকল কুলীন বংশজ কন্যা গ্রহণ করেন, তাঁহারা ভঙ্গ কুলীন বা "স্বকৃত ভঙ্গ" বলিয়া গণ্য হন। পূর্ব্বে এরূপ কার্য্য করিলে কুলীন একেবারেই বংশজ বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু দেবীবরের ব্যবস্থা অনুসারে কুলীন বংশজের কন্যা বিবাহ করিলে একেবারে কুল না যাইয়া সাতপুরুষ পর্য্যন্ত ভঙ্গ কুলীন বলিয়া গণ্য হইবে। কারণ কুলীন-পিতৃগণ কিরূপে বংশজের পিণ্ড গ্রহণ করিবেন? এই সাত পুরুষ মধ্যে কুল কার্য্য করিলে তিনি পুনরায় কুলীন বলিয়া গণ্য হইবেন আর ভঙ্গ কুলীন থাকিবেন না।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামই ফুলিয়া মেলের উৎপত্তি স্থান হইলেও এখন আর ফুলিয়ায় কোন কুলীনের বাস নাই। ফুলিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী নবলা, মালিপোতা, শিমুলিয়া, উলা ও শান্তিপুরে এখনও ফুলিয়া মেলের কুলীন ও অবিবাহিত স্ত্রীলোক দেখা যায়। বর্দ্ধমান, হুগলী, খুলনা, বাখরগঞ্জ, ঢাকা, যশোহর ও ফরিদপুর জেলায় ফুলিয়া মেলের নিকষ কুলীনের বাস দেখা যায়।

কুশারী শ্রোত্রিয়গণের বর্ত্তমান বাসস্থান বাঁকুড়ায় সোণামুখী গ্রামে, ঢাকা জেলায় পিঠাভোগ ও কয়কীর্ত্তন, যশোহরের দামুরহুদা, ঘাটভোগ প্রভৃতি।

কুলীন সন্তান পিতার আদেশে কন্যা গ্রহণ ও প্রদান করিলে পিতার তুল্য

সম্মান প্রাপ্ত হন, মর্য্যাদায় ন্যূন হয়েন না। এইরূপে সহোদরগণ মধ্যেও মর্য্যাদার ইতর বিশেষ হয় না। সকলেই সমান বলিয়া গণ্য হইতেন। পিতার আজ্ঞায় অনুষ্ঠিত কোন ভালমন্দ কার্য্যের জন্য সকলেই সমান দোষগুণের ভাগী হইতেন। কিন্তু এক সহোদরের দোষে অন্যের দোষ হইত না।

পরিবর্ত্ত-নির্ণয়—কুলাচার্য্যগণ কুলীনগণের সুবিধার জন্য চারি প্রকার পরিবর্ত্ত বিধি প্রচার করেন। (১) বাগ্‌দান (২) কন্যার অভাবে কুশময়ী কন্যা সম্প্রদান (৩) পরস্পরের কন্যা আদান প্রদান এবং (৪) ঘটকের সমক্ষে "কন্যাদান করিলাম" এইরূপ প্রতিজ্ঞা—চারি প্রকারে পরিবর্ত্ত সম্পন্ন হইত।

সমাজ নির্ণয়—কুলীনগণের বিভিন্ন স্থানে বাস ও সন্তানসন্ততি বৃদ্ধি হওয়ায় সকলের পরিচয় রক্ষার পক্ষে কুলাচার্য্যগণের একটু অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছিল। এই অসুবিধা নিবারণের জন্য কুলাচার্য্যগণ মিলিত হইয়া কুলীন-দিগকে নানা সমাজে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই সমাজ দুই প্রকার; কতকগুলি বসতি স্থানের নামানুসারে ও কতকগুলি প্রসিদ্ধ কুলীনের চলিত নামানুসারে। যথা:—

(১০) মকরন্দের পুত্র (১১) দাশরথি (দাশো) ও (১১) বিনায়ক যথাক্রমে কাঁটাদিয়া ও নপাড়া গ্রামে গিয়া বাস করেন, তাহা হইতে দাশরথির বংশীয়গণ কাঁটাদিয়ার বন্দ্য ও বিনায়কের বংশ নপাড়ার বন্দ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। (১২) তিকো বন্দ্যর পুত্র (১৩) লেঙ্গুড়ী ও (১৩) ভেঙ্গড়ী বাবলা গ্রামে বাস হেতু বাবলার বন্দ্য বলিয়া খ্যাত। (১২) শ্রীধর বা শ্রীপতি বন্দ্যর পুত্র (১৩) আভো উন্দুরা গ্রামে, (১২) দুর্ব্বলী বা দুর্ব্বালের পুত্রগণ (১৩) সঙ্কেত—বাঙ্গাল পাস গ্রামে (১৩) হরি মিশ্র সাগরদিয়া গ্রামে, (১৩) অনন্ত—গয়াঘড় গ্রামে, (১৩) নারায়ণ—স্বল্প (ছোট) বাঙ্গাল পান গ্রামে গিয়া বাস করেন। আবার এই (১৩) নারায়ণ বন্দ্য পুত্র (১৪) পীতাম্বর ছোট বাবলা গ্রামে বাস করেন। এই সকল বাসস্থানের নামানুসারেই প্রত্যেকের অধস্তন বংশধরগণ স্ব স্ব পরিচয় দিয়া আসিতেছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সোণামুখীর প্রাচীন কথা।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোণামুখী সহরের চাটুয্যে পাড়ায় ঠাকুর হরনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সোণামুখী বাঁকুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে সোণামুখী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে সোণামুখী বর্দ্ধমান চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরাজদিগের আমলে পাঁচ সাতটী জেলা একত্রে বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। নবাবি আমলে এইরূপ বিভাগের নাম ছিল "চাকলা"।

বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পাঁচটী বিভাগে ২৮টী জেলা আছে। যথা—(১) প্রেসিডেন্সি (২) বর্দ্ধমান (৩) ঢাকা (৪) রাজসাহী ও (৫) চট্টগ্রাম বিভাগ।

বর্দ্ধমান বিভাগে ছয়টী জেলা আছে। যথা—(১) হাওড়া (২) হুগলী (৩) বর্দ্ধমান (৪) মেদিনীপুর (৫) বাঁকুড়া ও (৬) বীরভূম জেলা।

বাঁকুড়া জেলার সীমা—উত্তর ও পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলা, দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলা, পশ্চিমে বীরভূম জেলা।

রাজা বাঁকুড়া রায় দেবের নামানুসারে জেলা ও সহরের নাম বাঁকুড়া হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আঁড়বা নামক স্থানে তাঁর রাজপ্রাসাদ ছিল। তিনি বিষ্ণুপুর রাজাদের একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। খ্রীষ্টাব্দ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আঁড়বা পরিত্যাগ করিয়া নিজে একটী নগর স্থাপন করেন ও ইহার নাম হয় "বাঁকুড়া"। এই বাঁকুড়া সহরের নামে জেলার নাম "বাঁকুড়া" হয়। চণ্ডীকাব্যের প্রণেতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী রাজা বাঁকুড়া দেবের পুত্রের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি 'চণ্ডীকাব্য' রচনা করেন। রাজা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়া মুকুন্দরামকে "কবিকঙ্কণ" উপাধি প্রদান করেন। চণ্ডীকাব্য গ্রন্থখানি পরে "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" নামে প্রসিদ্ধ হয়।

অন্য প্রবাদ যে পূর্ব্বে বাঁকুড়ার নাম ছিল বাণকুণ্ডা। কালক্রমে এই বাণকুণ্ডা—বাঁকুড়া নামে পরিবর্ত্তিত হয় (বীরভূম বিবরণ ৪৩ পাতা)।

বাঁকুড়া জেলা দুইটী মহকুমায় বিভক্ত—যথা (১) বাঁকুড়া ও (২) বিষ্ণুপুর মহকুমা। বাঁকুড়া মহকুমায় তেরটী থানা ও বিষ্ণুপুর মহকুমায় ছয়টী থানা আছে। সোণামুখী বিষ্ণুপুর মহকুমার অধীন।

বাঁকুড়া জেলার সদর বাঁকুড়া সহর। জজ আদালত ইত্যাদি বাঁকুড়া সহরে আছে। বিষ্ণুপুরে এস, ডি, ও, সব-জজ আদালত আছে। খাতড়ায় কেবল মুন্সেফী আদালত আছে।

বাঁকুড়া জেলার ভৌগলিক অবস্থান—দ্রাঘিমা (longitude) উঃ ২৩° ৪০′ নিরক্ষ (latitude) ৮৭° ৪৫′ গ্রিনউইচের পূর্ব্ব (East of Greenwich)। এই জেলার লোক সংখ্যা সাড়ে দশ লক্ষ। এই জেলায় ৩৯৯৯টী গ্রাম আছে। এই জেলার প্রধান নগরগুলির নাম—বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, সোণামুখী, জয়রামবাটী, গঙ্গাজলঘাটী, অন্দা, খাতড়া, সিমলাপাল, রাইপুর, বাহুবারা, ছাতনা, লালবাজার, ফকুরনা, সহরজোড়া, বড়জোড়া, বিবর্দ্ধ, কুরাসরগড়, রাজগাঁ, মানকুনলি, অযোধ্যা, পাত্রসায়ার, গৌরবাজার, অম্বিকানগর, বাহারা শালমা, খুসবাগ, দিগলগ্রাম, ধারাপাল, জামকান্দি, লোকপুর, শুশুনিয়া, ইন্দাস, লাওগ্রাম, কোটালপুর, কুচিয়াকোল, পদমপুর ও জয়পুর।

এই জেলার পশ্চিমভাগ পাহাড়ময়—ইহার মধ্যে শুশুনিয়া ও বিহারীনাথ পর্ব্বতদ্বয়ই উল্লেখ যোগ্য—ইহাদের উচ্চতা ১৫০০ ফিট।

এই জেলার মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড়ি নদী প্রবাহিত। নদ ও নদীর নাম—

(১) দামোদর নদ—আর্য্যগণের গঙ্গা নদী যেমন পরম পবিত্র নদী, অনার্য্যগণ এই দামোদর নদকে পরম পবিত্র বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। এই নদের জল অনার্য্যগণ এখনও বাঁশের চোঁয়ায় ভরিয়া বহু দূরস্থিত গ্রামে লইয়া গিয়া থাকেন। বর্ষাকালে এই নদ ভীষণ আকার ধারণ করে সেই সময় ইহার পরিসর দুই মাইলের অধিক হইয়া থাকে। অন্য সময়ে কেবল বালুর চড়া, স্থানে স্থানে জল প্রবাহিত হয়, তাহাও হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। এই নদটী জেলার উত্তরে অবস্থিত ও পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে প্রবাহিত হইয়া বর্দ্ধমান জেলায় আসিয়াছে। বর্ষাকালেই কেবল নৌকা চলাচল করিয়া থাকে। ত্রিবেণী হইতে কটকের মহানদ পর্য্যন্ত দামোদরের প্রকাণ্ড বাঁধ উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেব ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিবার পাঁচ বৎসর পর, তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও এই বাঁধ বর্ত্তমান আছে ও বর্ষাকালে কোন ২ বৎসর এই বাঁধ ভাঙ্গিয়া থাকে ও বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলার অনেক গ্রাম ভাসাইয়া দেয় এমন কি এই জল-স্রোত সোণামুখী পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে।

(২) দ্বারকেশ্বর—এই দ্বারকেশ্বর বালিদেওয়ানগঞ্জের ১ মাইল নিম্নে দুই

শাখায় বিভক্ত হইয়াছে, পশ্চিম শাখা ঝুমঝুমি মেদিনীপুরে শিলাই নদীর সহিত মিলিত হইয়া পড়ে এবং পূর্ব্ব শাখা শকরা বন্দরে শিলাই নদীর সহিত মিলিত হইয়া রূপনারায়ণ নাম ধারণ করিয়াছে। এই দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে হরনাথের পিতা জয়রামের মাতুলালয় বেলিয়াড়া গ্রাম। মাতুলালয়ের অনেক জমি দ্বারকেশ্বর গ্রাস করিয়াছে।

(৩) ধলকিশোর (৪) শিলাই (৫) গন্ধেশ্বরী (৬) কাঁসাই (৭) বিরাই (৮) সালি। এই সালি নদী সোণামুখীর উত্তর পূর্ব্বে প্রবাহিত। পূর্ব্বে বর্ষাকালে সালি নদীর জল গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিত ও খরতর বেগে প্রবাহিত হইত সাত আট ঘণ্টার মধ্যেই জল সরিয়া যাইত। এইরূপ ঘটনা বর্ষাকালে মধ্যে মধ্যে হইত। বর্ত্তমানকালে সালির জল অন্যদিকে প্রবাহিত হওয়াতে গ্রামের মধ্যে জল প্রবেশ করে না, তবে গ্রামের উত্তর ও পূর্ব্বদিকের নদীর তীরবর্ত্তী পুষ্করিণী সকল প্রতি বৎসর ভাসাইয়া থাকে। উপরোক্ত নদীসকল ছাড়া আরও অনেকগুলি ছোট ছোট নদী আছে। এই সকল নদীতে বর্ষাকালেই বৃষ্টির সময় জল প্রবাহিত হইয়া থাকে।

সোণামুখী সহর বিষ্ণুপুর সব-ডিভিসনের অধীন। সোণামুখী বিষ্ণুপুর সহর হইতে ২১ মাইল উত্তরে ও পানাগড় রেল ষ্টেসনের ১১ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

সোণামুখীর ভৌগলিক অবস্থান—দ্রাঘিমা (longitude) ২৩° ১৯′ নিরক্ষ (latitude) ৮৭° ২২′।

সোণামুখীর লোক সংখ্যা :—১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিংহের সময়ে ও মারাট্টাগণের অত্যাচারের পূর্ব্বে সোণামুখীতে ৩০,০০০ ত্রিশ হাজারের অধিক লোক সংখ্যা ছিল, ইহার মধ্যে দশ বার হাজার লোক বিষ্ণুপুর রাজ-সরকারে সামন্ত রাজাদিগের অধীনে অস্থায়ী ভাবে সৈন্যের (Militia) কাজ করিত ও কেহ কেহ স্থায়ী সৈন্যেরও চৌকিদারের কাজ করিত। কিন্তু ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে মারাট্টাদিগের অত্যাচারের ফলে অর্দ্ধেক লোক সোণামুখী ত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী নিরাপদ স্থানে পলায়ন করে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত শাসন বিষয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা চিরদিনের মত উঠিয়া যায়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হস্তে ভারতের শাসন-ভার যাইলে লর্ড মেয়ো ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম লোক গণনা বা আদম সুমারী (census) আরম্ভ করেন। সোণামুখীর লোক গণনার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

লোক সংখ্যা

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে	১২৫৬৫		এই কয়বার কত পুরুষ, কত স্ত্রীলোক কত হিন্দু, কত মুসলমান ইত্যাদি বিবরণ সংগৃহীত হয় নাই।
১৮৮১ ,,	৫৫৯০		
১৮৯১ ,,	১৩৪৬২		
১৯০১ ,,	১৩৪৪৮	পুরুষ ৬৩৩৮ স্ত্রীলোক ৭১১০	হিন্দু ১৩২৬১ মুসলমান ১৮৫ অন্য ২
১৯১১ ,,	১৩২৭৫	,, ৬২৫৪ , ৭০২১	
১৯২১ ,,	১০৬৪৪	,, ৫১৪০ , ৫৫০৪	
১৯৩১ ,,	১০৯৮৯	,, ৫৩৩৭ , ৫৬৫২	হিন্দু ১০৩৩৫ মুসলমান ১৫৪ জন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে লোক গণনায় দেখা যায় যে সোণামুখীতে কেবল বাঙ্গালা ভাষা পড়িতে পারে হিন্দু পুরুষ ১৬৫৩ হিন্দু স্ত্রীলোক ২০২, মুসলমান পুরুষ ১৪ জন মাত্র ছিল। ইংরাজি ও বাঙ্গালা পড়িতে ও লিখিতে জানে হিন্দু পুরুষ ৩৪৩ জন, হিন্দু রমণী ৩ জন ছিল।

সোণামুখী চতুর্থ শ্রেণীর সহর। চতুর্থ শ্রেণীর সহরের লোক সংখ্যা ১০,০০০ হইতে ২০,০০০। এইরূপ সহর সমগ্র বঙ্গদেশে ৪৪টী মাত্র আছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সোণামুখীতে একটী বৃহৎ কাপাসি ও রেশমী বস্ত্র বয়নের কারখানা খুলিয়াছিলেন, কোম্পানির নানা স্থানের কারখানা জাত বস্ত্র সকল বর্দ্ধমান ইত্যাদি নানা স্থানে বিক্রয় জন্য প্রেরণ করা হইত ও স্থানীয় তাঁতিদিগের প্রস্তুত বস্ত্র সকল অপেক্ষা পড়তায় কম দামে উৎপন্ন হইত বলিয়া অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় করা হইত। ইহার ফলে স্থানীয় তাঁতিদিগের বস্ত্র বিক্রয় এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বর্দ্ধমানের রাজা তাঁর জমিদারীর মধ্যে কোম্পানির সোণামুখী কারখানা জাত বস্ত্র সকল বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের রাজা তাঁর জমীদারীতে কোম্পানির বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করিলে, সোণামুখীর কমার্সিয়াল রেসিডেণ্ট John Cheap (Commercial Resident), যিনি সেই সময় সোণামুখীতে থাকিতেন। বর্ত্তমান ইন্সেপেকসন বাঙ্গলো (Inspection bungalow) যাহা আছে—ইহাতে তিনি বসবাস করিতেন। পরে এই সাহেব বোলপুর কারখানায় বদলি হন। তিনি বর্দ্ধমান রাজার বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করা বিষয় কোম্পানির রেভিনিউ বোর্ডের (Board of Revenue) গোচরীভূত করেন, এই সংবাদ অবগত হইয়া একজন ইংরাজ অফিসার আসিয়া সকল

বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া, বৰ্দ্ধমান রাজাকে ভবিষ্যতে এরূপ কার্য্য যাহাতে আর না করেন তাহার নিষেধ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু যাহাতে কারখানা জাত কাপড় প্রচুর সংখ্যা বিক্রয় হয়, তাহার জন্য আদেশ করিয়া যান।

সোণামুখীর অধিবাসীগণ নানা প্রকারের অত্যাচার পীড়িত হইয়া সোণামুখী ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া বসবাস করেন। যে সোণামুখীতে ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার লোক সংখ্যা ছিল—সেই লোক সংখ্যা কমিয়া ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১২৫৬৫ তে দাঁড়ায়। এই লোক সংখ্যা ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ৫৫৯০ হইয়াছিল। লোক সংখ্যা কম হইবার কারণ দুর্ভিক্ষ ও নীল-কুঠির অত্যাচার। যে সোণামুখী এক সময়ে কার্পাস বস্ত্রের, রেশম, তসর, গরদ, ও গালার কাজের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল তাহা একেবারে লোপ পায়, বর্ত্তমান সময়ে যাহা আছে তাহা নাম মাত্র। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রাঁচি জেলায় ও অন্যান্য স্থানে ইংরাজ বণিকগণ ও মাড়ওয়ারি ব্যবসায়ীগণ দ্বারা গালার কারখানা স্থাপিত হওয়াতে সোণামুখীর গালার কাজ সম্পূর্ণরূপে লোপ হইয়াছে। সোণামুখীর লোকেরা যাহারা গালার কাজে নিযুক্ত ছিল তাহারা সকলেই ঐ সকল স্থানে গালার কারখানায় নিযুক্ত হইয়া তথায় বসবাস করিয়াছে।

তাঁত, চরকা ও মাকু—অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ তাঁতে যেরূপ মাকু দ্বারা সোণামুখীর তাঁতিরা বস্ত্র বয়ন করিত—এখনও সেই প্রকার তাঁত ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। তাঁতিরা আধুনিক তাঁত ও মাকু পূর্ব্ব অপেক্ষা উন্নত হইলেও বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে বলিয়া মনে করে না।

লৌহ-শিল্প—গ্রামের কামারশালায় লাঙ্গলের ফাল, কাঠ কাটিবার কুঠার বা কুড়ুল, বাইশ, খড়্গা, দা বা কাটারি, বঁটী, কাস্তে, শিকল, হাঁসকল প্রভৃতি দ্রব্য গ্রামবাসিগণের আবশ্যক মত কামারেরা প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকে। সোণামুখীর উৎকৃষ্ট লাঙ্গলের ফাল বিষ্ণুপুর ইত্যাদি দূরবর্ত্তী স্থানের চাষিরা লইয়া যাইত। কামারেরা দেবীর সম্মুখে বলির কার্য্য করিয়া থাকে।

মৃৎ-শিল্প—রন্ধন কার্য্য মৃত্তিকা পাত্রেই হইয়া থাকে। কুম্ভকারেরা প্রতিমা নির্ম্মাণও করিয়া থাকে। ২০।২২ ঘর কুম্ভকারের বাস আছে।

চর্ম্ম-শিল্প—চামার মুচিগণ চটি জুতা করিত ও পূজার সময় ঢাক, ঢোল, বাজাইত ও এখনও বাজাইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে জুতার আমদানি হওয়াতে জুতার কাজ নাই বলিলেই চলে।

বেত্র ও বংশনির্ম্মিত দ্রব্য—ধামা, রেক, কুলা, ডালা, ধুচুনী, পেতিয়া, চেঙ্গারি, কাঠা, চালুনি, ঝোড়া ইত্যাদি হাড়ী, ডোম ও মুচিগণ করিয়া থাকে। ইহারা অনেকেই ঘরামির কার্য্য করে।

চুনুরী—চুনুরীগণ ঝিনুক ও শামুখের চুণ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

কলু—গ্রামের দক্ষিণদিকে ১০।১২ ঘর কলুদিগের বাস আছে। এখন অন্য গ্রামের কলুরা সোণামুখীতে তৈল বিক্রয় করিয়া যায়।

দাতব্য চিকিৎসালয়, পুলিস থানা ও সরকারি অফিস—সোণামুখীতে একটী সব্‌পোষ্ট অফিস আছে, এখানে টেলিগ্রাফের কার্য্যও হইয়া থাকে এই পোষ্ট অফিস বাঁকুড়া সহরের বড় পোষ্ট অফিসের অধীন। এখানে রবিবার ও ছুটীর দিন ব্যতীত প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত (Standard time) ও অপরাহ্নে ১টা হইতে ৪।০ সাড়ে চারিটা পর্য্যন্ত কাজ হয়। রবিবার বা ছুটীর দিন ৮-৩০ হইতে ৯-৩০ সাড়ে নয়টা ও বৈকাল ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত কাজ হয়।

সব্‌রেজিষ্টারি অফিস আছে—ইহা বাঁকুড়া সহরের বড় রেজিষ্টারি অফিসের অধীন। পূর্ব্বে একবার এই সব্‌ রেজিষ্টারি অফিস তুলিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল।

দাতব্য চিকিৎসালয় (Charitable Dispensary) এইখানে প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে রোগী দেখা হয়। রোগী রাখিবার হাঁস-পাতাল নহে। এই চিকিৎসালয়ের খরচ মিউনিসিপালিটী ও সরকার বাহাদুর বহন করেন। এখানে একজন V. L. M. S. ডাক্তার আছেন।

সোণামুখীতে কয়েক জন বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কবিরাজ আছেন। ইহাদিগের দ্বারা অনেকেই চিকিৎসিত হইয়া থাকেন। গ্রামে কয়েক জন কবিরাজ আছেন যাঁহারা নিজে নানা প্রকার বিশুদ্ধ ঔষধ ও তৈলাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। কাশীশ্বর কবিরাজ একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ও ঔষধ প্রস্তুতকারক ছিলেন। উক্ত কবিরাজ মহাশয়

নাভি, গলার শিরা, নাড়ী ও বদন মণ্ডল দেখিয়া মৃত্যুর সঠিক সময় নিরূপণ করিতে পারিতেন। তৎকালে সুদক্ষ নাপিত ছিল। উহারা বৈদ্যের নির্দ্দেশমত অস্ত্রোপচার করিতে পারিত। এলোপ্যাথিক ঔষধালয় আছে ও বর্ত্তমানে কয়েক জন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সোণামুখীতে সরকার বাহাদুরের একটী ইন্সপেকসন বাঙ্গালা আছে। ইহা ডাক বাঙ্গালা নহে। ইহাতে কেবল উচ্চ সরকারি কর্ম্মচারিগণ থাকিতে পান। এই বাঙ্গালাটি পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের (P. W. Department) তত্ত্বাবধানে আছে। এই বাঙ্গালাতে কেবল একজন মুসলমান চৌকিদার আছে।

পুলিস থানা আছে, পূর্ব্বে যখন সোণামুখী বর্দ্ধমান জেলার অধীন ছিল সেই সময়ে এই থানাকে চৌকি বলিত। এই সোণামুখীর চৌকি বর্দ্ধমান জেলার বুদবুদ বড় চৌকির অধীন ছিল। সেই সময় Inspector বা Sub-Inspectorকে বড় দারগা বা ছোট দারগা বলিত। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সোণামুখী বাঁকুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হইলে সোণামুখীর চৌকির নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া পুলিস ষ্টেসন বা থানা (Police Station বা Thana) হয়। সেই সময় হইতে দারগার নাম উঠিয়া যায় ও ইন্সপেক্টর নাম হয়। সেই সময় হইতে সোণামুখীর থানা বিষ্ণুপুরের বড় থানার অধীন হয়। সোণামুখীর থানায় একজন সব্ ইন্সপেক্টর থাকেন।

হাট, বাজার—সোণামুখীতে একটি মাত্র হাট প্রত্যহ বসিয়া থাকে; ইহাকে বাজার বলা চলে না, কারণ কোন প্রকার চালাঘর ইত্যাদির আবরণ নাই। মাঠের ন্যায় খোলা স্থানে চাষী, ফড়িয়ারা তরিতরকারি বিক্রয় করিয়া থাকে; মাছ ও মাংস বিক্রয় হয়।

স্কুল, পাঠশালা, টোল—১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে ইংরাজী হাই স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। হাই স্কুল স্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে একটি মাইনর স্কুল চলিতেছিল। হরনাথ এই মাইনর স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিষ্ণুপুরের সন্নিকট কুচিয়াকোলস্থিত রাধাবল্লভ ইন্স্টিট্যুসন্ হইতে এণ্ট্রান্স

পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হরনাথ যখন পাঠশালায় পড়িতেন সেই সময় তিনটি মাত্র পাঠশালা সোণামুখীতে ছিল। বর্ত্তমান সময়ে সোণামুখীতে ৯টী পাঠশালা চলিতেছে—এই পাঠশালা গুলিতে লোয়ার প্রাইমারি পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় এই পাঠ-শালাগুলি মিউনিসিপালিটী হইতে সাহার্য্য পাইয়া থাকে। হরনাথ যে পাঠশালায় পড়িতেন সে পাঠশালা ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে উঠিয়া গিয়াছিল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সোণামুখীতে 'গুরু মহাশয়ের পাঠশালা' ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বিদ্যালয় ছিল না। এই সকল পাঠশালে হাতের লেখা পুঁথির নকল করিয়া লইতে হইত; পাঠশালার পাঠ শেষ হইলে অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণ কুমারেরা ব্রাহ্মণপাড়া নিবাসী বক্কেশ্বর চক্রবর্ত্তীর টোলে পড়িত। সংস্কৃত পড়িবার ছাত্রের অভাবে বর্ত্তমানে সোণামুখীতে কোন টোল নাই।

গৃহপালিত পশু, বন্যপশু, পক্ষী, মৎস, সরীসৃপ, ডাল, কলাই, তরকারী, ফল, পুষ্প, ধান, চাউল, গম, যব, ইত্যাদি যেমন বাঙ্গলার পল্লিতে পাওয়া যায়, সে সকল সোণামুখীতে জন্মিয়া থাকে।

সোণামুখী ত দূরের কথা সমগ্র বঙ্গদেশে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে গম ও যবের চাষ হইত না। এখনও যে যে স্থানে চাষ হয় তাহাতে গম ও যব অতি অল্পই উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাও অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর গম হইয়া থাকে ও প্রায়ই চিটে হয়। বঙ্গদেশ গম যবেব চাষের উপযোগী স্থান নয়। এই সকল গম হইতে ভাল আটা ময়দা হয় না। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল লাইন খোলা হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে পশ্চিম ও পাঞ্জাবের গম বঙ্গদেশে আমদানি হইত না। ন্যূন্যাধিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী পল্লীর সাধারণ লোকে আটা ময়দা চক্ষেও দেখেন নাই। ধনী লোকেরাই গোশকটে বহু ব্যয় করিয়া পশ্চিম হইতে গম আনাইতেন। সাধারণ লোকের আহার ছিল দুই বেলা ভাত ও মুড়ি। পূর্ব্বে যাহারা রাত্রে ভাত খাইত না, তাহারা চিড়া ও মুড়ি মুড়কীর ফলার খাইত। মুড়ী, সরু চিড়ে, মুড়কী, গুড়, রম্ভা, আম, কাঁঠাল দিয়া দধি কিম্বা দুধের সহিত ফলার করিতেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ভোজনেও চিড়া মুড়কীর ফলার ব্যবহৃত হইত।

লাক্ষা বা গালা, মধু, মোম, রেশম গুটী—

সোণামুখীর চারি পার্শ্বের জঙ্গলে মধু, মোম, লাক্ষা ও রেশম গুটী

প্রচুর জন্মাইত। গালার কাজ সোণামুখীতে যেরূপ হইত সমগ্র মাল্লভুমের অন্য কোন স্থানে সেরূপ হইত না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিলাতে যে গালার চালান দিতেন তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণের উপর কেবল বিষ্ণুপুর (সোণামুখী) হইতে পাইতেন। **Mr Holwell, Governor of Calcutta, remarked in his Interesting Historical Events—"It is from Bishnupur, (Sonamukhi) that the East India Company were chiefly supplied with the articles of shell lacca".**

চেলী, তসর, গরদ, মটকা ও কেটে পট্টবস্ত্রের জন্য এক সময়ে সোণামুখী বিখ্যাত ছিল। এই পট্টবস্ত্রকে সোণামুখীর সাধারণ লোকে পাটের কাপড় বলিত। রেশম গুটী ও রেশমী বস্ত্রের কাজে সোণামুখীর দশ বার হাজার লোকের অন্ন সংস্থান হইত।

পিতল কাঁশা ও শাঁখার শিল্প, নৌকা গঠন ও কাষ্ঠ শিল্প—শাঁখার শিল্প আর নাই। অন্যান্য শিল্প কাজের কিছু বিশেষত্ব নাই। সংসারে চলন মত দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া থাকে। চালানি মাল তাহাদিগের উৎপন্ন দ্রব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণিত হওয়ায় উপস্থিত তাহাদিগের ব্যবসা নাই বলিলে চলে।

রাজমিস্ত্রী, ময়রা ও হালুইকর, গন্ধবণিক, গোপ জাতি—অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহাঁরা সোণামুখীতে বসবাস করিয়া আসিতেছেন।

মিউনিসিপালিটী—১৮৮৬ খ্রীঃ সোণামুখীতে মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হইয়াছে। সোণামুখী সহর ৫টী ওয়ার্ডে বিভক্ত। ৮ জন কমিশানর সর্ব্ব সাধারণ দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। দুই জন কমিশানর সরকার বাহাদুর নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এই দুই জন সরকারী কমিশানর মধ্য হইতে ১৯৩৭ সালে চারি বৎসরের জন্য সব্-রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত ভুদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সরকার বাহাদুর মিউনিসিপাল বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ঠাকুর হরনাথদিগের বাৎসরিক ৭২৲ টাকা ট্যাক্স দিতে হয়।

১ নম্বর ওয়ার্ডে—গোস্বামী পাড়া, বাবু পাড়া, তেলি পাড়া, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, রাণীর বাঁধ (এই স্থানে ভগবতী দেবীর গালার কারখানা ছিল, এখানে ১॥ বিঘা আন্দাজ জমি আছে)। হরি সায়ের, হরনাথ আশ্রম ও সমাধিমন্দির ও পুলিস আউট পোষ্ট অবস্থিত।

২ নম্বর ওয়ার্ডে—ঠাকুর হরনাথের বাটী (১) জয়রামের চালাঘর (২) ভগবতী দেবীর দ্বিতল বাটী (৩) ঠাকুর হরনাথ দ্বারা নির্ম্মিত করগেট মাঠকোটা ও খরিদা দ্বিতল বসত বাটী (৪) শিব মন্দির, বারুইপাড়া (এই বারুইপাড়ার সাগর মাতার আশ্রমে হরনাথ হরিসভা খুলিয়াছিলেন)। লালবাজার, চাটুর্য্যে পাড়া, পুলিস থানা, রথতলা, হাইস্কুল, মিউনিসিপালিটীর অফিস, বুড়াশিবতলা ও মনোহরতলা অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের জন্য পাগল হরনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কৃষ্ণদাস বন্দ্যো এপ্রিল ১৯৩৭ সালে চারি বৎসর জন্য সর্ব্বসাধারণ দ্বারা কমিশানর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভগবান তাঁর মঙ্গলবিধান করুন।

৩ নম্বর ওয়ার্ডে—ধর্ম্মতলা (এই স্থানে কুসুম কুমারী ও ভগবতী দেবীর বাপের বাড়ী) রক্ষিত পুকুর ও একটী বৃহৎ সায়ার। ঠাকুরের কন্যা সুবাসিনী শেষোক্ত সায়ারে জলমগ্ন হইয়াছিলেন।

৪ নম্বর ওয়ার্ডে—কৃষ্ণবাজার, দেওয়ান বাজার, মুকুন্দপুর ও তিনটী বৃহৎ সায়ার অবস্থিত।

৫ নম্বর ওয়ার্ডে—সত্যপীরতলা, রতনগঞ্জ, এই ওয়ার্ডে দৈনিক হাট বা বাজার বসিয়া থাকে, শ্যামবাজার (এই স্থানে সোণামুখী দেবী আছেন), কাঁটা বলিতলা, দশ পুকুর, কীত পুকুর, নীল বাড়ী, চ্যারিটেবল ডিস্পেনসারি, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস ও ইন্সপেকসন বা ডাক বাঙ্গালা অবস্থিত।

মিউনিসিপালিটী স্থাপনের পূর্ব্বে সোণামুখীতে দুইটী মাত্র পাকা রাস্তা ছিল। মুর্শিদাবাদ হইতে পানাগড় দিয়া, কাশী, প্রয়াগ রাস্তা অতিক্রম করিয়া (Crossing the Grand Trunk Road) সোণামুখী, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর দিয়া পুরী গিয়াছে, ইহাকে পুরী রোড বলে, অন্য পাকা রাস্তা শিমলাপাল, বাঁকুড়া সহর, বেলিয়াতোড়, সোণামুখী, পত্রসায়ার, ইন্দাস, জাহানাবাদ গিয়াছে। কাশীর রাস্তা বা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পাঠান বাদশা সের সা নির্ম্মাণ করেন, ইহা হাওড়া হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত

বিস্তৃত। এই রাস্তা সোণামুখী হইতে ১১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাই হুগলি জেলার গঙ্গাধার হইতে নাগপুর পর্য্যন্ত একটী সুবিস্তৃত বর্ত্ম নির্ম্মাণ করেন। এই পথের উভয় পার্শ্বে ছায়াতরু রোপন ও কূপ, খনন করাইয়া দেন ইহাকে ওল্ড নাগপুর রোড বলে। এই রাস্তাও সোণামুখী হইতে বেশী দূর নয়।

১৭৯৫ খ্রীঃ সোণামুখীতে মুন্সেফি আদালত স্থাপিত হইয়াছিল ও ১৮০৯ খ্রীঃ এই মুন্সেফি আদালত কাজের অভাবে উঠিয়া যায়। সেই সময় মুন্সেফগণ কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট বাঁধা মাহিনা পাইতেন না। যত টাকার কাজ হইত অর্থাৎ কোম্পানি যে টাকা বিচার প্রার্থীগণের নিকট হইতে পাইতেন, ঐ টাকার উপর শতকরা হিসাবে কমিসন পাইতেন, যেমন দলিল ইত্যাদি রেজিষ্টারি করিবার জন্য রেজিষ্টারগণ কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাইতেন।

১৭৮০ খ্রীঃ হইতে বঙ্গদেশে সাহেবরা নীলের চাষ করিতে আরম্ভ করেন। বাঁকুড়া জেলার অনেক স্থানে সাহেবরা নীলের কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। বাঁকুড়া জেলায় বহু নীল কুঠী স্থাপিত হইয়াছিল। কোটালপুরের নিকট জগন্নাথপুরে নীল কুঠী ছিল, যশড়িহিতে, ইন্দাস, গোপালনগর, ডুরা, রামপুর, বিশিয়া, মুতনপুর, মাকুরা, ওন্দাগ্রাম, মোচডাঙ্গা, বিষ্ণুপুর, বাসুদেবপুর, জেপুর ইত্যাদি বাঁকুড়া জেলার বহুস্থানে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নীল কুঠী বর্ত্তমান ছিল। (Information from India Atlas Sheet Nos. 113, 129, 151 and 114 N. E, Surveyor General of India)

সোণামুখীতে দুইটী নীল কুটী ছিল (Bankura Gazetteer p. 175) একটী নীলকুটী ঠাকুর হরনাথের বাড়ীর দুই ফারলঙ্গ বা সিকি মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। হ্যারিস (Harris) নামক একজন সাহেব এই কুঠী স্থাপন করেন। এই হ্যারিস সাহেব সোণামুখীর কাপড়ের কারখানার কমার্শেল রেসিডেন্ট সাহেবের ভগ্নীপতি। কুঠীর কার্য্য ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই কুঠীর কার্য্য হ্যারিস সাহেব ছাড়িয়া দিলে, লচমিনারান নামক মাড়ওয়ারি বা হিন্দুস্থানী ব্যবসাদার এই কুঠীর কাজ চালাইয়াছিলেন। এই কুঠীর ভগ্নাবশেষ ইষ্টকের ঘরগুলি এখন বর্ত্তমান। এই কুঠী ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে হ্যারিস সাহেব দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। দাদন দিয়া প্রজাদের নীলের চাষ করাইত ও জোর জুলুম করিয়া নীলের জন্য জমির ইজারা লওয়া হইত। নীল কুঠীর অত্যাচারের বিবরণ দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার নীলদর্পণ পুস্তকে বিষদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ১৮৬১ খ্রীঃ

হইতে নীল কুঠীর অত্যাচার অর্দ্ধেকের উপর কমিয়া যায়, কারণ পাদরি লং সাহেব "নীলদর্পণ" পুস্তকের ইংরাজি অনুবাদ করিয়া বিলাতে প্রেরণ করেন—ইহার ফলে গভর্ণমেণ্টের ইহার উপর দৃষ্টি পড়ে কিন্তু পাদরি লং সাহেব এই পুস্তকের ইংরাজি তরজমা করিয়া বিলাতে প্রেরণ করা অপরাধে ২৪শে জুলাই ১৮৬১ খ্রীঃ কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরডাণ্ট ওয়েলস কর্ত্তৃক পাদরি লং সাহেব এক মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহা ছাড়া তাঁহার এক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ডও হয়। এই জরিমানার টাকা হরনাথের গুণমুগ্ধ জোড়াশাঁকোর বিজয় সিংহের পিতা কালী সিংহ দিয়াছিলেন।

এখানে স্বর্গীয় বিজয় প্রসাদ সিংহের কিঞ্চিত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বিজয় বাবুর কথার উল্লেখ না করিলে ঠাকুর হরনাথের প্রভাব ও বিজয় সিংহের মহত্ব সম্বন্ধে ত্রুটি থাকিয়া যাইবে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় প্রসাদ ঠাকুর হরনাথকে তাঁর বাড়ী লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় একটী সোকেস্ (Showcase) স্থিত কতকগুলি মস্তকের শিখা বা টিকি বা চৈতন দেখান। এই সকল শিখায় টিকিট সংযুক্ত ছিল—ঐ সকল টিকিটে কাহার শিখা ও কত মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছিল লেখা ছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ যোড়াশাঁকোর প্রসিদ্ধ জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতামহ শান্তিরাম সিংহ স্যার টমাস রমবোলড ও মিষ্টার মিডলটনের (Sir Thomas Rombold and Mr. Middleton) নিকট মুর্শিদাবাদ ও পাটনার দেওয়ানি করিয়া প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতা নন্দলাল বিশেষ যত্ন সহকারে পুত্রকে সংস্কৃত, ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় সবিশেষ শিক্ষা দিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন মহাভারতের বিখ্যাত বাঙ্গালা অনুবাদক। তাঁহার এই পুস্তক বহু ব্যয়ে ছাপাইয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন একজন ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন কিন্তু ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামি ঘৃণা করিতেন। ধর্ম্মে কাহার কতদূর বিশ্বাস ও আস্থা আছে এই পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি মূল্য দিয়া শিখা ক্রয় করিতেন। এক একটী শিখা ৫৲ টাকা হইতে ২৫০৲ টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন—ইহাতে তিনি ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। কালী প্রসন্নের সেই সকল সংগৃহীত শিখা বিজয় প্রসাদ ঠাকুর হরনাথকে দেখান। এই শিখা গুলি দেখিয়া ঠাকুর হরনাথের চোখ জলে ভরিয়া উঠে; তিনি বিজয় প্রসাদকে বলেন, বাবা এ পাপ দৃশ্য গৃহে রাখিও না—এগুলি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া দাও। বিজয় প্রসাদ অনেকদিনের যত্নে রক্ষিত শিখাগুলি বিনা বাক্য ব্যয়ে ঠাকুর হরনাথের আদেশ

শিরোধার্য্য করিয়া হাওড়া পুলের উপর হইতে গঙ্গার মধ্যস্থলে নিজে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই শিখাগুলি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে ঐগুলির একটী photograph রাখিয়া ছিলেন। এক সময়ে ঠাকুর হরনাথ ভাগবতকে বলেন—বিজয় বাবা কাজ ভাল করিলেন না—শিখাগুলির photo রাখিয়া পাপকে ঘরে পুষিয়া রাখা হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া সেবক ভাগবত ঠাকুরকে বলেন তবে কি বিজয় বাবুকে এই কথা বলিব। ঠাকুর বলেন তোমাকে এই কথা বলার অর্থ ই যে তুমি বিজয় বাবাকে বলিবে শিখাগুলির ন্যায় Photoটীও গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করেন। ভাগবত বিজয় বাবুকে ঠাকুরের কথা বলেন, কিন্তু তিনি ঠাকুরের আদেশ অমান্য করিয়াছিলেন। ভাগবতের অনুমান এই অপরাধে শেষ জীবনে বিজয় বাবু দুর্দ্দশায় পতিত হন। এইরূপ অনেক ঘটনার কথা পাঠকবর্গকে পরে জানাইব। বিজয় বাবুকে ৪ লক্ষ টাকা ধার দিবার জন্য ৫৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীটস্থ শরৎ দেকে ঠাকুর অনুরোধ করেন কিন্তু আর photo ফেলিয়া দিবার কথা মুখে আনেন নাই। ইহাই তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব।

সোণামুখী মল্লভূমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই মল্লভূমিতে ৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুরের বাগ্দি স্বাধীন রাজারা রাজত্ব করিতেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পর এই মল্লভূমি ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। বঙ্গদেশের নবাবদিগের আমলে এই সমগ্র মল্লভূমি বর্দ্ধমান চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সময় মল্লভূমি বলিয়া কোন প্রদেশের নাম উল্লেখ ছিল না। মল্লভূমির নাম বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ আদি-মল্ল প্রদান করেন নাই। রঘুনাথ এই মল্লভূমির নামানুসারে তিনি রঘুনাথ আদিমল্ল নামে পরিচিত হন। মহাভারতের সভাপর্ব্বের ২৯ অধ্যায়ের ৩, ১৬, ২৫, ২৬ ও ২৭ শ্লোকের ভাবার্থ—"অযোধ্যাদি জয়ের পর ভীম গোপাল কক্ষ, উত্তর কৌশল এবং মল্লপতিকে জয় করিয়াছিলেন। সুহ্মাদিগের অধিপতি এবং সাগরতীরবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিয়াছিলেন এই প্রকার বহু দেশ জয় করিয়া বলশালী ভীম তাহাদের নিকট হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মপুত্র তীরে গমন করিয়াছিলেন। সাগর, উপসাগরবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছপতিদিগের নিকট হইতে ভীম নানাপ্রকার রত্ন কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন"।

উপরোক্ত মহাভারতের শ্লোকে প্রতিপন্ন হয় যে যুধিষ্ঠিরাদি যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন সে সময়েও এই মল্লভূমি বর্ত্তমান ছিল। এখন যুধিষ্ঠিরাদির কাল নির্ণীত হইলে মল্লভূমি যে কতদিনের তাহার আর কোন সন্দেহ থাকে না। তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুর, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, বরিশাল ও ২৪ পরগণা ইত্যাদি

জেলাগুলি সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে সমুদ্র-গর্ভে নিহিত ছিল—ব্রহ্মপুত্র ও ভাগীরথী ইত্যাদি নদী সমূহের ধৌত পলিমাটীর দ্বারা বঙ্গোপসাগরের তলদেশ ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জেলায় পরিণত হইয়াছিল। এই সকল স্থানগুলি ক্রমশঃ উচ্চ হইতেছে ও এখনও পলিমাটী পড়িয়া সুন্দরবন অঞ্চলে নূতন নূতন চড়া দেখা যাইতেছে ও ক্রমশঃ স্থলে পরিণত হইতেছে।

বিদেশীয় পর্য্যটকগণ যথা প্টোলেমি (Ptolemy), প্লিনি (Pliny), মেগাস্থানিস্ (Magasthenes) যীশু খ্রীষ্টের জন্মের চতুর্থ শতাব্দী পূর্ব্বে তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান নাম তমোলুক) ও পার্থলেস (বর্ত্তমান নাম বর্দ্ধমান) স্থানগুলি দেখিয়াছিলেন। তমলুক হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা টানিলে দেখা যায় যে সে সময়েও সোণামুখী গ্রাম ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

"It seems probable that the Bay of Bengal stretched in the north to some portion of the district of Murshidabad and in the west to the borders of Bankura and Midnapur districts, and perhaps the districts of Faridpur, Nadia, Jessore, Khulna, Barisal and 24 Parganas were wholly or partly in the bed of the ocean"

এখন ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে কলিগতাব্দের ৫০৩৮ বর্ষ চলিতেছে। বরাহমিহিরাদি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে ৬৫৪ কল্যাব্দে যুধিষ্ঠিরাদি বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং ৪৩৮৪ (১৩৪৪ বঙ্গাব্দে) বর্ষ পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদি বিদ্যমান ছিলেন, ইহাই আমাদিগের শাস্ত্রকারগণের সিদ্ধান্ত। পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে খ্রীঃ পূঃ ১০০০ হইতে ১২০০ বৎসর মধ্যে মহাভারত রচিত হইয়াছে, ইহার কিছু পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদি বর্ত্তমান ছিলেন। আবার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে খ্রীঃ পূঃ পাঁচ শত বৎসর মধ্যে মহাভারতের রচনাকাল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই মত আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ অনুমোদন করেন।

মহাভারতে আরও লিখিত আছে, বঙ্গভূমি পরাক্রান্ত আর্য্যরাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। যখন যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করেন, পৌণ্ড্রে বাসুদেব, কৌশিকী কচ্ছে প্রবল পরাক্রান্ত মহৌজা ও বঙ্গে সমুদ্রসেন রাজত্ব করিতেন। রাজা বাসুদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট রাজসূয় যজ্ঞে উপহার পাঠাইয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

সোণামুখী গ্রাম পূরাকালে অর্থাৎ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিন হাজার বৎসরের কথা বলিবার উদ্দেশ্য তিন হাজার বৎসর হইতে আর্য্যগণ অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। বীরভূম, বৰ্দ্ধমান, বাঁকুড়া মেদিনীপুর ইত্যাদি জেলার অধিকাংশ স্থান তখন ও নিবিড় জঙ্গল বনভূমি সমাচ্ছন্ন, ভীষণ হিংস্র জীব জন্তুগণের অভ্রভেদী ভৈরবনিনাদে প্রকম্পিত হইত ও অসভ্য অনার্য্য ম্লেচ্ছগণের লীলাক্ষেত্র স্বরূপ গণ্য হইলেও কোন কোন স্থানে আর্য্যগণ প্রভূত পরাক্রমে এখানকার অনার্য্যদিগকে পরাজিত করিয়া অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া বনজঙ্গল কাটাইয়া নূতন গ্রাম নূতন নগর পত্তন করিয়া প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সোণামুখী মল্লভূমের আর্য্য ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের দ্বারা শাসিত হইবার ইতিহাস পাওয়া যায় কিন্তু ইহার পূর্ব্বের রাজন্যবর্গের নাম কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ আদি মল্লের পূর্ব্বে খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাজা নৃসিংহদেবের বংশধরগণ মল্লভূমে রাজত্ব করিতেন। রাজা নৃসিংহদেবের রাজধানী প্রদ্যুম্নপুরে ছিল। এই প্রদ্যুম্নপুর নগর বর্ত্তমান লাওগ্রামের ৮ ক্রোশ পশ্চিমে ছিল। খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম অংশে মালব দেশের রাজা চন্দ্রবর্ম্মা মল্লভূমি জয় করেন। খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্ত মল্লভূমি জয় করেন। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের তৃতীয় শতাব্দী পূর্ব্বে রাজা অশোক মল্লভূমি সহিত কলিঙ্গ দেশ জয় করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত বিষয় আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে তিন, চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ মল্লভূমে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম যে মল্লপতিকে জয় করিয়াছিলেন, এই মল্লপতি নিশ্চয় কোন আর্য্য সন্তান। এই মল্লভূমি উত্তর দক্ষিণে ১৬০ মাইল ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ২১০ মাইল বিস্তৃত ছিল। এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে ১৬ দিন লাগিত। সোণামুখী, বিষ্ণুপুর এই মল্লভূমের মধ্যস্থলে অবস্থিত। তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণের মল্লভূমে আগমনের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত অনার্য্য দ্রাবিড় অসভ্য সাঁওতালগণ স্থানে স্থানে বন জঙ্গল কাটাইয়া বসবাস করিয়াছিল পঞ্চাশ ষাট হাজার লোক সেই সময় কেবল সোণামুখী ও ইহার চারি পার্শ্বে বসবাস করিত। আর্য্যগণের আগমন সময়ে এই সকল অনার্য্য জাতিরা বীরভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা ইত্যাদি স্থানে গিয়া বসবাস করিয়াছে।

দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এলাহাবাদ ত্রিবেণী হইতে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারবর্গের সহিত সোণামুখীতে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। এই

ব্রাহ্মণের নাম হরগোবিন্দ ঠাকুর। তিনি শক্তি উপাসক ছিলেন। তিনি সোণামুখীর শ্যামবাজারে একটী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবীর মুখ সোণা দিয়া মুড়িয়া দিয়াছিলেন বলিয়া, দেবীকে সকলে সোণামুখী দেবী বলিত। সেই অবধি এই গ্রামের নাম সোণামুখী হইয়াছে। কথিত আছে যে তস্করেরা বা ডাকাতগণ কয়েকবার দেবীর সোণার মুখ অপহরণ করিয়া লইয়া যায় কিন্তু হরগোবিন্দ ঠাকুরের বংশধরগণ প্রতিবারই নূতন করিয়া দেবীর মুখ স্বর্ণ নির্ম্মিত করিয়া দিতেন।

১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দেবদ্বেষী মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় (Kalapahar, the General of Sulaiman Karani, independent Nawab of Bengal) উড়িষ্যা অভিযান করিয়া দেশটী জয় করেন এবং উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করেন। এই সকল বিবরণ শ্রীক্ষেত্রের মাদলা পঞ্জীতে বিস্তারিত লিখিত আছে। তৎপরে মুকুন্দদেবের পুত্র গৌড়িয়া গোবিন্দ পিতৃ রাজত্ব উদ্ধার করিয়া রাজা হইলে, নবাব সুলেমান কিরাণির পুত্র দাউদ খাঁর সহিত কালাপাহাড় পুরী লুণ্ঠন করিতে দ্বিতীয় বার আগমন করেন। কালাপাহাড় জগন্নাথ বিগ্রহ দগ্ধ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেন ও মন্দির ভাঙ্গিয়া দেন। উড়িষ্যার রাজা গৌড়িয়া গোবিন্দ, দাউদ খাঁর এই লুণ্ঠনের সংবাদ সম্রাট আকবরের নিকট প্রেরণ করেন, সম্রাট এই সংবাদ অবগত হইয়া মোগল সেনাপতি মুনিন খাঁকে প্রেরণ করেন। তিনি পুরী ও কটকস্থ দাউদ খাঁর সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়া রাজা গৌড়িয়া গোবিন্দকে উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া যান। কালাপাহাড় উড়িষ্যার বহু হিন্দু অধিবাসীগণকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহাদের বংশধরগণকে অদ্যাপি পুরী, কটক ও উড়িষ্যার নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

মল্লভূমের স্বাধীন রাজা বীর হাম্বীর বিশেষ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ রাজা ছিলেন। মল্লভূমের রাজারা কখন কাহাকেও কর দিতেন না। বাঙ্গালার স্বাধীন নবাবগণ কর আদায় করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। কিন্তু মোগল সম্রাট আকবরের সময় বীর হাম্বীর বাৎসরিক সেলামি হিসাবে ১৫০০০৲ টাকা, কোনবার ২০,০০০৲ টাকা পাঠাইতেন ও সময় সময় সৈন্য প্রেরণ করিয়া মোগল সম্রাটকে সাহায্য করিতেন। বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান নবাব সুলেমান কিরাণিকে দমন করিবার জন্য মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিং ও তৎপুত্র জগৎ সিংকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। এই কারণে কালাপাহাড় ও

দাউদ খাঁ পুরী লুণ্ঠন করিয়া ফিরিবার সময় বিষ্ণুপুর রাজার উপর ক্রোধবশতঃ তাঁর রাজধানী অবরোধ করেন কিন্তু রাজা বীর হাম্বীর তাহাদিগকে ভীষণভাবে পরাস্ত করেন। সেই যুদ্ধে দাউদ খাঁর এত সৈন্য হতাহত হইয়াছিল যে বিষ্ণুপুর দুর্গের বহির্দেশে নরমুণ্ডের স্তূপ হইয়াছিল। সেই অবধি দুর্গের এই অংশকে অদ্যাপিও মুণ্ডমালা ঘাট বলিয়া থাকে। কালাপাহাড় ও দাউদ খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিষ্ণুপুর হইতে সোজাসুজি সোণামুখী গ্রামের মধ্য দিয়া দামোদর নদী পার হইয়া পানাগড় দিয়া পলায়ন করেন। সোণামুখী গ্রামের মধ্য দিয়া পলায়নের সময় কালাপাহাড়ের সোণামুখী দেবীর কথা স্মরণ হওয়ায় দেবীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সোণার মুখটী লইয়া পলায়ন করেন (বাঁকুড়া গেজেটিয়ার দ্রষ্টব্য)। কালাপাহাড়ের পূর্ব্ব হিন্দু নাম রাজীবলোচন রায় (মুখোপাধ্যায়)। ইহাঁর পিতা সুরেন্দ্রনাথ রায় সোণামুখীর সিদ্ধান্তপাড়ায় বিবাহ করেন। অতএব কালাপাহাড় সোণামুখীর দৌহিত্র সন্তান। রাজীবলোচন সোণামুখীতে ভুমিষ্ঠ হইয়াছিলেন ও এই সোণামুখীর ধুলি মাটীতে মানুষ হইয়া—এই কার্য্যটী করাতে তাঁকে সাজিয়াছে ভাল। এখনও সেই দেবীর স্থান আছে ও এই স্থানে ছোট একটী মন্দির বিরাজ করিতেছে। এই ঘটনা ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ঘটে। এই সময় সোণামুখীর গিরিগোবর্দ্ধন, বুড়া শিব ও তাঁহাদের মন্দির কালাপাহাড়ের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। কালাপাহাড়ের সঙ্গে এক শ্রেণীর লোক থাকিত যাহারা সৈন্যগণের যাতায়াতের জন্য পুরাতন রাস্তা মেরামত ও নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিত ও নদীর উপর সাময়িকভাবে সেতু নির্ম্মাণ করিত। এই সকল লোকেরা দেবদেবী চূর্ণ বিচূর্ণ করিত ও মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া সাবল গাঁথি ইত্যাদি দ্বারা মন্দির ভাঙ্গিয়া দিত। কালাপাহাড়ের আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া সোণামুখীর লোকেরা গ্রাম ছাড়িয়া গ্রামান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। যুদ্ধ যাত্রাকালে মুসলমান সৈন্যগণ সুরাপানে মত্ত থাকিত, এই সকল সৈন্যগণ সোণামুখীর ছোট বড় সকল মন্দিরগুলিই ধ্বংস করিয়াছিল ও গ্রামবাসীর প্রতি গৃহে প্রবেশ করিয়া লুটতরাজ করিয়া, গৃহগুলিতে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল। সে সময়ে ইষ্টক নির্ম্মিত দালান বাড়ী সোণামুখীতে মোটেই ছিল না।

রাজা ধারি মল্লের পুত্র বীর হাম্বীর ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মল্লভূমের রাজা হন। বিষ্ণুপুরে তাঁর রাজধানী ছিল, এই বিষ্ণুপুরকে বন বিষ্ণুপুর বলিয়া থাকে। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজা বীর হাম্বীরের রাজত্বকালে মল্লভূমের কোন স্থানে

চুরি ডাকাতি হইত না। সোণামুখীর উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বিষ্ণুপুর ও সোণামুখীতে যাহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হয় তাহার জন্য বৃন্দাবন হইতে বৈষ্ণব আনাইয়া সকাল সন্ধ্যায় সোণামুখীর সর্ব্বত্র গান গাহিয়া বেড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই সকল বৈষ্ণবগণকে জমি দিয়াছিলেন। এই সকল বৈষ্ণবগণের আখড়া বা আশ্রম অদ্যাপি সোণামুখীতে অনেকগুলি আছে। তাহাদিগের মধ্যে মনোহর দাস বাবাজীর সমাজ বাটীই সর্ব্ব প্রধান। ইহার বিবরণ হরনাথ জীবনীতে দেওয়া হইবে। মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে (১৫৫৬খ্রীঃ হইতে ১৬০৫খৃঃ) রাজা বীর হাম্বীর রাজত্ব করিতেন। খৃঃ১৫৮৭ হইতে খৃঃ১৬২০ পর্য্যন্ত বীর হাম্বীর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বীর হাম্বীরের সময় বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্টের শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোপাল ভট্টের শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দাস, গোপাল ভট্ট; মানভূমের রাজা নৃসিংহ দেব, কবিকর্ণপুর, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য মুকুন্দ, গোপাল ক্ষেত্রী, বিষ্ণুদাস, রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ও গোবিন্দ অধিকারী বর্ত্তমান ছিলেন।

রাজা বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন ও শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় রাজার "চৈতন্যদাস" নাম দিয়াছিলেন।

আষাঢ়ের কৃষ্ণ পক্ষে তৃতীয় দিবসে।
ভাল দিন নাহি পরে বুঝিল বিশেষে॥
সেইদিন মন্ত্রদীক্ষা রাজার হবেক।
ঠাকুর বিদ্যমানে সামগ্রী করিল অনেক॥
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিল ধ্যানাদিক যত।
শিক্ষা করাইল শ্রীরূপের গ্রন্থমত॥

প্রেমবিলাস—ত্রয়োদশ বিলাস।

হল বীর হাম্বীরের পরম উল্লাস।
শ্রীকালাচাঁদের সেবা করিল প্রকাশ॥
শ্রীআচার্য্য প্রভু তাঁর করে অভিষেক।
শ্রীজীব গোস্বামী হইলা প্রসন্ন তোমাকে॥
শ্রীচৈতন্যদাস নাম থুইল তোমার।
শুনিয়া রাজার নেত্রে বহে অশ্রুধার॥

ভক্তি রত্নাকর, নবম তরঙ্গ ৫৮০।

সোণামুখীতে মিউনিসিপালীটির দ্বারা অনেক রাস্তা ঘাট হইয়াছে সত্য কিন্তু

৪০বৎসর পূর্ব্বে সোণামুখী যেমন ছিল এখনও সেইরূপই আছে। পূর্ব্বে সোণামুখীতে ম্যালেরিয়া জ্বর ছিল না, তখন সোণামুখী একটী স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান ছিল, এখন ইহা ম্যালেরিয়ার স্থান হইয়াছে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে গো-শকট ছাড়া অন্য কোন প্রকার যান ছিল না, এখন ও তাহাই আছে। নূতন দালান বাড়ি ইত্যাদি হয় নাই বলিলেই চলে। অধিকন্তু সাবেক ইটের বাড়ীর অবস্থা ক্রমশই মন্দ হইতেছে।

আমার ন্যায় অনেকেরই ধারণা যে-গ্রাম বা নগরে পাগল হরনাথের জন্ম সে-নগরের শ্রীবৃদ্ধি অবধারিত, কিন্তু ১৮৬৫ সালে হরনাথের জন্মের সময় সোণামুখীতে যাহা ছিল এখন তাহার একচতুর্থাংশ নাই। মিউনিসিপালিটীর আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। পূর্ব্বে যেরূপ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ছিলেন এখন সেরূপ মহাত্মাগণের অভাব। যে সোণামুখীতে পূর্ব্বে শচীনন্দন বিদ্যাবাগীশ, চৈতন্যচরণ সার্ব্বভৌম, গদাধর শিরোমণি, বিশ্বম্ভর বিদ্যাভূষণ, গৌর সিদ্ধান্ত, হরিদেব ন্যায়ভূষণ, বিদ্যানাথ ন্যায়রত্ন, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, উমাচরণ তর্কালঙ্কার ইত্যাদি বাস করিতেন, এখন একজনও এইরূপ মহাত্মা নাই। পূর্ব্বে পণ্ডিত উমাচরণ তর্কালঙ্কারের কথা বলিয়াছি এখন কেবল আর দুই একজন মহাত্মার কথা উল্লেখ করিব।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, সোণামুখীর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের দৌহিত্র সন্তান। উপস্থিত তিনি ৮নং রমানাথ রোড, খিদিরপুর, কলিকাতায় অবস্থান করিয়া থাকেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় মানব আকারে একটী দেবতা। তিনি দীন দুঃখীর মা-বাপ, সোণামুখী হাই স্কুলের বাড়ী নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এত অধিক গোপন দান আছে যে তাহার সংবাদ তাঁর নিজের পরিবারগণও জানেন না। ঠাকুর হরনাথকে আমরা ঈশ্বর বলিয়া পূজা করি না। আমরা সত্যই তাঁকে ভালবাসি, যেমন পিতামাতাকে লোকে ভাল বাসিয়া থাকেন।—এই ভালবাসা বিশুদ্ধ নির্ম্মল না হইলেও তাঁহাকে যে ভালবাসি ইহা সত্য কথা। এই ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ হরনাথের নামে একটী সঙ্ঘ, ফ্রি হাই স্কুল, নৈশ বিদ্যালয়, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় হরিকথার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিদ্যালয় ইত্যাদি যে বাড়ীতে চলিতেছে—সেই বাটীটি সঙ্ঘের নিজের বাড়ী, ৭৮নং বাগবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতায় অবস্থিত। এই বাটীর বিজলীর তার সমস্তই খারাপ হইয়া যায়। এই বিজলীর তার পরিবর্ত্তনের জন্য কলিকাতা ইলেকট্রিক্ কোম্পানি আমাদিগকে দুই মাস সময় দিয়াছিলেন কিন্তু অর্থাভাবে ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। ইলেকট্রিক কোম্পানি দুই মাস গত

হইলে ১৫দিন পরে বিজলী সংযোগ তার কাটিয়া দিবেন বলিয়া নোটিস দিয়াছিলেন। আমরা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম; কিন্তু এই মহাপুরুষ পূজ্যপাদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট ইহার বিষয় অবগত হইয়া তাঁর নিজ ব্যয়ে সমস্ত তার পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। সোণামুখীর এই মহাপুরুষের নিকট আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ রহিলাম। সত্যই ইনি মহাজন যীশুখ্রীষ্টের উক্তির মত দান করিয়া থাকেন।

"Let not thy left hand know what
thy right hand doeth"

আমরা কায়মনপ্রাণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি দীর্ঘকাল সুস্থ শরীরে ও পরম আনন্দে বিরাজ করুন। নিম্নলিখিত ভাষায় তাঁর যশোগান করা ছাড়া, আর আমাদের কি আছে যে তাঁহাকে অঞ্জলি দিব:—

"Happy is the man who hath sown in his breast the seeds of benevolence; the produce thereof shall be charity and love"

"Blessed is he that considereth the poor, the Lord will deliver him in time of trouble"

মহাত্মা গদাধর শিরোমণি একজন সর্ব্বশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সমকক্ষ পণ্ডিত বঙ্গদেশে কেহ ছিলেন না। বঙ্গদেশ বলিয়া নহে সমগ্র ভারতবর্ষে সেই সময়ে কেহ ছিলেন না। কাঁন্দি ও বর্ত্তমানে কলিকাতা পাইকপাড়ার রাজবংশের পূর্ব্ব পুরুষ গঙ্গা গোবিন্দ সিং, লর্ড ক্লাইভ (Lord Clive) ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের (Warren Hastings) দেওয়ান ছিলেন। সেই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বলিতে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংকে বুঝাইত (দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিং পুস্তক দ্রষ্টব্য)। এই বংশে বৃন্দাবনের পরম বৈষ্ণব লালা বাবুর জন্ম হয়। গঙ্গা গোবিন্দ তাঁর মাতৃ বিয়োগ হইলে মহাধুমধামে তাঁর মার শ্রাদ্ধ কার্য্য করিয়াছিলেন। এই শ্রাদ্ধ কার্য্যে এক কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন ২০।২৫ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হয় নাই। যদি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে তাহা হইলেও ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ ২০ লক্ষ টাকা উপস্থিত সময়ের ১ কোটী টাকার সমতুল্য তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত দেওয়ানের কার্য্য করেন। তিনি ইংরাজীতে কথা কহিতে ও লিখিতে পারিতেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। সে সময় সংস্কৃত না জানিলে কেহই

সমাজের নেতা হইতে পারিতেন না—এই জন্য সকলকেই সংস্কৃত ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিতে হইত। লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি দেওয়ানি পদ পরিত্যাগ করিয়া বেলুড়ে (যেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের মঠ) গঙ্গার তীরে বাগান বাটীতে নির্জ্জনে শেষ দিন পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। শেষ সময়ে তাঁর শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ পাঠ শুনিবার ইচ্ছা হয়। সমগ্র বঙ্গদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত আমন্ত্রণ করিয়া আনেন এমন কি দাক্ষিণাত্য দ্রাবিড়, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তিকা ইত্যাদি নানা স্থানের পণ্ডিতগণকে আনাইয়াছিলন। এই সকল পণ্ডিতগণ প্রত্যেকে গঙ্গা গোবিন্দকে এক সপ্তাহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনাইয়া প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া ফিরিয়া যাইতেন। এই ভাবে সোণামুখীর গদাধর শিরোমণির অবসর আসিল। তিনি পাঠ আরম্ভ করিলেন। তিনি ভাগবতের শ্লোকের অন্বয়, ব্যাখ্যা ও ভাবার্থ নির্ণয় করিয়া সুমধুর কণ্ঠে গীত গাইয়া ভাগবতের প্রতি চিত্রখানি প্রাণে অঙ্কিত করিয়া দিতে লাগিলেন—এই ভাবে সপ্তাহ কাল অতীত হইল। শেষদিন পাঠান্তে শিরোমণি মহাশয় আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য গঙ্গাগোবিন্দকে দিতে গেলেন, গঙ্গাগোবিন্দ তাহা গ্রহণ করিলেন কিন্তু তিনি যুক্ত করে শিরোমণি মহাশয়কে বলিলেন, "আর এক সপ্তাহ আপনার পাঠ শুনিবার বাসনা হইয়াছে।" অগত্যা শিরোমণি মহাশয় আর এক সপ্তাহ পাঠ করিলেন। এবারেও গঙ্গাগোবিন্দ আর এক সপ্তাহ পাঠ শুনিবার প্রস্তাব করিলেন। এই ভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস কাটিয়া যাইতে লাগিল, শিরোমণি মহাশয় প্রত্যহ নূতনভাবে বিভোর হইয়া পাঠ করেন। ভক্ত ও ভগবান যে এক ইহা আমরা শুনিয়াছি মাত্র—ইহার অর্থ কি বুঝি না। আজ সোণামুখীর ভক্ত-প্রধান গদাধর ও গোবিন্দ এক হইয়াছেন তাই শ্রীগোবিন্দের অনন্ত কোটী ভাব ভাণ্ডারের চাবি গদাধরের হাতে দিয়াছেন। গদাধর অপরাহ্নে যখন হেলিতে দুলিতে ভাবে বিভোর হইয়া ব্যাসাসনে আসিয়া বসিতেন তখন শ্রোতৃবর্গ তাঁকে দেখিয়া ভাবে মাতোয়ারা হইতেন। প্রত্যহ নূতন ভাব, নূতন ব্যাখ্যা, আরব্য উপন্যাসের এক সহস্র রজনীর গল্প শোনার ন্যায় গঙ্গাগোবিন্দ সিং গদাধরের নিকট বাঁধা পড়িলেন, শ্রীগোবিন্দ আকুল প্রাণের ডাক শুনেন তাই তিনি গদাধরকে ছুটী দিতে পারিলেন না। এই ভাবে দুই বৎসরে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত শুনিলেন। বিদায় কালে গদাধরকে এক লক্ষ টাকা প্রণামি দিয়াছিলেন। ধন্য সোণামুখী তুমি এরূপ সন্তান প্রসব করিয়াছিলে, তোমাকে কোটী কোটী প্রণাম করি।

Imperial Libraryতে রক্ষিত পুস্তকে এ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা নিম্নে দিলাম :—

"Ganga Govind Singh was zealous in promoting the Hindu religion and celebrating its worship. He performed the Sradh ceremony of his mother with immense pomp. He was never fond of sinking money in bricks and mortar for his own habitation and an assembly such as he had invited could not be accommodated in any house however spacious it might be. He had therefore to erect a temporary shed on a maidan outside his dwelling. The Rajahs of Nadia and Natore being Brahmans had the first seats. Then came those of the Rajahs of Burdwan and Dinajpur and next there were the Rajah of Jessore, the Mahashayas of Patuli and so on according to the rank and position of every guest. Raja Krishna Chandra was laid up at the time and was unable to stir out. He therefore desired his eldest son Siva Chandra to proceed to Kandi on the occasion. On his refusing to do so the Rajah pointed out to him, the power and influence of Ganga Govind with the rulers of the country; and went so far as to say that of all men in Bengal, Ganga was the only person whose friendship and good-will he was ever solicitious to secure at any cost. Siva Chandra was then convinced and went at last with a large retinue. He was given a Sidda which he distributed to the poor. Another was again sent which he also distributed to the poor. For the 3rd time a Sidda was sent to him and an idea of the quantity may be formed, when it is known that the termeric alone consisted of 4 cart loads. Siva Chandra was so astonished that he declared the ceremony to be a Daksha-Jagna (দক্ষযজ্ঞ) to which Ganga replied that it was more as Siva did not adorn the Jagna.

Besides the Sradha of his mother, Ganga performed two more ceremonies with a pomp, the like of which has never been witnessed in Bengal. One was the Annaprashan of his grand-son Lala Babu in which invitation cards to Pandits were engraved on gold leaves and the other the Paran (feeding) after the chanting of the sacred Puran at his house in Belur.

Gadadbar Shiromoni of Sonamukhi, Burdwan, is said to have made his debut on that occasion and Ganga Govind was so much pleased with his eloquence and musical powers that he rewarded him with a lump sum of one lakh of rupees."

Calcutta Review, 1874, Vol 58, Pages 99—100.

অনেকের ধারণা যে পাগল হরনাথ সোণামুখীতে জন্ম গ্রহণ করাতে গ্রামটী তীর্থে পরিণত হইয়াছে। এই ধারণাটী সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পাগল হরনাথের জন্মের বহু পূর্ব্বে সোণামুখী সাধু মহাপুরুষের লীলা-ক্ষেত্র ছিল। এইরূপ ১২।১৩ জন মহাপুরুষের বিবরণ অবগত হইয়াছি। বাহুল্য ভয়ে সে সকল বিবরণ দিতে নিরস্ত হইলাম। ঠাকুর হরনাথের সময়ে যে সকল সিদ্ধ মহাপুরুষ সোণামুখীতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের উল্লেখ যথাস্থানে প্রকাশ করা হইবে। আর একটি মহাপুরুষের উল্লেখ করিব।

এই মহাপুরুষের নাম বিশ্বম্ভর বিদ্যাভূষণ। ইনি গদাধর শিরোমণির পুত্র। বিশ্বম্ভর বিদ্যাভূষণের জমিদারী ছিল—বর্দ্ধমান রাজাদিগের একজন পত্তনিদার ছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিঃসন্তান, তিনি জমিদারীর মুনফা হইতে গিরি-গোবর্দ্ধন পূজা ও সদাব্রতে ব্যয় করিতেন। এক সময়ে বর্দ্ধমানের রাজা ১৭৫০০০৲ টাকা দাবি করিয়া বিদ্যাভূষণের নামে নালিস করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় রাত্রে গিরি-গোবর্দ্ধন প্রভুর আরাধনা করিতেন। রাত্রি ১টার সময় তাঁর উপাস্য দেবতা দৈব-বাণীতে বলেন "বিশ্বম্ভর আর চিন্তা করিও না—আগামী কল্য মোকর্দ্দমার রায় বাহির হইবে—তুমি জয়ী হইবে" এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বিশ্বম্ভর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না. তিনি তৎক্ষণাৎ সকল লোকদিগকে জানাইলেন ও গিরিগোবর্দ্ধনের একটী বৃহৎ মহোৎসব করিবার আয়োজন করিতে বলিলেন। প্রথমে লোকেরা, বিদ্যাভূষণ মহাশয় মামলার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া পাগল হইয়াছেন, মনে করেন; কিন্তু তাঁর আগ্রহে মহোৎসবের আয়োজন করেন। পরদিন অপরাহ্নে যখন মহোৎসব পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে এমন সময় সংবাদ আসিল যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় মোকর্দ্দমায় জয়লাভ করিয়াছেন।

সোণামুখীতে তান্ত্রিকতার প্রভাব।

শিব ও শক্তির উপাসনা বিষয়ক শাস্ত্রকে তন্ত্র শাস্ত্র বলে, ইহা বেদের এক শাখা বিশেষ। বৌদ্ধ আচার্য্যগণ যখন শঙ্করাচার্য্যাদি মহাপুরুষগণ দ্বারা পরাভূত হইতে লাগিলেন তখন তাঁহারা সকলেই তন্ত্র শাস্ত্রের

অনুশীলন করেন ও তন্ত্রোক্ত মন্ত্র সকল চেতন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তান্ত্রিকগণ মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, ধন, মান, সন্তানাদিপ্রাপক তান্ত্রিক অনুষ্ঠান-বিশেষ যাজন করিয়া যজমানদিগের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইতেন। তান্ত্রিকদিগের এই প্রকার অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া সকলেই শিব ও শক্তির উপাসক হইয়া পড়িয়াছিলেন। বঙ্গদেশে তাঁহাদিগের প্রভাব ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা কিছু বেশী বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই জন্য বঙ্গদেশে যত শক্তি মন্ত্রের উপাসক অন্যান্য প্রদেশে ইহার একচতুর্থাংশও নাই। পশ্চিমাঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্যে শৈব উপাসক আছেন কিন্তু তাঁহারা শক্তি মন্ত্রের উপাসক নহেন। মহাপ্রভু চৈতন্য দেব যখন নবদ্বীপে বর্ত্তমান ছিলেন তখন ষোল আনার মধ্যে দুই আনা লোকেও তাঁর বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। সেই সময়ে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ইত্যাদি তান্ত্রিকদিগের প্রভাব অক্ষুণ্ণভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। নবদ্বীপের কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশই বর্ত্তমান কালীমূর্ত্তির আবিষ্কারকর্ত্তা। কথিত আছে যে তিনি তাঁর উপাস্য কালিকা শক্তি দেবীকে কি প্রকার মূর্ত্তিতে পূজা করিবেন ইহার জন্য তিনি দেবীর নিকট প্রার্থনা করেন। দেবী প্রত্যাদেশ করেন যে অতি প্রত্যুষে পথে যে মূর্ত্তি দেখিবে ঐ মূর্ত্তিই দেবীর মূর্ত্তি। আগমবাগীশ মহাশয় অতি প্রত্যুষে গৃহদ্বার খুলিয়া পথে বাহির হইলেন, পথে কাহাকেও দেখিলেন না। কিছু দূর গিয়া এক গোপ গৃহের নিকট আসিলেন। তথায় দেখেন এক ঘোর কৃষ্ণবর্ণা, ষোড়শী যুবতী, সন্তানাদি হয় নাই, বক্ষঃস্থলের আবরণ উন্মুক্ত, দক্ষিণ পদ প্রসারিত, বাম পদ কিঞ্চিৎ পশ্চাতে আছে। দক্ষিণ-হস্তে গোময় তাল ও গোময় দেয়ালে নিক্ষেপ করিবার জন্য প্রসারিত। এমন সময় আগমবাগীশ মহাশয় যুবতীর দৃষ্টি পথে আসিল। যুবতী তাঁহাকে দেখিবা মাত্র লজ্জায় জিহ্বা বাহির করিয়াছিলেন, যাহাকে লজ্জায় জিহ্বা কাটা বলে। "পূর্ণ মনস্কাম হইলাম" বলিয়া আগমবাগীশ যুবতীকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। আগমবাগীশ মহাশয় স্বহস্তে কালীর ঐ প্রকার মূর্ত্তি করিয়া পূজা করিতেন ও বস্ত্রে আবৃত করিয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিতেন।

মহারাজ বীর হাম্বীরের রাজত্ব কালের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৮৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুরের রাজারা ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন, তখন তাঁহারা দেবীর সম্মুখে নরবলি দিতেন। এই সময়ের পূর্ব্বে রাজারা সকলেই শৈব উপাসক ছিলেন।

পূর্ব্বে সোণামুখীর সকলেই শক্তির উপাসক ছিলেন। সোণামুখীতে নরবলি দেওয়ার কথা শুনা যায় নাই। এখনও অনেকেই শক্তি উপাসক। বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর, চৈতন্য সিং, গোপাল সিং ইত্যাদি রাজন্যবর্গ সোণামুখীতে যাহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রসার লাভ করে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা বীর হাম্বীরের বহু পূর্ব্ব হইতে বিষ্ণুপুরের শক্তি মূর্ত্তির পূজা হইয়া আসিতেছে ও এখনও হইয়া থাকে। সোণামুখীতে যাহাতে শাক্ত প্রজাদিগের পূজায় কোন প্রকার ব্যাঘাত না ঘটে তাহার দিকে বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কেবল হিন্দু বলে নয়, মুসলমানদিগকে, পাঞ্জাবের শিখদিগের গুরু নানকদেবের শিষ্যগণকে (নানকপন্থি) বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক শূন্য পুরাণ রচয়িতা রামাই পণ্ডিতকে. মসজিদ্, আশ্রম ও মঠ নির্ম্মাণের জন্য নিষ্কর জমি দান করিয়াছিলেন ও এখন তাহারা ঐ সকল জমি ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। সোণামুখীতেও বৈষ্ণবদিগকে আখড়া বা মঠ স্থাপনের জন্য নিষ্কর জমি দান করিয়াছিলেন।

সময় নিরূপণ করিবার ঘড়ি আবিষ্কারের পূর্ব্বে, সময় নিরূপণ করিবার জন্য স্বাধীন রাজারা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সময় নিরূপণ করিতেন। বিষ্ণুপুরের রাজারা ঠিক সময় জানিবার জন্য একটী পাত্রের নিম্নে ছিদ্র করিয়া জলের উপর ভাসাইয়া সময় নিরূপণ করিতেন। সোণামুখীর শাক্ত প্রজারা দুর্গা পূজার মহাষ্টমীর পশু বলিদানের সময় ঠিক করিতে পারেন না, এই দুঃখ বিষ্ণুপুরের রাজা আদিমল্ল রাজবংশের ১৯ ধারার জগৎ মল্লকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে জানান, সেই সময় তিনি প্রদ্যুম্নপুর হইতে বিষ্ণুপুরে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। রাজা জগৎমল্ল হুকুম দেন যে মহাষ্টমীর সন্ধিপূজার বলিদানের সময় নিরূপণ জন্য তাঁর কেল্লার গড় হইতে কামান দাগা হইবে ও এই শব্দ সোণামুখীর শাক্তগণ শুনিতে পাইলে সোণামুখীর শাক্তগণ সন্ধি পূজার সময় ঠিক করিয়া লইবেন। অদ্যাবধি এই শব্দ শোনা গিয়া থাকে। পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল যে ঐ কামানের শব্দ শুনিয়া শাক্তভক্তগণ যে যাঁহার বাটীতে ছাগ. মহিষাদি বলিদান দিয়া বিষ্ণুপুর রাজাদিগের সোণামুখীর আমলাবর্গের নিকট বলিদান দেওয়া ছাগাদির মুণ্ড ও বলিদানের রক্তাক্ত খড়্গ সহ আসিলে একখানি করিয়া মূল্যবান শিরোভূষণ পাইতেন। যে সর্ব্ব প্রথম আসিতেন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান শিরোবস্ত্র পাইতেন— পর পর যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা সকলেই পর্য্যায় ক্রমে কম মূল্যের বস্ত্র পাইতেন। সোণামুখীতে অধিক সংখ্যায় প্রতিমা পূজা হয় এই

উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয় তাহার জন্য রাজারা উপরোক্ত প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

সকলেই সর্ব্বাগ্রে আসিবার জন্য একদলের সহিত অন্য দলের ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিয়া যাইত ও প্রতি বৎসর ৬০।৭০ জন লোক মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতেন। এই মহাষ্টমীর যুদ্ধ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর রাজত্বের লোপ হয়। রাজা চৈতন্য সিং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন জমিদার বলিয়া গণ্য হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে রাজা চৈতন্য সিং বাৎসরিক চারি লক্ষ টাকা কর দিতেন। চৈতন্য সিংএর পর রাজা মাধব সিং এই কর দিতে না পারায় বিষ্ণুপুর জমিদারী ১২ই নভেম্বর ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রেতার অভাবে ২১৫০০০৲ টাকায় বিক্রয় হয়। বর্দ্ধমানের মহারাজ এই জমিদারী ক্রয় করিয়াছেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সোণামুখী বর্দ্ধমান মহারাজের জমিদারী হইয়াছে। সোণামুখীর জমিদার বাবুরা বর্দ্ধমান রাজার পত্তনিদার মাত্র। রাজা মাধব সিং এর জমিদারী বিক্রয় হইয়া গেলে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বাঁকুড়া কলেক্‌টরেট আক্রমণ করেন ও যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বন্দী হন ও কলিকাতার জেলখানায় পলিটিকেল বন্দীভাবে আবদ্ধ থাকেন ও এই জেলখানায় তাঁর মৃত্যু হয়। উপরোক্ত চৈতন্য সিং কলিকাতার লর্ড ক্লাইভের নিকট জমিদারী সম্বন্ধে মামলা চালাইবার অর্থাভাবে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং ও রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর দ্বারা কোন্নগরের লবণ ব্যবসায়ী গোকুল মিত্রের নিকট মদন মোহন বিগ্রহ ৫০০০৲ টাকায় বন্ধক দেন ও ইহা পরে ৭২০০৲ টাকার দায়ে নিলাম হইলে গোকুল মিত্র ক্রয় করিয়া কলিকাতার বাগবাজারে বিগ্রহ স্থাপন করেন।

বিষ্ণুপুর রাজাদের রাজত্ব যাইলেও রাজবংশের কেহ কেহ ভিন্ন ভিন্ন জমিদারী স্থাপন করেন। বিষ্ণুপুর, ইন্দাস জামকুন্দি ও কুচিয়াকোলে এই সকল বংশধরের জমিদারী আছে। জামকুন্দির দামোদর সিং এর বংশধরগণ জামকুন্দি হইতে অদ্যাবধি কামানের অভাবে মহাষ্টমীর দিন বোমা ফুটাইয়া থাকেন। যে স্থানে বর্ত্তমান পুলিসের থানা আছে পূর্ব্বে এই স্থানটী বিষ্ণুপুরের রাজাদের কাছারি বাড়ী ছিল। রাজাদের আমলে যে উচ্চ স্থান হইতে বস্ত্র বিতরণ হইত, অদ্যাবধি পুলিস সেই স্থান হইতে বস্ত্র বিতরণ করিয়া থাকেন। ১৮০২ খ্রীঃ হইতে ১৯০০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইংরাজের হস্তে বিষ্ণুপুরের রাজত্ব যাইলেও শিরোভূষণ বিতরণ পুলিসের হস্তে ন্যস্ত হইলেও প্রতি বৎসর দুই তিনটী খুন জখম হইত। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে নিয়ম হইয়াছে যে মহাষ্টমীর তোপের শব্দ শোনা

যাইলে কেহই থানায় আসিয়া বস্ত্র লইতে পারিবে না। পুলিস হইতে বিগলের শব্দ হইলে তবে শিরোবস্ত্র লইতে আসিবে। এই বস্ত্র বিতরণের ব্যয়-ভার সরকার বাহাদুর লইয়াছেন। এই বস্ত্র দেওয়া নাম মাত্র সার হইয়াছে। থান কাপড়ের ৪ ইঞ্চি চওড়া ও লম্বায় দুই হাত মাত্র এক এক জনকে দেওয়া হয়।

শাক্তদিগের এইরূপ পূজা ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রাজা বীর হাম্বীর ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণব রাজারা বন্ধ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বিষ্ণুপুরের শেষ রাজা চৈতন্য সিং এর পিতা রাজা গোপাল সিং পূজায় পশুবলি দেওয়া বন্ধ করিবার সবিশেষ চেষ্টা করেন। ইহাতে ও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বাঙ্গলা অভিধানে গোপালের বেগার বলিয়া প্রবাদ বাক্য স্থান লাভ করিয়াছে, ইহা সকলেই জানেন। এই গোপাল আর কেহ নহে উপরোক্ত বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিং। রাজা গোপাল সিং এক জন পরম বৈষ্ণব ছিলেন; দিনরাত্রি তাঁর হাতে হরিনামের মালা থাকিত, তিনি হুকুম দেন যে তাঁর রাজত্বের মধ্যে হিন্দু মাত্রকেই, সে যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন, মধ্যাহ্নের আহারের পূর্ব্বে ১০৮ বার রাধাকৃষ্ণনাম জপ করিতে হইবে। যে তাঁর এই হুকুম অমান্য করিবে তার কঠিন সাজা হইবে এমন কি শিরশ্ছেদ পর্য্যন্ত হইবে। এক তাঁতি তার কাজে আবদ্ধ ছিল, অধিক বেলা হইয়াছে দেখিয়া শীঘ্র স্নান করিয়া আহারে বসিল, প্রথম গ্রাস মুখে দিবার পূর্ব্বে রাজার হুকুমের কথা স্মরণ হইল, হস্তের অন্ন ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িলেন, তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন আহার না করিয়া উঠিয়া পড়িলেন যে? তাঁর স্বামী উত্তর করিলেন "আজ গোপালের ব্যাগার দেওয়া হয় নাই" সেই সময় অর্থাৎ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে (গোপাল সিং এর রাজত্ব কাল ১৭৪৮ খ্রীঃ) দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক প্রবীণ লোকে বলিয়া থাকেন এই প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি স্থান সোণামুখী। আমি তাঁতি পাড়ার অনেক প্রাচীন তাঁতিদিগের নিকট অনুসন্ধান করিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই।

উপরোক্ত রাজা গোপাল সিং তাঁর রাজত্বের মধ্যে অন্য আর একটী হুকুম প্রচার করেন যে শাক্তগণ দেবী পূজার সময় পশুবলি দিতে পারিবে না। পশুর পরিবর্ত্তে আখ, কুমড়া ইত্যাদি বলি দেওয়া যাইতে পারিবে, যে কামার এই হুকুম অমান্য করিবে তাহার শিরশ্ছেদ হইবে। সোণামুখীতে কোন কামার মহাষ্টমীর দিনে শিরশ্ছেদের ভয়ে পশুবলি দিতে স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহাদের বাড়ীতে

মহামায়ার পূজা হইয়াছিল সকলেই দেশী কুমড়া ইত্যাদি বলি দিয়াছিলেন। এই সময় হইতে অনেকেই দেবীর পূজার সময় পশুবলি দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন, ক্রমশঃ এই প্রথা বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সোণামুখীর সকলেই রাজার হুকুম পালন করিয়াছিলেন, কেবল দুই ঘর গৃহস্থ রাজার হুকুম অমান্য করিয়া দেবীর স্থানে কামারের অভাবে নিজেরা ছাগ বলি দিয়াছিলেন। এক জনের নাম চৌধুরী পাড়া নিবাসী কালীকান্ত চৌধুরী—জাতিতে ব্রাহ্মণ, অন্য জনের নাম ভুবনমোহন দাস—জাতিতে তাঁতি, নিবাস মনোহরতলার পশ্চিমাংশে। তাঁহাদিগকে রাজার নিকট ধরিয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা নিজেরাই বিষ্ণুপুরে রাজার নিকটে গিয়া উপস্থিত হন ও তাঁহাদের অপরাধ স্বীকার করিয়া দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন। রাজা তাঁহাদের অপরাধ ক্ষমা করেন ও তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের প্রথা অনুসরণ করিয়াছেন জানিয়া পরম প্রীত হন। সেই সময় হইতে মহারাজ তাঁর হুকুম রদ করিয়া দেন; অধিকন্তু এই শাক্ত ভক্তগণকে, যাহাতে ভবিষ্যতে তাঁহাদের পূজা বন্ধ না হয় সেই উদ্দেশ্যে নিষ্কর জমি দান করেন। ইহাদিগের বংশধরগণ এখনও এই নিষ্কর জমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। রাজার আদেশে মহাষ্টমীর দিন কামান দাগার শব্দ শুনিলে প্রথমে দক্ষিণ হস্তে কালীকান্ত চৌধুরী শিরোবস্ত্র পাইতেন ও বামহস্তে ভুবনমোহন দাস শিরোবস্ত্র পাইতেন। এখন এই দুই ঘরের পূজার লোপ হইয়াছে ও পুলিশ হইতে যে ভাবে বস্ত্র দেওয়া হয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুর রাজবংশের ইতিহাসে দেখা যায় যে রঘুনাথ আদিমল্ল ৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মল্লরাজ্য স্থাপন করেন ও তিনি মল্লভূমের প্রথম রাজা হন। তাঁর রাজধানী প্রদ্যুম্নপুরে স্থাপিত হয়। এই রাজবংশধরগণ বিষ্ণুপুরের বা বনবিষ্ণুপুরের রাজা বলিয়া পরিচিত। মল্লভূমের অন্তর্গত বিষ্ণুপুর রাজধানী বনবিষ্ণুপুর বলিয়া পরিচিত কারণ এই সহরের চারিধারে শাল গাছের বন বা জঙ্গল ছিল ও এখনো শালগাছ দেখা যায়। বঙ্গদেশে অনেকগুলি স্থানের নাম বিষ্ণুপুর আছে। মেদিনীপুর জেলায় বিষ্ণুপুর নামে একটী গ্রাম আছে। এই বিষ্ণুপুরকে অন্যান্য বিষ্ণুপুর হইতে পৃথক ভাবে নির্দ্দেশ করিবার জন্য ইহাকে বনবিষ্ণুপুর বলে। রঘুনাথ আদিমল্ল যে সময়ে মল্লভূমের রাজা হন ঠিক সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের বিখ্যাত হিন্দু রাজা আদিশূর উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে আনাইয়া তাঁর রাজ্যে বসবাস করান কিন্তু ছয় শত বৎসর পরে পৃথ্বীমল্ল যখন এই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বংশধরদিগকে মল্লভূমে আনাইয়া বাস করান তখন তাঁহারা

সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান বাঙ্গালী ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিবার অভ্যাস একেবারেই ছিল না। পোষাক পরিচ্ছদ ও উপাধি বর্ত্তমান বাঙ্গালীর ন্যায় হইয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরের অতি বৃদ্ধ পিতামহকে কোন বিশিষ্ট রাজা মল্লভূমে আনাইয়া বাস করান। যজ্ঞেশ্বর হইতে হরনাথের ২১ পুরুষের ব্যবধান এবং যজ্ঞেশ্বরের পূর্ব্বতম আরও ৪ পুরুষ ধরিয়া লইলে মোট ২৫ পুরুষ হয়। এক শত বৎসরে চারিপুরুষ বর্ত্তমান থাকিলে ৬০০ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে হরনাথের পূর্ব্বপুরুষ বা যজ্ঞেশ্বরের অতিবৃদ্ধ পিতামহ মল্লভূমে বাস করেন। সম্ভবতঃ বিষ্ণুপুরের রাজা পৃথ্বীমল্ল তাঁর রাজত্ব কালে (১২৯৫ খৃঃ হইতে ১৩১৯ খৃষ্টাব্দ) যজ্ঞেশ্বরের অতি বৃদ্ধ পিতামহকে কাটোয়ার সন্নিকট কোন গ্রাম হইতে আনাইয়া অর্থ, জমি ও নানা প্রকার সাহায্য করিয়া লাওগ্রামে বাস করান। কোটালপুরের ৬ মাইল পূর্ব্ব দিকে লাওগ্রাম অবস্থিত। লাওগ্রামের ১৬ মাইল বা কোটালপুরের ১০ মাইল পশ্চিম দিকে প্রত্যুম্নপুর বা বর্ত্তমান পদমপুর অবস্থিত। প্রত্যুম্নপুরে পূর্ব্বে মল্লভূমের রাজধানী স্থাপন করেন। প্রত্যুম্নপুরের ১৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে বিষ্ণুপুর অবস্থিত।

রঘুনাথ মল্ল হিন্দু রাজবংশের বংশধর, তাঁর ধমনীতে হিন্দু শোণিত প্রবাহিত ছিল, এই জন্য তিনি রাজা হইয়া আদর্শ হিন্দু রাজ্য স্থাপনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন ও ইহাতে আংশিকভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁর বংশধরেরা আদর্শ বৈষ্ণব রাজা হইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। রঘুনাথ মল্ল ও তাঁর পরবর্ত্তী রাজারা প্রথমে শৈব, পরে শাক্ত ও সর্ব্বশেষে হরনাথের জন্মের পূর্ব্বে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন ও সত্য সত্যই তাঁরা সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহারা মল্ল রাজত্বের সর্ব্বত্রই বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্থাপনের বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এই চেষ্টা একেবারে বৃথা হয় নাই। মল্লভূমির অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কেবল সোণামুখী গ্রামই আদর্শ বৈষ্ণব গ্রামরূপে পরিণত হইয়াছিল, এই জন্যই এই গ্রামে অনেক বৈষ্ণব-কুলতিলক মহাপুরুষ বসবাস করিয়াছিলেন ও এই গ্রামে অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই পরম পবিত্র সোণামুখী গ্রামে হরনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রঘুনাথ মল্ল ও তাঁর বংশধরেরা যেন ঈশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মল্লরাজত্ব স্থাপন ও শাসন করিয়াছিলেন—তাহারা মল্লভূমি হইতে ঈশ্বর-বিমুখতা দূর করিয়াছিলেন, দেশবাসী-দিগের ভিতর ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি করা অবশ্য কর্ত্তব্য এই জ্ঞান আনাইয়া-

ছিলেন। যখন তাঁহাদিগের রাজত্বের সর্ব্বত্র এই চরম শিক্ষা প্রচার করা শেষ হইয়াছিল—সেই সময় তাঁহাদের রাজত্বের লোপ হয়। পাগল হরনাথের আবির্ভাবের ৫০ বৎসর পূর্ব্বে মল্লভূমের সর্ব্বশেষ রাজা বর্ত্তমান ছিলেন।

এই রঘুনাথ আদিমল্লের পরিচয়ের আবশ্যক। রঘুনাথের পিতা বৃন্দাবনের নিকট জয়নগর গ্রামে বাস করিতেন। এই জয়নগরকে পূর্ব্বে রাস্থ ভ্রমর গড় Ranth Bhramar Garh) বলিত, টড সাহেব লিখিত রাজস্থানের ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে। রঘুনাথের পিতা রাণ্ডেল কায়স্থ বংশের রাজা ছিলেন। তিনি গৃহ-বিবাদে রাজ্যচ্যুত হইয়া, গর্ভবতী রাণীকে লইয়া ৺পুরীধামের পথে রওনা হন। যাহাতে তাঁহার শত্রুরা তাঁহাকে সন্ধান করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে সুদূর উড়িষ্যার পথে রওনা হইয়াছিলেন, সেই সময় ৺পুরীধামে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে পথে যাত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া ৺পুরীধামের পথে রওনা হন। কোটালপুরের নিকট লাওগ্রামে পৌঁছিলে পূর্ণগর্ভা রাণী পদব্রজে অগ্রসর হইতে অপারক হইয়াছিলেন। পূর্ণগর্ভা রাণীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া একজন ব্রাহ্মণ—নাম মনোহর পঞ্চানন ও একজন কায়স্থ—নাম ভগীরথ গুহ ঐ গ্রামে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে বলেন, তাহাতে তিনি সম্মত হন ও ভগীরথ গুহের বাড়ীতে আশ্রয় পান ও তথায় অবস্থান করেন; কিন্তু রাজা রাণীকে তথায় রাখিয়া ৺পুরীধামে রথযাত্রা দর্শনে যাত্রা করেন। রাজা তাঁহার জয়শঙ্কর তরবারি রাণীর নিকট রাখিয়া যান। আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আনীত পাঁচ জন কায়স্থ সেবায়েৎ মধ্যে এক জন সেবায়েৎ দাশরথি গুহের পূর্ব্ব-পুরুষের বংশধর এই ভগীরথ গুহ। মনোহর পঞ্চানন ও ভগীরথ গুহের তত্ত্বাবধানে রাণীকে রাখিয়া রাজা ৺পুরীধামে পৌঁছান ও তথায় কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করেন। ইহার কিছুদিন পরে রাণী তাঁর প্রথম সন্তান, একটী পুত্র প্রসব করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রসবের পঞ্চম দিনে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই পুত্রের নাম রঘুনাথ আদি মল্ল। রঘুনাথের মাতৃবিয়োগ হইলে তাঁহাকে ভগীরথ গুহের স্ত্রী লালন পালন করেন। রাণী পাঁচ দিনের শিশুকে রাখিয়া অমরধামে চলিয়া গেলে ধর্ম্মপ্রাণ মনোহর পঞ্চানন ও ভগীরথ গুহ বিশেষ ভীত হইয়া পড়েন। কেমন করিয়া এই সদ্যোজাত শিশুকে বাঁচাইবেন তাহার জন্য চিন্তিত হন ও একটী সদ্য-প্রসবা রমণীর অনুসন্ধান করিতে থাকেন কিন্তু লাও-গ্রামে সেরূপ রমণী না পাওয়াতে কোটালপুর হইতে এক সদ্য-প্রসবা বাগ্‌দিনী রমণীকে আনেন ও এই শিশুকে স্তন দিবার জন্য তাহাকে নিযুক্ত করেন। রাণী

যে-দিন তাঁহার সন্তান প্রসব করেন ঠিক সেই দিন এই বাগ্‌দিনী রমণীর একটী পুত্র সন্তান হয় ও ইহাও তাহার প্রথম সন্তান। সেই বাগ্‌দিনী রমণী এত বলিষ্ঠা ও সুস্থকায়া ছিল যে দুইটী সন্তানকে স্তন পান করাইয়াও তাহার স্তনে প্রচুর দুধ থাকিত। রঘুনাথ তিন চার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই বাগ্‌দিনীর স্তনের দুধ পান করিয়াছিলেন। এই বাগ্‌দিনী রমণী রঘুনাথের উপর অপত্য-স্নেহবশতঃ নিজ গ্রামে ফিরিয়া যান নাই। সে ও তাঁর স্বামী লাওগ্রামে ভগীরথ গুহের বাড়ীতে বাস করিয়াছিল। রঘুনাথ মল্ল রাজা হইলে তাঁহার ধাই মা ও তার স্বামীকে রাজপ্রাসাদে রাখিয়াছিলেন ও ভগীরথ গুহকে তাঁহার দেওয়ান করেন। রঘুনাথ বালক কাল হইতে প্রত্যহ ভগীরথ গুহ ও তাঁর স্ত্রীকে আর এই ধাই মা ও তাঁর স্বামীকে প্রণাম করিতেন। তিনি রাজা হইলেও এ অভ্যাস ত্যাগ করেন নাই। বাল্যকালে রঘুনাথ, ভগীরথ গুহের গরু মহিষ চরাইতে মধ্যে মধ্যে দূর বনে যাইতেন। ভগীরথ গুহ ও তাঁর স্ত্রী নিষেধ করিলেও শুনিতেন না। ভগীরথ গুহের ছেলেদের সহিত রঘুনাথ পাঠশালায় পড়িতেন। পাঠশালার মধ্যে তাহার তুল্য মেধাবী ছেলে কেহই ছিল না। অল্পকাল মধ্যে রঘুনাথ পাঠশালার পাঠ শেষ করেন। রঘুনাথ অন্যান্য বালকদিগের সহিত ছুটাছুটী, কপাটী খেলা ও কুস্তি লড়িতে ভালবাসিতেন। কখন কখন দুই দলে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধের অনুকরণ করিতেন। বালকেরা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত, রঘুনাথকে বালকরা সর্দ্দার বা দলপতি বলিত। অল্প বয়সে তিনি এরূপ বলবান ও শক্তিশালী হইয়াছিলেন যে দেশের প্রধান প্রধান লোকেরাও তাঁহাকে মোড়ল বলিয়া ডাকিতেন। কথিত আছে একদিন মধ্যাহ্নে বালকদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়াতে একটী গাছের ছায়ায় গভীর নিদ্রাভিভূত হইলে সঙ্গী বালকেরা অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইতে না পারাতে বালকরা মধ্যাহ্ন আহারের জন্য সকলে বাড়ীতে চলিয়া যায়। মধ্যাহ্ন সূর্য্য ঘুরিয়া যাওয়ায় তাঁহার মুখে রৌদ্র আসিয়া পড়ে। রঘুনাথ অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। এমন সময় একটী প্রকাণ্ড বিষধর সর্প তাঁহার নিকটে আসিয়া যাহাতে রঘুনাথের মুখে রৌদ্র না পড়ে এরূপ ভাবে ফণা বিস্তার করিয়াছিল। বাগ্‌দিনী ধাই মা রঘুনাথকে ডাকিতে মাঠে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে গৃহে ফিরিয়া গিয়া সকলকে ইহার বিষয় বলেন। ভগীরথ গুহ, মনোহর পঞ্চানন ও অনেক লোক আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া একবাক্যে সকলে বলেন, এই ছেলে নিশ্চয় রাজা হইবে। সর্পটী এই অবসরে ধীরে ধীরে জঙ্গলের দিকে চলিয়া যায়। রঘুনাথের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ও

সকলকে দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হন। এই সময় রঘুনাথের ৯ বৎসর বয়স। সত্য সত্যই তিনি ১৬ বৎসর বয়সে রাজা হইয়াছিলেন। শিশুকালে রঘুনাথ বাগ্‌দিনী রমণীর স্তন পান করিয়াছিলেন বলিয়া ও বাগ্‌দিনী রমণী দ্বারা লালিত পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া বিষ্ণুপুরের রাজাদিগকে বাগ্‌দি রাজা বলিয়া থাকে।

এই ভাবের সর্পের ঘটনা ১০ বৎসর বয়সে, হরনাথের জীবনে ঘটিয়াছিল। যে স্থানে এই ঘটনা হয় হরনাথ আমাকে ঐ স্থানটী দেখাইয়াছিলেন। এই স্থানটী কুন্দাবাবুর আমবাগানের দক্ষিণে ও আনন্দ মিলন বাগানের পশ্চিমে অবস্থিত। ১৯০৭।১৯০৮ সালে ঠাকুর কাশ্মীর হইতে ছুটী লইয়া দেশে আসিলে, রাধাবল্লভ শীল, রাধিকাপ্রসাদ নিয়োগী, অটলবিহারী নন্দী, রাধাবিনোদ নিয়োগী, নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, ভাগবত মিত্র, রাধিকা ঘোষ, অভয় দে, ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য্য, সুধীরঞ্জন শেঠ, রামনারাণ হাতী, হেম ঘোষ ইত্যাদি ভক্তগণ তাঁহাদের অবসর মত সোণামুখীতে গিয়া তিন চার দিন অবস্থান করিতেন। এক সময়ে ভাগবত ও রাধাবল্লভ শীল সোণামুখীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ঠাকুর হরনাথ অভ্যাসবশতঃ প্রত্যহ প্রাতঃকালে মলত্যাগের জন্য আনন্দ-মিলন বাগানের মধ্যে জঙ্গলের দিকে যাইতেন, কারণ তিনি মলত্যাগের জন্য নির্জ্জন স্থান পছন্দ করিতেন। তিন চারি জন একত্রে শৌচে যাইতাম কিন্তু জলপাত্র গাড়ু একটী মাত্র থাকিত। এই গাড়ুটী ঠাকুর হরনাথের বড় ভ্রাতা শিবনারায়ণের। তাঁহাকে আমি জ্যেঠা মহাশয় বলিতাম। এই জল-পাত্রটী বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার ভার আমার উপর ছিল। আমি জ্যেঠা মহাশয়ের অনুমতি লইয়া গাড়ুটী লইয়া যাইতাম। গাড়ুতে জল ভরিয়া লইয়া গেলে ঠাকুর আমাকে মূর্খ বলিতেন, তাই বাধ্য হইয়া শূন্যপাত্র লইয়া যাইতাম। আনন্দ মিলন মন্দিরে যে অনন্তকুণ্ড আছে তখন এইটী ডোবার স্বরূপ ছিল। উহাই পরে অনন্তকুণ্ড হয়, কিন্তু বারমাস জল থাকিত, এই ডোবা হইতে পাত্রে জলপূর্ণ করিয়া প্রথমে ঠাকুরকে দিতাম। তিনি জল-পাত্র হস্তে জঙ্গলে প্রবেশ করিতেন ও সকলকে এক সঙ্গে বিনা জলাধারে শৌচে বসিতে বলিতেন। সেই সময় অর্থাৎ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বাগানের স্থান সোণামুখীর জমীদার বাবুদিগের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হয় নাই। ঠাকুর জলশৌচান্তে ঐ গাড়ুতে নিজে জল ভরিয়া নিকটের লোককে দিতেন। তিনি আবার জলশৌচান্তে গাড়ুটী জলপূর্ণ করিয়া অন্যকে দিতেন। এ যাত্রায় ঠাকুরকে লইয়া আমরা তিন জন লোক ছিলাম। ঠাকুর জলশৌচান্তে

জল-পাত্রটী ডোবা হইতে জলপূর্ণ করিয়া রাধাবল্লভকে দিতে যান, রাধাবল্লভ ডোবায় জলশৌচ করিয়াছেন, বলাতে তিনি স্বয়ং জল-পাত্রটী লইয়া আমার নিকটে আসেন। ঠাকুর ও রাধাবল্লভকে আসিতে দেখিয়া জল শৌচ না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াই, কারণ আমি যে স্থানে মলত্যাগের জন্য বসিয়াছিলাম সে স্থানটী মাঠের মতন স্থান। এই স্থানটীর পরিমাণ চার পাঁচ বিঘা হইবে। ইহার তিন দিকেই শাল বনের জঙ্গল ছিল কিন্তু কি আশ্চর্য্য ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানটী মাঠ ছিল এখনও তাহাই আছে।

ঠাকুর নিকটে আসিয়া জলপাত্রটী হাতে দিয়া বলিলেন—তুই যেখানে মলত্যাগে বসিয়াছিস্ ঠিক ঐ স্থানে আকন্দ গাছের নিকট আমি দশ বৎসর বয়সে শৌচে বসি, শৌচে বসিয়া আপন মনে গান ধরিয়া দিয়াছিলাম। তখন আমার গলার স্বর বাঁশীর শব্দের মতন মধুর ছিল, এখন তার কিছুই নাই নিজের গানে নিজেই বিভোর হইয়া গিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পরে মনে হইল যেন শ্রীকৃষ্ণ আমার গান শুনিতে পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ফিরিলাম, দেখি একটা প্রকাণ্ড সাপ ফণা বিস্তার করিয়া আমার পশ্চাতে গান শুনিতেছে। সাপটাকে দেখিয়া আমার গান বন্ধ হইয়া গেল, সাপটাও তার ফণা সঙ্কোচ করিয়া ঐ আকন্দ গাছের গোড়ার একটা গর্ত্তে প্রবেশ করিল। ঠাকুরের কথা শেষ হইতে না হইতে আমি যে স্থানে শৌচে বসিয়াছিলাম তাহার নিকটের গর্ত্ত হইতে একটা প্রকাণ্ড বিষধর সর্প (গোখুরা জাতীয়) মস্তক উন্নত করিয়া আন্দাজ অর্দ্ধেক বাহির হইয়া পড়ে, তাহা দেখিয়া আমি গাড়ু লইয়া পলায়ন করিতে থাকি, ঠাকুর আমাকে দৌড়িতে নিবারণ করিয়া বলেন, ভয় কি সম্ভবতঃ এইটাই সেই সাপ। সর্পরা অনেক দিন বাঁচে ও নিজের গর্ত্ত সহজে ছাড়ে না। সাপটাকে পুনরায় গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিলাম।

গত এপ্রেল ১৯৩৭ সালে একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কলিকাতার এরাটন জুট মিলের পার্শ্বের নূতন খালের বাধের উপর বসিয়া তিন জন বন্ধুতে মিলিয়া ক্লেওরিনেট বাঁশী বাজাইতেছিল। তাহারা দেখিতে পায় কিছু দূরে বাঁধের একটা গর্ত্তের মধ্য হইতে একটা সাপ মস্তক উত্তোলন করিয়া বাঁশী বাজান শুনিতেছিল। যেমন তাহারা বাঁশী বাজান বন্ধ করিতেছিল অমনি সাপটা গর্ত্তে প্রবেশ করিতেছিল। যতবারই তাহারা বাঁশী বাজাইয়াছিল ততবারই সাপটা বাহির হইয়াছিল। এইভাবে কতক দিন ধরিয়া এই তামাসা বহু লোকে দেখিয়াছিল ও এই সংবাদটী সংবাদ পত্রেও ছাপা হইয়াছিল। সাপরা যে সঙ্গীতপ্রিয় তাহা

সকলেই জানেন। কিন্তু ঠাকুর যখন সাপের গল্প করেন তখন কেন সাপটা বাহির হইয়াছিল ইহা আমার বুদ্ধির অগম্য। ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ও ঠাকুর যে ভাবে নির্ভীক অচল অটল ভাবে তথায় দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা দেখিবার এক দৃশ্য বটে। সর্প-সংক্রান্ত ঘটনা ঠাকুরের জীবনে অনেক ঘটিয়াছে যাহা তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছি তাহার বর্ণনা পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

ঠাকুর হরনাথ একদিনও ভাবেন নাই যে তিনি ঠাকুর, মহাপুরুষ বা স্বয়ং ঈশ্বর। সন্দেশের তাল বা কঠিন ক্ষীর হইতে পুতুল তৈয়ারী হয়, তেমনি ভালবাসা জমাট বাঁধিয়া হরনাথ মূর্ত্তি হইয়াছিল। জলশৌচের পাত্র জলপূর্ণ করিয়া বহন করিয়া অন্যকে দেওয়া কত ভালবাসার খেলা ইহা আমাদের ধারণায় আসে না। এক কথায় তাঁহার ভালবাসার তুলনা এ জগতে মিলে না।

পূর্ব্বে আমরা বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ আদিমল্লের কথা বলিতেছিলাম। এই বিষ্ণুপুরের রাজারাই সোণামুখীর দণ্ডমুণ্ডের মালিক ছিলেন, এই জন্যই তাঁহা-দিগের কার্য্যকলাপাদি সোণামুখীর ইতিহাসের সহিত জড়িত আছে ও ভবিষ্যতে থাকিবে। রঘুনাথ ১৬ বৎসর বয়সে লাওগ্রাম মধ্যে একজন বলিষ্ঠ মল্ল বা পালওয়ান বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তিনি এরূপ বলবান হইয়াছিলেন যে, বলিষ্ঠ মহিষ ও বৃষের শিং ধরিয়া উহাদিগকে ঘুরাইয়া জমিতে নিক্ষেপ করিতে পারিতেন। প্রদ্যুম্নপুরের রাজা নৃসিংহ দেব রঘুনাথের বীরত্বের কথা শুনিয়া-ছিলেন। কোন উৎসব উপলক্ষে রঘুনাথ প্রদ্যুম্নপুরের রাজার বাড়ীতে উপস্থিত হন। স্বাধীন রাজা নৃসিংহ দেব রঘুনাথের সুন্দর দেহের গঠন দেখিয়া মুগ্ধ হন ও রঘুনাথকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। নৃসিংহ দেব রঘুনাথকে রাজা উপাধি দিয়াছিলেন। এক সময়ে ইন্দাস থানার এলাকাধীন রাজা প্রতাপ নারায়ণ বিদ্রোহী হইলে প্রদ্যুম্নপুরের রাজা নৃসিংহ দেব বিদ্রোহী প্রতাপ নারায়ণকে দমন করিবার জন্য রঘুনাথকে নিযুক্ত করেন। রঘুনাথ বিদ্রোহী রাজা প্রতাপ নারায়ণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া প্রদ্যুম্নপুরের রাজা নৃসিংহদেবের নিকট আনয়ন করেন। নৃসিংহদেব সন্তুষ্ট হইয়া রঘুনাথকে কোতালপুর, ইন্দাস, লাওগ্রাম ইত্যাদি আটখানি গ্রামের রাজা করেন। রঘুনাথ রাজা হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বাগ্‌দিনী ধাই মাকে রাজপ্রাসাদে আনেন ও ভগীরথ গুহের বংশধরগণকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। বাঁকুড়া হইতে সোণামুখী যাইবার রেলপথে বেলিয়াতোড় ষ্টেসনের (B. D. Ry. Baliatore Station) রায় পরিবারবর্গ ভগীরথ গুহের বংশধর। বিষ্ণুপুর মল্ল রাজত্ব স্থাপনের বহু শতাব্দী

পূর্ব্বে এই মল্লভূমে হিন্দু রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। মল্লভূমের হিন্দু রাজারা সুদূর প্রদেশ এলাহাবাদ হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, কুমার, তাঁতি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতি আনাইয়া নিজ রাজ্যের নানা স্থানে বসবাস করান। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে সামাজিক, রাজনৈতিক, শিল্প কলাদি, ধর্ম্ম শিক্ষা নানা বিষয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল; ইহার একমাত্র কারণ মল্লভূমের মধ্য দিয়া পুরী, মাদ্রাজ, রামেশ্বর, হরিদ্বার, পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, চট্টগ্রাম, ইত্যাদি স্থানে যাইবার প্রধান রাস্তা ছিল ও এখন আছে। সোণামুখী গ্রামের মধ্য দিয়া গৌড়ে ও পুরী যাইবার পথ আছে, এই সকল স্থানের যাত্রীদিগের নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত জন্য বিষ্ণুপুর রাজাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। অন্যান্য প্রদেশের আচার-পদ্ধতি ধর্ম্ম-কলাদি এই কারণে অবাধে মল্লভূমে প্রবেশ করিয়াছিল। রঘুনাথ আদিমল্ল এরূপ ভাবে রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী রাজারা মল্লভূমিকে উন্নতির পথে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যদি সোণামুখী গ্রাম ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল ইহা সত্য হয় তাহা হইলে সেই সময় এই স্থানটী কি জঙ্গলে পূর্ণ ছিল না এই স্থানে সে সময়েও লোকের বসবাস ছিল,—এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সোণামুখী গ্রামে লোকের বসবাস ছিল। সাঁওতাল ও দ্রাবিড়রা চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে সোণামুখীতে ও ইহার চারিপার্শ্বে বসবাস করিয়াছিল। প্রদ্যুম্নপুরে আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু আর্য্য রাজত্ব স্থাপিত হইলে এই স্থানের বিতাড়িত অনেক দ্রাবিড় ও সাঁওতাল জাতিরা সোণামুখীতে আসিয়া বসবাস করে। সে সময়ে সোণামুখীতে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি কোন জাতির বসবাস ছিল না।

ভারতের অতি প্রাচীন অধিবাসিগণ সম্বন্ধে কোনরূপ ইতিহাস না থাকিলেও একথা প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমান কালের পার্ব্বত্য ও বন্য নাগা, কুকি, খাসিয়া, ভুটিয়া, লেপচা, সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা ইত্যাদি জাতি তাহাদেরই বংশধর। এই সকল জাতি উত্তর ও উত্তরপূর্ব্ব গিরি-সঙ্কটগুলি দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, অবশিষ্ট জাতিগুলি ভারত মহাসাগরের দ্বীপ সমূহের অধিবাসিবর্গের জাতি। তাহারা দক্ষিণপূর্ব্ব দিক হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। সে আজ ১০,০০০ দশ হাজার হইতে ২০,০০০ বিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। এই সকল জাতির পর ভারতে যে জাতি আগমন করিল, তাহারা দ্রাবিড় নামে

পরিচিত (Dravidians)। বর্ত্তমান কালে প্রচলিত তামিল, তেলেগু, কাণাড়ী এবং অন্যান্য ভাষা দ্রাবিড়দেরই ভাষা। দ্রাবিড় সভ্যতা সবিশেষ উন্নত ছিল। তাহাদের ভাষা, সাহিত্য, এবং ধর্ম্ম, উন্নত সভ্যতার পরিচয় প্রদান করে। দ্রাবিড়গণ অন্যান্য নাগা, কুকি, কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল ইত্যাদি জাতিগণকে পর্ব্বতে জঙ্গলে তাড়াইয়া দিয়া সর্ব্বত্র রাজত্ব স্থাপন করে, তাহারা দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া আত্মরক্ষা করিত, এই জাতি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও বড় বড় অট্টালিকাপূর্ণ নগরীতে বাস করিত ও নৌকাযোগে নদী ও সাগর পার হইয়া দেশ বিদেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। দ্রাবিড়গণ প্রথমে পশ্চিম এশিয়ার অধিবাসী ছিল এবং ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া বেলুচিস্থানের ভিতর দিয়া আসিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ক্রমশঃ তাহারা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

এই দ্রাবিড় জাতি যেমন প্রথমে অনার্য্য সাঁওতাল, কোল, ভীল ইত্যাদি আদিম জাতিগণকে পর্ব্বতে জঙ্গলে তাড়াইয়া দেয়, সেই ভাবে ভারতে আর্য্য জাতির আগমনে এই দ্রাবিড় জাতিও জঙ্গলে পর্ব্বতে গ্রামের বহুদূরে ক্রমশঃ আর্য্যগণ দ্বারা পরাস্ত হইয়া বিতাড়িত হয়। দুই হাজার আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য জাতিরা এলাহাবাদ পর্য্যন্ত আগমন করেন। তাহারা আর পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হয় নাই এবং বঙ্গদেশকে তাহারা নিকৃষ্ট, বসবাসের অযোগ্য বোধ করিত। কিন্তু দুই হাজার বৎসর হইতে দুই এক জন বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই অনার্য্য দ্রাবিড় জাতির স্বাধীন রাজাদের কথা ত্রিশ অধ্যায় ২৫, ২৬ ও ২৭ শ্লোকে মহাভারতের সভাপর্ব্বে উল্লেখ আছে। এই দ্রাবিড় জাতিরা মল্লভূমের রাজা ছিলেন। প্রদ্যুম্নপুরের রাজা নৃসিংহ দেবের পূর্ব্বপুরুষগণ মল্লভূমের স্বাধীন দ্রাবিড় রাজাদের পরাস্ত করিয়া আর্য্য রাজত্ব স্থাপন করেন। সাঁওতালরা পূর্ব্বেই দ্রাবিড়দের অত্যাচারে জঙ্গলে ও পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছিল আর এই দ্রাবিড়রা আর্য্যগণ দ্বারা তাড়িত হইয়া সোণামুখী গ্রামের বহির্ভাগে গিয়া বসবাস করিয়াছিল। সোণামুখীতে এই তিন শ্রেণীর জাতি লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথম অনার্য্য জাতি, দ্বিতীয় দ্রাবিড় জাতি ও তৃতীয় আর্য্য জাতি। যাঁহারা সোণামুখী ও চতুঃপার্শ্বের গ্রাম সকল পরিদর্শন করিয়াছেন তাঁহারা সকলে অনার্য্য সাঁওতালদিগকে, যাহাদের বুনো মানুষ বলে, দ্বিতীয় বাউড়ি ইত্যাদি জাতি ইহারাই দ্রাবিড় জাতি আর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোপ, তাঁতি ইত্যাদি ইহারা আর্য্য জাতি।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে সোণামুখী হইতে কলিকাতা বা আসানশোলের দিকে রেলপথে যাতায়াত করিবার আবশ্যক হইলে ই, আই, আর, এর পানাগড় ষ্টেসন

হইতে যাতায়াত করিতে হইত। পানাগড় হইতে সোণামুখী ১১ মাইলের ব্যবধান। এই ১১ মাইল মধ্যে দামোদর নদ ও শালি নদী বর্ত্তমান। পানাগড় ষ্টেসন হইতে বালিভদ্রপুর অতিক্রম করিয়া শিলামপুরের উপকূলে সোণামুখী যাইবার পারঘাটা অবস্থিত। এই স্থানে রেল কোম্পানির জলের কল ছিল, এখন পানাগড় ষ্টেসনে নলকূপ হইতে জল তোলা হয়। এই পারঘাটার নিকট দামোদরের পরিসর সওয়া মাইল (১। মাইল)। দামোদর নদ পার হইয়া ডিহি-পাড়া, বয়রামপুর বন্দিরামপুর, রাঙ্গামাটী, সলাপুর, গোপীকণ্ঠপুর, নাচনহাঁটী, বুধনাহাটা, পাত্রহাটী, গোলটোরী, মহেশপুর ইত্যাদি ছোট ছোট গ্রামগুলি অতিক্রম করিয়া শালি নদী পার হইতে হয়। শালি নদীর তীর হইতে ঠাকুরের বাড়ী মনোহরতলার মধ্যে দিয়া এক মাইল মাত্র। শালি নদীর পরিসর এই পারঘাটার নিকট ৪৫ গজ বা ৯০ হাত মাত্র। দামোদর নদ বা শালি নদীতে বার মাসই এক হাঁটুর অধিক জল থাকে না, হাঁটিয়া বা গো-যানে পার হওয়া যায়, কেবল বাণ ডাকিলে অর্থাৎ আকাশের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের সময় নৌকা যোগে পার হইতে হয়।

ঠাকুর পানাগড় হইতে সোণামুখী যাইবার সময় দামোদর পর্য্যন্ত গো-যানে যাইতেন—দমোদর নদ পদব্রজে পার হইতেন। আরোহী সহিত বলদদিগের বালির রাশি অতিক্রম করিতে কষ্ট হয়। যেখানে জল থাকে তথায় এত কষ্ট অনুভব করে না। ঠাকুর বলদদিগের এই কষ্ট দেখিতে পারিতেন না, তাই তিনি পদব্রজে দামোদর পার হইতেন। ভাগবত ঠাকুরের সহিত ১৫।১৬ বার পানাগড় হইতে সোণামুখী বা সোণামুখী হইতে পানাগড় গিয়াছিলেন। একবার ভাগবত ঠাকুরের সহিত সুধীরঞ্জন শেঠের বাড়ী হুগলি হইতে পানাগড় ষ্টেসনে প্রাতঃ-কালে ৩টার সময় আসিয়া পৌঁছান। ঠাকুরের সঙ্গে সুধীরঞ্জন, বিপিন গোস্বামী, আমনানের হরিদাস নিয়োগী ও হুগলীর কালীপদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে তিন খানা গো-যান ঠিক করিয়া ঠাকুর সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত পানাগড় হইতে সোণামুখীর দিকে রওনা হইলেন। দামোদরের নিকট আসিয়া ঠাকুর গো-যান হইতে নামিলেন, পদব্রজে দামোদরের বালি অতিক্রম করিতে লাগিলেন। দামোদরের শেষ জল-প্রবাহ পার হইয়া তীরে উঠিবার পূর্ব্বে পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। ভাগবতকে কিছুদূরে আসিতে দেখিলেন, ঠাকুর 'ভাগবত' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ভাগবত ঠাকুরের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলে ঠাকুর ভাগবতকে বলিলেন "তোর মুখ খানা ভার ভার

দেখ্‌ছি”। ভাগবত বিরক্তির সহিত বলিয়াছিলেন “এই এক মাইল বালির উপর দিয়া আসিতে কি সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়ার আনন্দ হয়?” ঠাকুর বলিলেন “তুই কেন গাড়িতে উঠ্‌লি না।” ভাগবত বলিলেন “এই কথাটা এখন না বলিয়া পূর্ব্বে বলিলেই ত হতো”। ঠাকুর চুপ করিয়া রহিলেন। ভাগবত নিকটে দাঁড়াইলে ঠাকুর অঙ্গুলি দ্বারা পশ্চিম দিকের পরপারের দূরস্থিত জঙ্গল দেখাইয়া বলিলেন, “ঐ জঙ্গলের পার্শ্বের স্থানকে সঙ্গত গোলা বলে। ঐ স্থানে মল্লভূমের মহারাজ চৈতন্য সিং এর সহিত পলাসী যুদ্ধের এক বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) মহারাজার জ্ঞাতি ভ্রাতা দামোদর সিং এর সহিত যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মহারাজ চৈতন্য সিং জয়লাভ করেন কিন্তু জয়লাভ করিয়াও তাঁর বুদ্ধির দোষে ও বাহ্যিক বৈষ্ণব আচরণ দেখাইতে গিয়া মল্লরাজত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। মহারাজ গোপাল সিং এর ন্যায় মহারাজ চৈতন্য সিং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। চৈতন্য সিং রাজকার্য্য অপরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিজে পূজা ইত্যাদিতে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। ছত্রপতি কমল বিশ্বাস মহারাজার প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। কমল বিশ্বাস সঙ্গতগোলার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজা দামোদর সিংকে বন্দী করিয়া মহারাজ চৈতন্য সিং এর নিকটে আনেন। ছত্রপতি কমল বিশ্বাস দামোদর সিং এর শিরশ্ছেদের হুকুম প্রার্থনা করেন কিন্তু মহারাজা ইহাতে সম্মত হন নাই। রাজা দামোদর সিং, মহারাজ গোপাল সিং এর পৌত্র ও বিষ্ণুপুরের রাজাদের একজন সামন্ত রাজা ছিলেন, তিনি জামকুন্দির রাজা ছিলেন। এই স্থানে অদ্যাপি তাঁর বংশধরগণের জমিদারি আছে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া মহারাজা হুকুম দেন, জামকুন্দির রাজ্য বাজেয়াপ্ত কর ও ইহাকে ভিখারীর বেশে ছাড়িয়া দাও। মহারাজার এই হুকুম শুনিয়া কমল বিশ্বাস বলেন, ইহাকে সারাজীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখুন নচেৎ আপনার রাজত্বের আশঙ্কা আছে। ইহার উত্তরে মহারাজা বলেন, যদি মদন মোহনের ইচ্ছা হয় তাহাই হউক। কমল বিশ্বাস যাহা অনুমান করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছিল। ১৭৫৮ খ্রীঃ দামোদর কাঙ্গালের বেশে ইংরাজ-দিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নূতন নবাব মিরজাফরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন ও নানা কৌশলে অর্থ না দিয়া প্রভূত সৈন্যের সাহায্য পাইলেন। মল্লভূমের জঙ্গলের মধ্য দিয়া রাত্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বিষ্ণুপুর রাজধানী অবরোধ করেন। তখন কমল বিশ্বাসের কথা মহারাজার স্মরণ হইল, মহারাজা তাঁর ইষ্ট দেবতা মদনমোহনকে ও কিছু অর্থ লইয়া রাজপ্রাসাদ হইতে পলায়ন করিলেন।

এই সময় হইতে মল্লরাজত্বের অবসান হইয়াছিল। ভ্রান্ত বৈষ্ণব ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া চৈতন্য সিং, ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বের রাজত্বের ধ্বংস করিয়াছিলেন। বিষয় রক্ষা করিতে হইলে বৈষ্ণব হউন আর যিনি হউন বিষয় রক্ষার সকল প্রকারের কার্য্যই করিতে হইবে, তাহা না করিলে মূর্খের কার্য্য হইবে। বিষয় রক্ষার জন্য মামলা, মোকদ্দমা, বিষয় দখল ইত্যাদি সকল কার্য্য করিতে হইবে, কৃষ্ণ ইচ্ছা বলিয়া যাঁহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন তাঁহারা বৈষ্ণবতত্ত্ব কিছুই বুঝেন না। বিষ্ণুপুরের রাজাদের রাজত্ব নাই বলিয়া আমি দুঃখ করি না কারণ তাঁহাদিগের রাজত্বের অবসানে মঙ্গলই সাধিত হইয়াছে। আজ ইংরাজরা আমাদের দেশে না আসিলে কে সতীদাহ বন্ধ করিত? ভারতবর্ষ বলিয়া নহে ইজিপ্ট, গ্রীস, চীন, রুসিয়া, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে এ কুপ্রথা ছিল কিন্তু ঐ সকল দেশে পূর্ব্ব হইতেই বন্ধ হইয়াছিল। গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক রাজা রামমোহন রায় ইত্যাদি ব্যক্তির সাহায্যে ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮২৯ খ্রীঃ আইন করিয়া সতীদাহ প্রথা রহিত করিয়া দেন। স্ত্রীবিয়োগ হইলে তার স্বামী যত বয়স হউক না কেন, একের পর অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু স্ত্রীর স্বামীর বিয়োগ হইলে সে সারা জীবন বিধবা হইয়া থাকিবে, বিবাহ করিতে পারিবে না—এই সকল যুক্তি শাস্ত্র দ্বারা পণ্ডিতগণ দেখাইয়া থাকেন। এই সকল শাস্ত্র পুড়াইয়া ফেলা উচিত; সমাজের উচিত, যে পুরুষ স্ত্রী বিয়োগের পর বিবাহ করিতে চান তাঁহাকে কুমারী বিবাহ করিতে না দিয়া, বিধবা বিবাহ করিতে বাধ্য করা। মানবের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করা নিষ্ঠুরতা ইহা অনেকেই বুঝিয়া থাকেন ও আমরাও বুঝিতে পারি; কিন্তু বাপ পিতামহ যাহা করিয়া গিয়াছেন, সমাজ যাহা করিতেছে তাহার স্রোতে আমরা গা ভাসাইয়া দিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণই স্ত্রী মূর্ত্তি ও পুরুষ মূর্ত্তি ধরিয়া থাকেন। মূল্য দিয়া কোন দ্রব্য কিনিলে অর্থের পরিবর্ত্তে ক্রীতদ্রব্য আমরা গৃহে আনিয়া থাকি কিন্তু কন্যার পিতা মূল্য দিয়া কন্যাকে অন্য পুরুষের বিলাসের জন্য বিক্রয় করিয়া থাকেন। এই পণ প্রথা অল্প বিস্তর সকল দেশেই আছে কিন্তু বঙ্গদেশের মত পণ প্রথা কুত্রাপি নাই। আমরা এতই স্বার্থপর ও নিজ নিজ স্বার্থে এরূপ অন্ধ হইয়াছি যে অন্যের দুঃখ কষ্ট প্রাণের ভিতর স্থান দিতে চাহি না। এসব ওলট পালট হইয়া যাইবে, এক হাজার, দুই হাজার বৎসর পরে পৃথিবীতে বিবাহ বলিয়া কোন প্রকারের অনুষ্ঠান থাকিবে না, যেমন জীব জন্তুর ভিতর আছে।

মানব সমাজ হইতে বিবাহ প্রথা উঠিয়া গেলে তখনকার দিনে ইহাই হইবে উচ্চতরের সভ্যতা"।

উপরোক্ত বিবরণ শুনিয়া ভাগবত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন পুস্তকে পড়িয়াছি যে, ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে মারহাট্টাদিগের সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বিষ্ণুপুর রাজধানী অবরোধ করেন, তিন মাস যাবৎ মারহাট্টাদিগকে হটাইতে না পারিয়া মহারাজ গোপাল সিং হুকুম দেন "সকলে অস্ত্রাদি ফেলিয়া দিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে থাক। এইরূপভাবে মদনমোহনের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, মদনমোহন আমাদিগকে নিশ্চয় রক্ষা করিবেন"—। সকলে অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া দিয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতে থাকিলে, মদনমোহন সন্তুষ্ট হইয়া গড়ের উপর গিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দাল-মার্দ্দন (দল-মাদল) কামান দাগিতে থাকেন ইহাতে মারহাট্টা সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করেন (এই কামানটী বিষ্ণুপুরের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের বাটীর দক্ষিণ দিকে আছে)—ইহা কি সত্য ঘটনা ?

মদনমোহন মারাট্টাদিগকে যে ভাবে তাড়াইয়াছিলেন পুস্তকে যেরূপ বর্ণনা আছে নিম্নে দেওয়া হইল। এইরূপ বর্ণনা বিষ্ণুপুরের সকল লোকে অদ্যাপি করিয়া থাকেন

"ভাস্কর নামে বর্গি গড় করি আক্রমণ।
মনে কৈল লুঠিব এই গুপ্ত বৃন্দাবন ॥
মুর্শিদাবাদ ঢাকা লুঠে এলো বিষ্ণুপুরে।
দেবখাত গড়ে প্রবেশিতে নাহি পারে ॥
আসি বেলা দ্বি-প্রহরে মুণ্ডমালার ঘাটে।
কামান সাজান দেখি পড়িল সঙ্কটে ॥
কিন্তু গোলন্দাজ কেহ নাহি ছিল তথা।
দেখে, বলে লুঠব গড় আর যায় কোথা ॥
খানা পার হইতে সবে হইল যত্নবান।
সেই ঘাটের গোলন্দাজ পাইল সন্ধান ॥
দেখে প্রায় বর্গি খানা পারে উঠে এল।
দ্রুতবেগে অগ্নি লয়ে কামানেতে দিল ॥
দুচারি কামান দাগে মুর্চ্চার উপরে।
উপরে যায় গোলা কিছু করিতে না পারে ॥

ইহা দেখি গোলন্দাজ গমন করিল।
দক্ষিণ ভদ্রে মহারাজায় সব নিবেদিল ॥
বলে মল্ল মহারাজ বসে করেন কি।
গড়ে বর্গি প্রবেশিল বল্‌তে এসেছি ॥
রাজা বলে শুন বাছা বলিরে বচন।
উপায় কি আর আছে, আছেন মদনমোহন ॥
সত্বরে ঘোষণা দাও প্রতি ঘরে ঘরে।
হরিনাম সংকীর্ত্তন করুক উচ্চৈঃস্বরে ॥
হস্ত হইতে অস্ত্র রাজা দূরে নিক্ষেপিল।
"হরি হরি বল" ব'লে নাচিতে লাগিল ॥
বাইস হাজার সেনা অস্ত্র ত্যাগ করি।
উচ্চরোলে বলিতে লাগিল হরি হরি ॥
মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে করে হরিধ্বনি।
বলে, রাখ ওহে দয়াময় গুণমণি ॥
ভকত বৎসল প্রভু জানিল অন্তরে।
রাজা, প্রজা দিলে ভার বর্গি তাড়াবারে ॥
দেখিতে দেখিতে অমনি ধূলি উড়াইয়া।
ঘোড়া এক দৌড়ে যায় বড়বাজার দিয়া ॥

*　　*　　*　　*　　*

নিজ গড় রাখলে নিজে মদনমোহন ॥
অপার মহিমা তব কে বুঝিতে পারে।
চতুর্ম্মুখ অসমর্থ যাহা বর্ণিবারে ॥

ঠাকুর ভাগবতের কথা শুনিয়া বলিলেন "তুমি এই বর্ণনা মিথ্যা বলিয়া বুঝিয়াছ? আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন?

ভাগবত বলিল "কামান দাগা হইয়াছিল ইহা সত্য—কামানের গোলায় ভাস্কর পণ্ডিতের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল ও সোণামুখীর মধ্য দিয়া অত্যাচার ও লুট পাঠ করিতে করিতে কাটোয়ার দিকে পলায়ন করেন। এই কামান দাগিল কে?"

ঠাকুর বলিলেন "ছত্রপতি কমল বিশ্বাসের পূর্ব্বে যুগল বিশ্বাস প্রধান সেনাপতি ছিলেন তাঁহার সময়ে ভাস্কর পণ্ডিত বিষ্ণুপুর অবরোধ করেন। সেনাপতি যুগল

বিশ্বাস মহারাজাকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা প্রকারের হুকুম প্রচার করিতে দেখিয়া সেনাপতি যুগল বিশ্বাস মহারাজাকে বদ্ধ পাগল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন যুগল বিশ্বাস মহারাজার সহিত মদনমোহনের মন্দিরে হরিসংকীর্ত্তন করিতে গেলেন কিন্তু গোপনে সৈন্যগণকে গড়ের উপর হইতে কামান দাগিতে আদেশ করিয়াছিলেন ইহাদিগের গোলায় অস্থির হইয়া ভাস্কর পণ্ডিত পলায়ন করেন। বিষ্ণুপুরের মত লক্ষ লক্ষ রাজ্য থাকিলে বা যাইলে মদনমোহনের কি ? চৈতন্য-চরিতামৃত তোর পড়া থাকিলে এ প্রশ্ন করতিস্ না। মহাপ্রভু বৃন্দাবনে আছেন, সেই সময় কালিদহের জলে কৃষ্ণ প্রকট হইয়াছেন এইরূপ জনরব উঠে, মহাপ্রভুর এক সেবক কালিদহে কৃষ্ণ দর্শন করিতে যাইবার আজ্ঞা চাহেন, প্রভু তাকে চাপড় মারিয়া বলেন "কৃষ্ণ কেন দরশন দিবেন কলিকালে ?" মদন-মোহনের আর কাজ ছিল না তাই তিনি কামান দাগিয়াছিলেন! কত লোকে বলে, তাঁরা নিত্য তাঁদের ইষ্ট দেবদেবীকে দেখিতেছেন, এরূপ দেখা সত্বেও তাঁরা যেমন মলিনতাপূর্ণ ও স্বার্থপর ছিলেন তখনও তেমনি আছেন, যেমন কামনা, বাসনা, যশের দাসরূপে তাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার রূপান্তর ঘটে নাই। সুতরাং তাহাদের এই দেবদেবী দেখারও কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু তাহাদের এই ভ্রম থাকিলেও ভেদ-বুদ্ধি দেখাইয়া তাঁহাদিগের প্রাণে আঘাত করা কাহারও কর্ত্তব্য নয়।

"যদি হয় তাঁর যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়।"
"বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইল।
যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিল॥
একদিন মথুরার লোক প্রাতঃকালে।
বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি কোলাহলে॥
প্রভু দেখি করে লোক চরণ বন্দন।
প্রভু কহে "কাঁহা হৈতে কৈলে আগমন"॥
লোক কহে "কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে।
কালিয় শিরে নৃত্য করে ফণিরত্ন জ্বলে॥
সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক সংশয়।
শুনি হাসি কহে প্রভু "সব সত্য হয়"॥

এই মত তিন রাত্রি লোকের গমন।
সবে আসি কহে কৃষ্ণ পাইনু দরশন॥
প্রভু আগে কহে লোক শ্রীকৃষ্ণ দেখিলা।
সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইলা।
মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণ দরশন।
নিজ জ্ঞানে সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্য ভ্রম॥
ভট্টাচার্য্য কহে তবে প্রভুর চরণে।
"আজ্ঞা দেহ যাই করি কৃষ্ণ দরশনে"
তবে তাঁরে কহে প্রভু চাপড় মারিয়া।
"মূর্খ বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া॥
কৃষ্ণ কেন দরশন দিবেন কলিকালে?
নিজ ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে॥
বাতুল না হইও. ঘরে রহত বসিয়া।
কৃষ্ণ দরশন করিহ কালি রাত্রে যাঞা॥
প্রাতঃকালে ভব্য লোক প্রভু স্থানে আইলা।
কৃষ্ণ দেখি আইলা প্রভু তাঁহারে পুছিলা॥
লোক কহে রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালিদহে মৎস্য মারে দেউটি জ্বালিয়া।
দূর হইতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম।
কালিয় শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন॥
নৌকাতে কালিয় জ্ঞান দীপে রত্নজ্ঞানে।
জালিয়াকে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে॥

উপরোক্ত পাগল বাবা ও মহাপ্রভুর কথা ভাবিবার ও চিন্তা করিবার বিষয়। ইহা স্ব স্ব ভাবিবার বিষয় অন্যের ব্যাখ্যায় ইহার তত্ত্ব বুঝা দুরূহ। এইরূপ ঘটনা ৫০০ বৎসরের পূর্ব্বেও ঘটিয়াছে ও এখনও ঘটিতেছে। ইহার শত শত প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়া পুস্তকে আছে। আমরা পাগলের ন্যায় এই সকল ভ্রমপূর্ণ অসত্যের পাছে পাছে সত্য জ্ঞানে দৌড়িতেছি. এই দৌড়ানর বিরাম নাই। অন্তরের প্রভু বিবেকরূপে বলিতেছেন—"ও পথে যেও না ফিরে এস" বলিয়া ডাকিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কথা শুনিতেছি না। কিন্তু এই অসত্যকে সত্যজ্ঞান করার ভিতর একটী অতি সত্য বস্তু নিহিত আছে—সেইটী হইতেছে

সত্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিয়া বাহির করা। প্রভু কৃপা করিয়া একদিন না একদিন আমাদিগের মুখ তাঁর দিকে ফিরাইয়া দিবেন। বড়ই দুর্লভ ও বহু ভাগ্যের ফলে প্রভুর দর্শন মিলিলে জীবের কি অবস্থা হয় তাহা শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বকর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

অর্থাৎ তাঁহাকে একবার দেখিলে একটি সম্পূর্ণ নূতন জীবনের সূত্রপাত হয়, সংশয়ের লেশমাত্র থাকে না, প্রাক্তন কর্ম্মগুলি সব খসিয়া যায়।

সোণামুখীর 'প্রাচীন কথা' পরিচ্ছেদ শেষ করিবার পূর্ব্বে সমগ্র মল্লভূমে ধর্ম্ম প্রচার, বিদ্যাশিক্ষা ইত্যাদি নানা বিষয়ে কত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল, এই বিষয়ে হলওয়েল সাহেব যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে দিলাম। নবাব সিরাজদৌল্লা ১৩৬ জন ইংরাজকে একটী অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৪৬ জনের মধ্যে ১২৩ জন প্রাণত্যাগ করেন। ২৩ জন ইংরাজ মাত্র জীবিত থাকেন—এই ২৩ জনের মধ্যে হলওয়েল সাহেব (Mr. Holwell) একজন। কলিকাতার গভর্ণর ড্রেক সাহেবের পর হলওয়েল সাহেব কলিকাতার গভর্ণর হন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একখানি পুস্তক লেখেন তাহার নাম "Interesting Historical Events."

Mr. Holwell, who was Governor of Calcutta, speaks of Bishnupur in his "Interesting Historical Events," which was printed in 1765 :—

To the west of Burdwan, something northerly lie the lands belonging to the family of Raja Gopal Singh, of the Rajpoot Bramin tribe ; they possess an extent of sixteen days travel, this district produces an annual revenue of between thirty and forty lac ; but from the happiness of his situation he is perhaps the most independant Raja of Indostan, having it always in his power to overflow his country, and drown any enemy that comes against him ; as happened at the beginning of Sujah Khan's Government, who sent a strong body of horse to reduce him, these he suffered to advance far into his

country, then opening the dams of the rivers destroyed them to a man; this action deterred any subsequent attempts to reduce him, but if the frontiers of the district were so invested, as to prevent the exit of the merchandize of his country, which might easily be done he would be presently brought to obedience. and glad to compound for a tribute of twenty lac per annum; as it is, he can hardly be said to acknowledge any allegiance to the Mogul or Subah, he some years deigns to send to the Subah an acknowledgment by way of salaamy (or present) of Rs. 15,000, sometimes Rs. 20,000 and some years not anything at all, as he happens to be disposed

But in truth, it would be almost cruelty to molest these happy people, for in this district, are only vestings of the beauty, purity, regularity, equity and strictness of the ancient Indostan Government. Here the property as well as the liberty of the people inviolate, here no robberies are heard of, either private or public; the traveller either with or without merchandise, on his entering this district, becomes the immediate care of Government, which allots him guards without any expense to conduct him from stage to stage, and these are accountable for the safety and accommodation of his person and effects. At the end of the first stage he is delivered over with certain benevolent formalities to the guards of the next, who after interrogating the traveller, as to the usage he had received in his journey, dismisses the first guard with a written certificate of their behaviour and a receipt

for the traveller and his effects which certificate and receipt are returnable to the commanding officer of the first stage, who registers the same, and regularly reports it to the Rajah.

In this form the traveller is passed through the country, and if he only passes, he is not suffered to be at any expense for food, accommodation or carriage for his merchandize or baggage ; but it is otherwise, if he is permitted to make any residence in one place above three days, unless occasioned by sickness or any unavoidable accident. If anything is lost in this district, for instance a bag of money or other valuable, the person who finds it hangs it upon the next tree, and gives notice to the nearest chowkey or place of guard, the officer of which orders immediate publication of the same by beat of tomtom or drum.

There are in this precinct, no less than three hundred and sixty considerable Pagodas, or place of public worship, erected by the Rajah, and his ancestors. The worship of the cow is here carried to so great an extreme, that, if that animal meets with a violent death, the city or village to which it belonged, go to a general mourning and fast, for three days and are obliged from the Rajah to the meanest of the people, to remain in the spot, where they first heard the publication of the accident ; and are employed during that space in performing various expiations, as directed in the Shastra ; but more of this under a subsequent general head.

Bissnupore the capital, and chief residence of the Rajah, and which gives a name to the whole

district is also the chief seat of trade ; and produce of the country of Sal timbers (a wood equal in equality to the best of oak) dammer laccas, an inferior sortment of raw silk, and coposs, and grain sufficient only for their consumption ; it is from this district that the East India Companies are chiefly supplied with the article of shell lacca.— pages 197—200, Part I.

সোণামুখীতে সিদ্ধ মনোহর দাস বাবাজীর সমাজ বাড়ী আছে। দীনমণি চন্দ্রোদয় গ্রন্থপ্রণেতা মনোহর দাসের সমাজ বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য বিষ্ণুপুরের রাজারা জমি, অর্থ ইত্যাদি সাহায্য করেন। প্রতি বৎসর শ্রীরামনবমীর দিন হইতে তিন দিন ব্যাপী মহোৎসব হইয়া থাকে। উৎসবের সময় সোণামুখী একটী আনন্দের ধাম হয়। সমগ্র সোণামুখী ও তৎপার্শ্বস্থিত গ্রামগুলিতে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। বহুদূর হইতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ সমবেত হইয়া থাকেন। বহুদূর হইতে পসারিরা নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভার আনিয়া দোকান খুলিয়া থাকেন। এই সমাজ বাড়ী সোণামুখীর যে পাড়া বা মহল্লায় অবস্থিত তাহার নাম মনোহরতলা। সোণামুখী নগরটী ২৪টী পাড়ায় বিভক্ত যথা (১) গোবিন্দ বাজার (২) আশমৎ বাজার (৩) রাণীর বাজার (৪) রতনগঞ্জ (৫) নিমতলা (৬) মনোহরতলা (৭) বুড়া শিবতলা (৮) হাটতলা (৯) চক্রবর্ত্তী পাড়া (১০) ব্রাহ্মণ-পাড়া (১১) বাড়ুয্যে পাড়া (১২) চাটুয্যে পাড়া (১৩) গোস্বামী পাড়া (১৪) সিদ্ধান্ত পাড়া (১৫) চৌধুরী পাড়া (১৬) কিৎপাড়া (১৭) সিদ্ধেশ্বরীতলা (১৮) সত্যপীরতলা (১৯) বারুইপাড়া (২০) দৈবকপাড়া (২১) কৃষ্ণ বাজার (২২) শ্যামবাজার (২৩) দেওয়ানবাজার ও (২৪) লাল বাজার।

শ্রীরামনবমীর উৎসবের সময় এত লোক সমাগম হইয়া থাকে যে মনোহর তলায় যাতায়াত করা সহজ কার্য্য হয় না। যে সকল লোক এই উৎসবে আসিয়া থাকেন সকলেই তাহাদের অবস্থা অনুসারে সমাজ বাড়ীতে পূজা দিয়া থাকেন। হরনাথ বাল্যকাল হইতে সিদ্ধ মনোহর দাস বাবাজীকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। তিনি কি চক্ষে বাবাজী মহাশয়কে ভক্তি করিতেন বলিতে পারি না। তবে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে মনোহর দাস মানবের সকল প্রকারের দুঃখ দূর করিতে পারেন। [illegible] কৃপায় এখনও কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয়।

বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর হুগলি জেলার অন্তর্গত বাদানগঞ্জেও ৺মনোহর দাসের আর একটী সমাজ বাড়ী করিয়া দিয়াছেন। ৺মনোহর দাস বাবাজী ১৮ই চৈত্র ১০০২ বঙ্গাব্দে বা ৩১ মার্চ ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের সহিত বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে ফিরিবার পথে রাজপুতনার জয়পুর নগরে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শ্রীরামনবমীর দিন ৺মনোহর দাসের তিরোধানের তিথিতে যে মেলা হয় তাহার প্রবর্ত্তন রাজা বীর হাম্বীর করিয়াছেন। এই উৎসব এখনও চলিয়া আসিতেছে। শ্রীরামনবমীর সময়, মনোহর দাস বাবাজীর সোণামুখীর সমাজ বাড়ীর মধ্যে যাত্রিগণের জন্য যে পাতকুয়া বা ইন্দারা আছে তাহা যে কারণে হউক জলে পূর্ণ হইয়া থাকে। ভক্তগণ ইহাতে মনোহর দাস বাবাজীর অদ্যাপি অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেখিয়া থাকেন। হরনাথ অনেক সময় মনোহর তলায় আসিয়া মনোহর দাসের সমাজ বাড়ীর দ্বারে মস্তক অবনত বা কখন কখন মস্তক ভূমিতে স্পর্শ করিয়া মনোহর বাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেন। কাহারও অসুখ ইত্যাদি হইলে এই সমাজ বাড়ীতে মনোহর বাবার উদ্দেশ্যে সন্দেশ, বাতাসা ইত্যাদি ভোগ দিতে বলিতেন। হরনাথের কাশ্মীর অবস্থান কালে তার স্ত্রী বেশী সময় সোণামুখীতে থাকিতেন, ইহার প্রধান কারণ, হরনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিবনাথ যতদিন এক অন্নভুক্ত ছিলেন ততদিন তিনি ইচ্ছা করিতেন না যে হরনাথের স্ত্রী কাশ্মীরে গিয়া থাকেন। কাশ্মীর অবস্থান কালে হরনাথ ভক্তগণকে সোণামুখী আসিয়া তাঁর সহধর্ম্মিণীর সংবাদ লইয়া যাইতে বলিতেন—আবার ভক্তগণের মধ্যে কেহ অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হইলে তাহাকে কিছুদিনের জন্য সোণামুখীতে আসিয়া অবস্থান করিতে বলিতেন। আবার তাঁর স্ত্রীকে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ভক্তগণকে লইয়া বাবা মনোহর দাসের সমাজ বাড়ীতে আসিতে বলিতেন।

কাশ্মীর ধর্ম্মার্থ অফিস হইতে ছুটী লইয়া হরনাথ সোণামুখীতে আসিলে ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদি অগ্রাহ্য করিয়া প্রত্যহ হরনাথ একবার ৺মনোহর দাস বাবাজীর সমাজ বাড়ীতে আসিতেন। তাঁহার সোণামুখীতে অবস্থান-কালে মনোহর দাসের পূজা দিতেন। ১৯১২।১৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে হরনাথকে মনোহর তলায় চেষ্টা করিয়া আসিতে দেখি নাই। ঠাকুর হরনাথের সঙ্গে ভাগবত, মনোহর দাস বাবাজীর সমাজ বাড়ীতে গিয়া মনোহর কি প্রকার সাধক ছিলেন জিজ্ঞাসা করে। ভাগবতের কথা শুনিয়া হরনাথ তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন ও ভাগবতকে একটী কদম গাছ দেখাইতে চলিলেন; কিছুদূর গিয়া একটা কদম গাছের তলায়

দাঁড়াইয়া ঐ গাছটী দেখাইয়া বলিলেন—"এই গাছটী যখন দুই তিন বৎসরের ও আমার বয়স ৭।৮ বৎসর সেই সময় একবার শ্রীরামনবমীর দিন একাকী মনোহর বাবার উৎসব দেখিতে বড় রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম। আসিতে আসিতে ভাবিতে থাকি যে কদম ফুল পাইলে বাবা মনোহরকে দিই। এই ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইতেছি। যেমন এই চারা গাছের নিকট আসিয়াছি, দেখি একটী ডালে তিনটী কদম ফুল ফুটিয়া আছে। যে ডালে ফুল তিনটী ফুটিয়াছিল তাহা আমি সহজেই ভাঙ্গিয়া লইলাম। এত ছোট গাছে ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া রাস্তার অনেকেই অবাক হইল। আমি প্রভুর কার্য্য ভাবিয়া আত্মহারা হইয়াছিলাম; কি করিব না করিব সকলই ভুলিয়া গেলাম। যাহারা একত্রিত হইয়াছিল তাহারাই আমাকে লইয়া ফুলগুলি মনোহর বাবাকে নিবেদন করিবার জন্য লইয়া চলিল। ফুল কয়টী আমি মনোহর বাবার সমাজের উপর দিলাম। সকলে উচ্চৈঃস্বরে "মনোহর বাবার জয়" বলিয়া উঠিল। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম; তথায় পড়িয়া গেলাম ও জ্ঞানশূন্য হইলাম। কতক্ষণ যে এভাবে ছিলাম জানি না। যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে তখন দেখি যে বহুলোক বাতাস করিতেছে ও মাথায় জল দিতেছে ও কত লোকে আমার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিতেছে। প্রভু যে কদম ফুল লইয়াছিলেন এ কথা আমি বিশ্বাস করি, আর ভক্ত মনোহর দাসের ভাগ্যের কথা ভাবিয়া অধীর হইয়া পড়ি। আমি এই মহাপুরুষ মনোহর দাসের বিষয় জানি—তাই সকলকে ভক্তি করিতে বলি। যে ভাবেই হউক এরূপ মহাপুরুষদের ভক্তি করিলে তোমাদের পার্থিব মঙ্গল ত হবেই অধিকন্তু পারমার্থিক মঙ্গলও হইবে। হরনাথের ব্যবস্থা অনুসারে এখনও শ্রীরামনবমীর সময় মনোহর দাসের ভোগের জন্য ও সমবেত বৈষ্ণব-মণ্ডলীর সেবার জন্য পূজা ও মিষ্টাদি প্রেরিত হইয়া থাকে।

মনোহর দাস বাবাজীর সহিত 'হরিভক্তিবিলাস' নামক বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থ-প্রণেতা গোপাল ভট্টের যে কথোপকথন হয়, যাহা প্রেমবিলাস পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাতে বুঝা যায় যে মনোহর দাস বাবাজী বিষ্ণুপুর হইতে ১২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন গ্রামে পরম সন্তোষে বাস করিতেন ও তথায় তাঁর সাধন ভজনের কোন বিঘ্ন ঘটিত না। বিষ্ণুপুর হইতে সোণামুখী ইংরাজি মাপে সাড়ে দশ ক্রোশের ব্যবধান—১২ ক্রোশ নহে। আর ইহাতে প্রকাশ পায় যে বৃদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্য, ৬২ বৎসর বয়সে বিষ্ণুপুর সহরের পশ্চিমে গোপালপুর গ্রামনিবাসী রঘুনাথ

চক্রবর্ত্তীর পরমা-সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। যৌবনকালে এই শ্রীনিবাস আচার্য্য যত কঠোরতা করিয়াছিলেন তাহা তাঁর বৃদ্ধ বয়সে ভাসিয়া গিয়াছিল। পাগল হরনাথ বলিতেন, ষড়রিপু লইয়া মানব জন্মগ্রহণ করে এই ষড়রিপুর উচ্ছেদ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়—জ্ঞানী-সাধক ইহাদিগের কোণ-ঠাসা করিয়া রাখিতে পারেন। স্বভাবের বিরুদ্ধে কাজ করিতে গেলে পদে পদে পরাভব অবধারিত। সন্ন্যাস লওয়ার বা আকুমার ব্রহ্মচারীভাবে থাকার তিনি সহজে অনুমোদন করিতেন না। স্ত্রীবিয়োগ হইলে পুনরায় বিবাহ করিতে উপদেশ দিতেন। স্ত্রীবিয়োগের পর বিবাহ-বয়স না থাকিলে কেহ রক্ষিতা স্ত্রীলোক লইয়া ঘর করিলে তাহাকে ঘৃণা করিতেন না, এমন কি ঐ রক্ষিতা স্ত্রীলোকের হাতে তিনি আহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। হরনাথের উদারতা হরনাথেই ছিল, অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। পরম পিতা পরমেশ্বরের উদারতা কেবল হরনাথই দেখাইয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনের গোপাল ভট্ট মনোহর দাসের নিকট এই বিবাহ সংবাদ পাইয়া তিনি বার বার বলিয়াছিলেন যে শ্রীনিবাসের "স্খলৎপাদ" হইল। অকপট বৃদ্ধ শ্রীনিবাস তাঁর ক্ষুধা বুঝিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। গোপাল ভট্ট শ্রীনিবাস আচার্য্যের দীক্ষা-গুরু ছিলেন। বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ গায়ক অধ্যাপক রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী মহাশয় এই শ্রীনিবাস আচার্য্য গোস্বামীর বংশধর।

বিষ্ণুপুর মোর ঘর হয় বার ক্রোশ।
রাজার রাজত্বে বাস করি হইয়া সন্তোষ॥
আচার্য্যের সেবক রাজা বীর হাম্বীর।
ব্যাসাচার্য্য আদি অমাত্য পরম সুধীর॥
সেই গ্রামে আচার্য্য প্রভু বাস করি আছে।
গ্রাম ভূমিবৃত্তি আদি রাজারা দিয়াছে॥
এইত ফাল্গুন মাসে বিবাহ করিল;
অত্যন্ত যোগ্যতা তার যতেক কহিল॥
মৌন হয়ে ভট্ট কিছু না বলিল আর।
"স্খলৎপাদ" "স্খলৎপাদ" কহে বার বার॥

মনোহর দাস বীর হাম্বীরের পিতা রাজা ধারি মাল্লার ইং ১৫৩৯—১৫৮৭ রাজত্বের সময়ে সোণামুখীতে আসিয়া বাস করেন। মনোহর দাস মধ্যে মধ্যে বৃন্দাবনে গিয়া তথায় বাস করিতেন। বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আসিতে হইলে

সকল বৈষ্ণবগণকে সোণামুখীর ভিতর দিয়া যাইতে হইত। এই পথটী অন্যান্য পথ অপেক্ষা নিরাপদ ছিল। যে সকল বৈষ্ণব ভক্তগণ গৌড় হইতে বৃন্দাবনে বা বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে গমনাগমন করিতেন তাঁহাদের নিকট মনোহর দাস বাবাজী পথঘাট ও পথের উপদ্রবের বিষয় অবগত হইতেন। ইংরাজি ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে একদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাইবার সময় পথে কোন প্রকার উপদ্রব ঘটিত না। দেশের এইরূপ উপদ্রব-শূন্য অবস্থা দেখিয়া বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ যথা শ্রীজীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীনিবাস, নরোত্তম, কাশীশ্বর গোস্বামীর শিষ্য গোবিন্দ গোস্বামী, যাদবাচার্য্য গোস্বামী, ভূগর্ভ গোস্বামী, নরহরি, গোপাল ভট্ট, বিশ্বম্ভর দাস, শ্যামানন্দ, চৈতন্য দাস, মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী, শ্রীদাম, লোকনাথ গোস্বামী মানভূমের রাজা নৃসিংহদেব ইত্যাদি সকলে বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচার উদ্দেশ্যে গৌড়ে হস্তলিখিত পুঁথিগুলি পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করেন। পুথির পাণ্ডুলিপিগুলি দুইখানি গোশকটে পূর্ণ করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দের তত্ত্বাবধানে গৌড়ে প্রেরণ করেন। এই সকল পুঁথিগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলি ছিল।

(১) রূপ গোস্বামী বিরচিত—উজ্জ্বল নীলমণি, (২) শ্রীজীব গোস্বামী কৃত গোপালচম্পু (৩) গোবিন্দ দাসের করচা (৪) মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের করচা (৫) কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত—চৈতন্যচরিতামৃত (৬ গদাধর দাস বিরচিত জগৎ মঙ্গল (৭) রূপ গোস্বামী কৃত—পদ্যাবলী (৮) রূপ গোস্বামী বিরচিত—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৯) শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট রচিত—হরিভক্তিবিলাস (১০) রূপ গোস্বামী প্রণীত—মথুরা-মাহাত্ম্য (১১) রূপ গোস্বামী বিরচিত—ললিত-মাধব (১২) জীব গোস্বামী প্রণীত—হরিনামামৃত-ব্যাকরণ (১৩) রূপ গোস্বামী প্রণীত—হরিভক্তি-রসামৃতসিন্ধু (১৪) চৈতন্যচরিত মহাকাব্য কবি কর্ণপূর রচিত। (পরমানন্দ শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। চৈতন্যদেব ইহাকে পুরীদাস নাম দেন।) মহাপ্রভুর তিরোভাবের ৯ বৎসর পরে এই কাব্যের পরিসমাপ্তি হয়।

শিবানন্দ যবে সেই বালক মিলাইলা।
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা॥

(১৫) অলঙ্কার কৌস্তুভ, আর্য্যাশতক, আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু, চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক, গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা—কবি কর্ণপুর রচিত।

৮১ দিন গত হইলে এই পুথি বোঝাই দুইখানি গাড়ি—মল্লভূমে প্রবেশ করে গোযানের সঙ্গে শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ ছিলেন। তাঁহারা বিষ্ণুপুরের

সন্নিকট গোপালপুর গ্রামে পৌছিলে রাত্রি যাপনের জন্য অপেক্ষা করেন। যথা :—

পঞ্চবটী বামে রাখি রঘুনাথপুর।
নিজ দেশ বলি বাড়ে আনন্দ প্রচুর॥
মালিয়াড়া বলি গ্রামে ভৌমিক হয়।
রহিলা স্বচ্ছন্দে তাতে হইয়া নির্ভয়॥
গোপালপুর একগ্রাম অতি মনোহর।
সেইস্থানে রাত্রে বাসে আনন্দ অন্তর॥

এই গোপালপুর গ্রামে রাত্রে তস্করেরা বৃন্দাবন হইতে আনিত দুই গাড়ি বোঝাই পুঁথি চুরি করিয়া লইয়া যায়। শ্রীনিবাস এই হস্ত লেখা পুঁথিগুলির জন্য বিষ্ণুপুরের নানাস্থানে পাগলের মতন ভ্রমণ করিয়া—দেউলি গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তীর নিকট বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর দ্বারা তাঁর দুই গাড়ি পুঁথি লুণ্ঠিত হওয়ার সংবাদ পান। পরে বীর হাম্বীর এই পুঁথিগুলি শ্রীনিবাসকে গৌড়ে পাঠাইবার জন্য ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় বিষ্ণুপুরের রাজাদের বঙ্গদেশের বার ভূঁইয়ার মধ্যে এক জন গণ্য করিয়াছেন।

"Babu Sishir Kumar Ghose (Editor, Amrita Bazar Patrika) writes :—Of the twelve Zeminders who ruled Bengal, one had his capital city in Bishnupur, now in the district of Bancoora. In going there one can see even now traces of extensive fortifications and a huge cannon perhaps the biggest in the world".

কিন্তু রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট মহাশয় বিষ্ণুপুরের রাজাদের বার ভূঁইয়ার মধ্যে গণ্য করেন নাই। এই রাজাদিগকে দস্যু রাজা বলিয়া দীনেশ বাবু তাঁর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক ইতিহাস লেখকগণ বিষ্ণুপুরের রাজাদের বার ভূঁইয়ার মধ্যে গণ্য করেন নাই। বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে প্রেরিত পুঁথি রাজাদের নিযুক্ত ডাকাত শ্রেণীর লোক দ্বারা চুরি কার্য্য জন্যই দস্যু রাজা বলিয়া অনেকেরই ধারণা হইয়াছে। কিন্তু বৃদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্যকে বিবাহ দিয়া বিষ্ণুপুরেই রাখেন। তিনি নিজে শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা লন। যে রাত্রে পুঁথি লুণ্ঠিত হয় তৎপর দিন শ্যামানন্দ, যিনি বৃন্দাবন হইতে গো-শকটের সহিত আসিয়াছিলেন, তিনি বৃন্দাবনে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যান ও এ ঘটনার বিষয় বৃন্দাবনের সকল বৈষ্ণবগণকে সংবাদ দেন। বৃদ্ধ

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় এই সংবাদে বিশেষভাবে কাতর হইয়া পড়েন ; কারণ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতই রচনা করিতে খ্রীষ্টীয় ১৫৭২—৮২ সাল অর্থাৎ ১০ বৎসর লাগিয়াছিল ও ইহার কোন প্রকার নকল রাখেন নাই। তিনি মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ) ৪৯ বৎসর পরে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যচরিতামৃত রচনা আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি, রবিবার খৃঃ ১৫৮২ জুন মাসে ১০ বৎসর পরিশ্রমের পর রচনা শেষ করেন। কেহ কেহ বলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিখ্যাত গ্রন্থ "চৈতন্যচরিতামৃত" বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বারা লুণ্ঠিত হয় নাই। শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে গিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁর পুঁথি নষ্ট হইয়াছে জানিতে পারিয়া পুত্রশোকের অধিক কাতর হইয়া পড়েন ও স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়াতে খ্রীঃ ৫৮৯ সালে ৯৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু মুখে পতিত হন। কেহ কেহ বলেন কবিরাজ মহাশয়ের ১৫৮২ খৃঃ ৮৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। পুঁথিগুলি পাওয়া গেলে মনোহর দাস স্বয়ং বৃন্দাবনে গিয়া সে সংবাদ দেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর পুঁথির সংবাদ পান কিন্তু সে সংবাদেও তাঁর নষ্ট স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। কবিরাজ মহাশয়ের জন্ম খ্রীঃ ১৪৯৬ সাল।

"বিবর্ত্তবিলাস" গ্রন্থের দ্বিতীয় বিলাসে কবি অকিঞ্চন "চৈতন্যচরিতামৃতের" রচনা সম্বন্ধীয় বিবরণ এবং মুকুন্দের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিবার সময় প্রত্যেক অধ্যায় শেষ হইলেই তাহা তাঁহার শিষ্য মুকুন্দকে দেখিতে দিতেন। মুকুন্দ গোপনে তাহা নকল করিয়া নিজের নিকটে রাখিয়া দিতেন। অবশেষে "চরিতামৃত" রচনা সম্পূর্ণ হইলে কৃষ্ণদাস তাহা অনুমোদনের জন্য জীব গোস্বামীকে প্রদান করেন। তিনি এই গ্রন্থ যমুনাতে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু ভাসিতে ভাসিতে ইহা মদনমোহনের মন্দিরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিন দিন পরে জীব গোস্বামী ঐ গ্রন্থ জল হইতে তুলিয়া আনিয়া অন্যান্য গ্রন্থের সহিত এক ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। ইহাতে গ্রন্থ-প্রচারের ব্যাঘাত উপস্থিত হইল দেখিয়া কৃষ্ণদাস মনের দুঃখে মথুরায় এক ব্রাহ্মণের ঘরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। সেখানেও তিনি তিন দিন উপবাসে কাটাইয়া দিলেন। তাঁহার এই মনঃকষ্ট দূরীভূত করিবার জন্য মুকুন্দ নিজে নকল করিয়া যে গ্রন্থ গোপনে রাখিয়াছিলেন তাহা কৃষ্ণদাসকে প্রদান করিলেন। তাহার পর শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র (পরমানন্দ সেন—চৈতন্যদেব ইহাকে পুরীদাস এই নাম দেন ইনিই কবি কর্ণপুর নামে পরিচিত) কবি কর্ণপুরের সহিত কৃষ্ণদাসের মথুরায় বিশ্রাম-ঘাটে সাক্ষাৎ হয়। কর্ণপুরের সহিত তিনি

বৃন্দাবনে আগমন করেন এবং কর্ণপুরের অনুরোধে জীব গোস্বামী গ্রন্থাবলী হইতে "চরিতামৃত" আনিতে আদেশ করেন। তখন সকলে দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, চরিতামৃত সকল গ্রন্থের উপরে রহিয়াছে। সেই গ্রন্থ এখনও ব্রজধামেই আছে। মুকুন্দ যে পুঁথি নকল করিয়াছিলেন, তাহা কৃষ্ণদাস মুকুন্দের সহিত নবদ্বীপে প্রেরণ করেন।

শ্রীনিবাস বৃন্দাবনস্থ গোস্বামিগণের গ্রন্থের সহিত "চরিতামৃত" লইয়া আসিয়াছিলেন. এই কথা অনেক লেখক প্রচার করিয়াছেন। এই ধারণা যে সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন তাহা "বৈষ্ণবদিগদর্শনী" কার স্পষ্টভাবেই বলিয়া দিয়াছেন। শ্রীনিবাসের গৌড়ে আগমনের সময় "চরিতামৃত" রচিত হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে ইহা বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। "বৈষ্ণবদিগদর্শনী"তে বলা হইয়াছে যে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে গিয়া "চরিতামৃত লইয়া আসিয়াছিলেন। কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত গ্রন্থকার এই কথা বলিয়াছেন তাহা আমরা জানি না, কিন্তু "বিবর্ত্তবিলাস" মতে মুকুন্দের বিবরণে এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—মুকুন্দ পশ্চিমের মুলতান গ্রামবাসী এক সদাগরের পুত্র। একদিন রাত্রে বৃন্দাবননাথ গোবিন্দজী মুকুন্দকে বৃন্দাবনে আসিতে স্বপ্নাদেশ করেন, তদনুসারে তিনি পিতার অনুমতি লইয়া তিনখানি নৌকা মাল বোঝাই করিয়া বৃন্দাবনে মদনমোহনের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হ'ন এবং কৃষ্ণদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কৃষ্ণদাসের প্রধান শিষ্য পাঁচ জন ১। গোপাল ক্ষেত্রী ২। বিষ্ণুদাস ৩। রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ৪। গোবিন্দ অধিকারী ৫। মুকুন্দ। মুকুন্দই কনিষ্ঠ শাখা।

বঙ্গীয় মহাকোষ ১৫১ পৃষ্ঠায় এইরূপ আছে ঃ—

"শ্রীযুত মুকুন্দ আজ্ঞায় লিখিলাম আমি" (অমৃতরসাবলী গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৩)

ইহা হইতে দেখা যায় যে, কৃষ্ণদাস গোস্বামীর আজ্ঞায় মুকুন্দ সহজ ধর্ম্মের পুস্তক তাঁহার এক শিষ্য দ্বারা লিখাইয়াছেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে যে কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন লোক ছিলেন, ইহা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বোধ হয় মথুরাদাস তাঁহাদের অন্যতম, এবং এই জন্যই রসতত্ত্বসারে রসিকদাস মথুরাদাসের নামে পূর্ব্বভাগে মুকুন্দের নাম উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

সিদ্ধান্ত—অতএব কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য মুকুন্দ, তাঁহার শিষ্য মথুরাদাস, তাঁহার শিষ্য রসিকদাস, তাঁহার শিষ্য অকিঞ্চন দাস ইত্যাদি ইত্যাদি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে লোকান্তরিত হন।

(বঙ্গীয় মহাকোষ ১৫১ ও ১৫২ পৃষ্ঠা)

কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃতে"র নকল করিবার কথা বিশ্বাস হয় না; ১ম কারণ মুকুন্দ পশ্চিমের (পাঞ্জাবের) মুলতান গ্রামবাসী একজন সদাগরের পুত্র—পাঞ্জাববাসী সদাগর পুত্রের বাংলা ভাষায় কোন জ্ঞান না থাকারই কথা তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া বাংলা ভাষা শিক্ষা করিবার অবসর পাইলেন কেমন করিয়া বিশেষতঃ তখনকার সময়ে বৃন্দাবনে, ইহা বিশেষ সন্দেহের কথা। দ্বিতীয় কারণ মুকুন্দের বাংলা ভাষায় রচিত কোন গ্রন্থ নাই। তৃতীয় কারণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজের আজ্ঞায় মুকুন্দ তাঁর শিষ্য মথুরাদাস দ্বারায় সহজ ধর্ম্ম-পুস্তক লিখাইয়াছিলেন। মুকুন্দের বঙ্গভাষায় জ্ঞান থাকিলে তিনি নিজেই পুস্তক রচনা করিতে পারিতেন। অতএব মুকুন্দ "চরিতামৃতের" নকল রাখিয়া ছিলেন ইহা অবিশ্বাসযোগ্য কল্পনা মাত্র।

জীব গোস্বামী "চৈতন্যচরিতামৃত" যমুনাতে নিক্ষেপ করেন,—এইরূপ উল্লেখ করাতে জীব গোস্বামীর চরিত্রে কালিমা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে গোস্বামী প্রভুকে সাধারণ মানব অপেক্ষা অধম করা হইয়াছে। ইহাতে কোন প্রকারে আস্থা স্থাপন করা যায় না। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের সুখ্যাতি করিতে গিয়া গল্পের রচনাকারী জীব গোস্বামী মহাশয়ের চরিত্রে কালিমা লেপন করিয়াছেন মাত্র।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গ্রন্থজন্য দুঃখে মথুরায় আসিয়া বাস করেন—ইহাতে বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়কে খুব ছোট করা হইয়াছে।

বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণ যে যখন কোন গ্রন্থ রচনা করিতেন ঐ গ্রন্থগুলি জীব গোস্বামীর নিকট গৌড়ে পাঠাইবার জন্য প্রদান করিতেন। জীব গোস্বামী মহাশয় এই সকল গ্রন্থ পাঠাইবার জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। শেষে মথুরা হইতে আগরা পর্য্যন্ত আসিয়া সদাগরের গোশকটে ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ শ্রীনিবাসের তত্ত্বাবধানে গ্রন্থগুলি সম্রাটের আদেশ-পত্র (Pass ticket) সহিত পাঠাইয়া ছিলেন।

সোণামুখীর মনোহর দাস সম্বন্ধে বাঁকুড়া গেজেটিয়ারের ১৭৫।১৭৭ পাতায় এইরূপ লিখিত আছে যে "সোণামুখী সহরে গিরিগোবর্দ্ধন নামে একটী দেবতার মন্দির আছে, এই মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিবার জিনিষ। সোণামুখীতে অনেকগুলি জলাশয় বা সায়ার আছে—সহরের মধ্যস্থলে সর্ব্বাপেক্ষা যে বৃহৎ জলাশয় আছে তাহার নাম "সায়ার"। সোণামুখীতে মনোহর নামে একটী সমাজবাড়ী আছে, বৈষ্ণব ভক্তগণ ইহা দর্শন করিতে আসেন। চৈত্র মাসের শ্রীরামনবমীতে এই স্থানে তিন দিন ব্যাপী একটী মেলা বসিয়া থাকে—নানা স্থান হইতে বৈষ্ণবগণ এই মেলায় একত্রিত হন।

এই সাধু মনোহরদাস সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে। সোণামুখীতে শ্রীরামদাস অধিকারী নামে একজন পরম ধার্ম্মিক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদিন এই ব্রাহ্মণ তাঁর ইষ্টদেবতা শ্যামসুন্দরের পূজা করিতেছেন, সেই সময় একজন যুবতী গোয়ালিনীর রূপে মুগ্ধ হওয়ায় তাহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে—অধিকারী মহাশয় তাঁর নিজের চিত্তদুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া তিনি তাঁর শিশ্ন কর্ত্তন করিয়া ফেলেন ও রক্তস্রাব বন্ধ না হওয়ায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ব্রাহ্মণের একটী ছোট পুত্র ও একটী কন্যা ছিল। এই ঘটনার দুইদিন পরে একজন বৈষ্ণব শ্যামসুন্দরের মন্দিরে আসিয়া বলেন যে শ্রীরামদাস অধিকারী বৃন্দাবন যাইতেছেন পথে তাঁহার সহিত দেখা হইল—তিনি শ্যামসুন্দর ও নাবালক পুত্র কন্যার ভার লইতে বলিয়াছেন। এই বৈষ্ণব আর কেহ নহেন ইনিই মনোহর দাস বাবাজী। মনোহর দাস নাবালক পুত্র কন্যাদের প্রতিপালন করেন ও সময়ে কন্যাটীর একটী ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দেন। শ্রীরামদাস অধিকারীর পুত্র ও বংশধরগণ শ্যামসুন্দর ঠাকুরের ও মনোহর দাস বাবাজীর সমাজবাড়ির সেবায়েৎ হন। মনোহরদাস নানা প্রকারের অলৌকিক কার্য্য করিতেন, দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিতেন। তাঁর তিরোধানের পর তিনি তাঁতিদের দেবতা হন। সেই সময়ে সোণামুখীতে অন্য জাতির বসবাস অপেক্ষা তাঁতিরই বাস বেশী ছিল। মনোহর দাসের শ্রীরামনবমীর উৎসব জন্য ও সমাজবাড়ীর খরচ নির্ব্বাহ জন্য তাঁতিরা তাহাদের উপার্জ্জনের কিছু অংশ ৶বৃত্তি স্বরূপ পৃথক করিয়া রাখিতেন। ইহা ছাড়া বিবাহাদির সময় ও অন্য উৎসবাদিতে সকলে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। মনোহর দাসের সমাজের নিকট তাঁর পায়ের খড়ম রাখা হয়। ভক্তগণ এই খড়ম পূজা করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে কোন দেবীর সোণা দিয়া মোড়া মুখ থাকাতে এই গ্রামের নাম সোণামুখী হইয়াছে। দেবদ্বেষী মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় দেবীর সোণার মুখ অপহরণ করিয়া দেবীকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেন।”

উপরোক্ত বাঁকুড়া গেজেটিয়ারের বিবরণ আংশিক ভাবে সত্য হইলেও ইহা ভ্রমে পূর্ণ। শ্রীরামদাস অধিকারীর রক্তস্রাবে মৃত্যু ঘটে, এ কথা আদৌ সত্য নহে। শ্রীরামদাস অধিকারী তাঁর ইষ্ট দেবতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা পরিত্যাগ করিয়া উদাসী হইয়া কোথায় চলিয়া যান। তাঁর সন্ধান কেহ দিতে পারেন নাই। মনোহর দাস বাবাজী ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ সেই সময় সোণামুখীতে বাস করিয়া সাধন ভজন করিতেন। মনোহর সোণামুখীতে অবস্থান সময়ে “দীনমনি চন্দ্রোদয়”

গ্রন্থ রচনা করেন। মনোহর দাস যেমন পণ্ডিত লোক ছিলেন তেমনি একজন সাধকশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবচুড়ামণি ছিলেন। রামদাস অধিকারীর বাসস্থান মনোহর দাসের আশ্রমের সম্মুখে ছিল। অধিকারী মহাশয় মনোহর ইত্যাদি বৈষ্ণবগণের সহিত সর্ব্বদা ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। মনোহর দাস তাঁর রচিত "দীনমণি চন্দ্রোদয়" গ্রন্থ পাঠ করিয়া অধিকারী মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিতেন। রামদাস অধিকারী মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষায় বিশিষ্ট জ্ঞান ছিল। অধিকারী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া মনোহর দাস ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণকে শুনাইতেন। যে সময় অধিকারী মহাশয় গৃহত্যাগ করেন সে সময় মনোহর দাস বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট গিয়াছিলেন। রামদাস অধিকারীর গৃহত্যাগের সংবাদ পাইয়া মনোহর দাস সোণামুখীতে আসিয়া বিগ্রহ সেবার বন্দবস্ত করিয়াছিলেন ও যথাকালে অধিকারীর কন্যার উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দিয়াছিলেন।

Omalley's Bankura
Gazetteer pages 175—177.

Sonamukhi.

Sonamukhi a town in the Bishnupur sub-division situated 21 miles North of Bishnupur and 11 miles South of Panagar Railway Station. It was constituted a municipality in 1886, the area within municipal limit being 4 square miles. The population according to the census of 1901 was 13448 of whom 13261 were Hindus and 185 were Muhammadans, while there were 2 persons belonging to other religion. The town contains a Sub-Registry Office, Charitable Dispensary and Inspection Bungalow, and is the head quarter of a Police Thana; there is also a High School opened in 1887 in commemoration of the Jubilee of Queen Victoria.

Formerly a large factory of the East India Company was established here, and numbers of weavers were employed in cotton-spinning and cloth

making. One of the earliest notices of Sonamukhi occurs in the records of the Board of Revenue and consists of a complaint made by the Company's Commercial Resident stationed there regarding obstruction to trade by the Raja of Burdwan, upon which an officer was deputed to make an enquiry and the Raja was forbidden to interfere in any way with commercial business of the Company's factories. The introduction of English piece-goods led to the withdrawal of the Company from this trade, for the local products were not able to compete with imported European articles. Formarly also the town contained an indigo factory and a Munsif's Court.

At present silk weaving, pottery making and the manufacture of Shell-lac are the principal industries of the place. The industry last named was till 10 years ago large and prosperous (i.e. in 1890) and there were several lac factories established by the local merchants in Ranchi District, to which artisans were sent from Sonamukhi.

The town contains a temple called Girigobardhan-which is reported to be a fine specimen of architecture and sculpture. There are numerous tanks, the biggest of which in the centre of the town is known simply as the Sayar. There is also a shrine dedicated to a local Saint named Manohar, which is a place of pilgrimage visited by many Vaishnabas. A large gathering of Vaishnavas takes place annually and lasts three days commencing on Sriram Navami day i.e., generally in the month of Chaitra.

"The legend about the Saint is as follows. There was a very devout Brahman named Sriram Das

Adhikari at Sonamukhi. One day when he was worshipping his God Syamsunder, the beauty of a milkmaid caused his thoughts to wander and ashamed of his weakness he cut off his genetals and died. This Brahman left a son and a daughter both of whom were minors. Two days after his death a Vaishnava came to the temple of Syamsunder and stated that he had been sent by the deceased Adhikari who was going to Brindaban, to look after his children and the God Syamsunder. This Vaishnava was Manohar Das. He brought up the children and married the daughter to a Brahman, whose decendants became afterwards priests (sebaits) deified Saint. Manohar performed many miracles, cured incurable diseases and after his death became the deity of the Tantis (weavers) of Sonamukhi, who then formed the bulk of the population of the town. The tantis set apart a small portion of their income for the maintenance of the shrine and for the celebration of annual festival, besides gifts at the marriage of girls and other donations. A pair of wooden sandals are placed over the tomb and are worshipped by the votaries.

"Traditions says that the town owes its name to a goddess Sonamukni (The golden faced). The nose of the image was broken off by the famous Muhammadan iconoclast, Kalapahar,"

ইংরাজি ১৭১২ খ্রীঃ গোপাল সিংহ বিষ্ণুপুরের রাজা হন। তিনি আদেশ করেন যে কেহ শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব, ইহান সকলকে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যার সময় তুলসীর মালা লইয়া অন্তত একবার অর্থাৎ ১০৮ বার রাধাকৃষ্ণের নাম জপ করিতে হইবে এই কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই হুকুম অমান্য করিলে তাহার শিরশ্ছেদ হইবে। এই আদেশে সোণামুখীর মনোহর

দাস বাবাজীর আনন্দের সীমা থাকে নাই। কারণ তাঁহারা ইহার পূর্ব্বেই "জয় রাধে গোবিন্দ" নামে সোণামুখী মুখরিত করিয়াছিলেন। অষ্ট প্রহর, চব্বিশ প্রহর, নবরাত্রি ব্যাপী রাধাগোবিন্দের নাম কীর্ত্তন সোণামুখীতে প্রচার করিয়াছিলেন। রাজার এই হুকুম কেহ অমান্য করিলে গুপ্তচরগণ এই সংবাদ রাজদরবারে পৌঁছিয়া দিত। প্রথম অপরাধে কারারুদ্ধ হইত ও নানা প্রকারের শাস্তি ভোগ করিতে হইত। কৃষক, মজুরগণও ইহা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। এই জন্য "গোপালের ব্যাগার দেওয়া" প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে।

যে সকল বৈষ্ণবগণ প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার সময় পাড়ায় পাড়ায় নাম গান করিত তাহাদিগকে বিষ্ণুপুরের রাজারা নিষ্কর জমি দিতেন। ব্রাহ্মণগণ সকলেই ব্রহ্মোত্তর ভূমি পাইয়াছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ ব্রহ্মোত্তর জমি পান নাই তাহাদিগকে কেহ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন না।

সচরাচর ব্রহ্মোত্তর দানপত্রে এইরূপ বিনীত প্রার্থনা পাওয়া যায় "যদি আমার বংশের অধিকার লুপ্ত করিয়া অন্য কেহ এই রাজ্য লাভ করেন, তবে তাঁহার নিকট আমার এই প্রার্থনা আমি তাঁর দাসানুদাস হইয়া থাকিব, তিনি যেন ব্রহ্মবৃত্তি হরণ না করেন।" কিন্তু সাধারণত নূতন রাজারা এই সকল দানপত্র নাকচ করিয়া দিতেন। মল্লভূমি ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অন্য কোন রাজা এই রাজত্ব জয় করিতে পারেন নাই—ইহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে যায় ও কিয়ৎ অংশ বর্দ্ধমানের রাজা উক্ত কোম্পানির নিলামে ক্রয় করেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বর্দ্ধমান চাক্‌লা (বাঁকুড়া, বীরভুম, মেদিনীপুর ইত্যাদি জেলাগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল) বাঙ্গলার নবাবের নিকট হইতে ইজারা পাইয়া সমস্ত নিষ্কর জমি, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর জমির দানপত্র অস্বীকার করেন। ইহাতে সকল লোকেই হাহাকার করিতে থাকে ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট আবেদন পত্র পাঠান। এই আবেদনের ফলে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সদাশয় ডসন সাহেব (Mr Dawson) এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার জন্য নিযুক্ত হন। ডসন সাহেবের অনুসন্ধানের ফলে বাজেয়াপ্ত নিষ্কর জমির অধিকাংশই ফেরৎ দেওয়া হয়। এই ছাড়কে অদ্যাবধি সাধারণে "দশ আনি ছাড়" বলিয়া থাকে। "ডসন সাহেবের ছাড়" কে "দশ আনি ছাড়" বলিয়া থাকে।

১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবন হইতে আনীত একটী গান নিম্নে দিলাম। এইরূপ গান বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুপুর, সোণামুখী ইত্যাদি স্থানের পাড়ায় পাড়ায় সকাল সন্ধ্যায় গাহিয়া বেড়াইতেন।

আরে ও একবার ভজ মন গোবিন্দ হরে
হরে—হরে—হরে
প্রভু নিত্যানন্দ চৈতন্য হরে ॥
ভজ গোবিন্দে পরমানন্দে
কহ গোবিন্দে রামাজী।
রাম কৃষ্ণ গোপাল দামোদর
হরে মাধব মধুসূদনজী ॥ আরে ও……

রাধা মাধব মদন গোপাল
অম্বুজ লোচন বেণুরসাল।
ময়ূর মুকুটোপরি জয়ন্তি মালা
কর পর মুরলী ধারী জী ॥ আরে ও……

নন্দকী নন্দন গোবিন্দে
যশোদা নন্দন গোবিন্দে
রাসবিলাসক গোবিন্দে
বৃন্দাবন বাসী গোবিন্দে ॥ আরে ও……

জয় জগবন্ধু করুণা সিন্ধু
অসুর দলন মুরারী জী।
শেষ মহেশ্বর নৃপ আদি নারদ
কেও তব অন্ত না পাওয়ে জী ॥ আরে ও……

রাজিত পিত বসন বন মোহন
যশোদাকো সাধ পুরাওয়ে জী।
নিরওরাস মহারস মেশন
গুণগাওয়ে ব্রজ বালা জী ॥ আরে ও……

তার ব্রহ্ম পুরুষোত্তম মাধব
জিনিকে ভকত সুদামা জী।
যমুনা এটমে ধেনু চরাওয়ে
সঙ্গে লয়ে ব্রজ বালা জী ॥ আরে ও……
গোয়ালিনী কিসে লীলা কিয়ে
শ্রীগোপাল কানাইয়া জী ॥

বৃন্দাবনমে রাস রচাওয়ে
সঙ্গে লয়ে ব্রজ নারী জী॥ আরে ও······
ললিতা বিশাখা অভির চন্দ্রাবলি
রাধা রূপ মন প্যারী জী।
জিনি রাধা জোরে জী॥ আরে ও······
পঁহুছে পাতাল কালীনাগ মাথে
ফণীপর নৃত্য করাওয়ে জী।
গজেন্দ্র তার দুঃশাসন মার
দ্রৌপদীকো চীর বাড়াওয়ে জী॥ আরে ও······
শ্রীধর কৃষ্ণ রাঘব বিষ্ণু
লচমন নায়ক সিংহ জী।
পুরী অযোধ্যা সরযূকে তীরে
সীতা শ্রীরঘু বীরোজী॥ আরে ও······
ভজ মন গোবিন্দ কহ মন রাম
গঙ্গা তুলসী শালগ্রাম॥ আরে ও······

(শ্রীভোলানাথ দাস, গায়ক, রঘুনাথ সায়র)

উপরোক্ত রূপ বৈষ্ণব ভাবের বন্যা মল্লভূমে ইংরাজি ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজি ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল। সোণামুখীতে মনোহর দাস বাবাজীর শিষ্যগণ বিনা বাধাতে তাঁদের সাধন ভজন করিতেছিলেন কিন্তু হঠাৎ ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে মারাট্টা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের বিষ্ণুপুরে আগমন ও বিষ্ণুপুর দুর্গ অবরোধ করার জন্য অর্থাৎ উপস্থিত বিষ্ণুপুরে যে স্থানে সব ডিবিসানাল কোর্ট (Sub-divisional Court) হয় তাহাকে মারাট্টাডাঙ্গা বলে, এই স্থানে তাহারা আসিয়া প্রভূত অশ্বারোহী সৈন্য আনয়ন করিয়া ছাউনি করিয়া অবস্থান করে। মধ্যে মধ্যে তাহারা চলিয়া গেলেও পুনরায় আসিয়া উপদ্রব করিত, এইরূপভাবে ২৫ বৎসর যাবত উপদ্রব করিয়াছিল। এই সকল সৈন্যর ও অশ্বের রসদের জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের উপর অমানুষিক অত্যাচার, লুট, তরাজ, গৃহাদিতে অগ্নি প্রয়োগ করিত। এই সকল অশ্বারোহী সৈন্য দিবাভাগে বা রাত্রিতে দূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহে প্রবেশ করিয়া প্রায় প্রত্যহই ব্যতিব্যস্ত করিত। বালক, বালিকা, রমণীগণের উপরও ইহারা অত্যাচার করিতে ছাড়িত না। এই অত্যাচারে পীড়িত হইয়া সোণামুখীর গ্রামবাসীরা অনেকেই মানকর ইত্যাদি

স্থানে গিয়া বাস করেন। যে সোণামুখী গ্রামে ৬।৭ হাজার তাঁতীর বাস ছিল তাহারা সমূলে লোপ পায় ও ব্রাহ্মণ ইত্যাদি অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা শালিনদীর অপর পারে, ঝাঝডোবা ইত্যাদি নানা স্থানে গিয়া বাস করেন। চাষ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ইংরাজি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে সোণামুখী ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে এক কথায় সমগ্র মল্লভূমে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

লর্ড ক্লাইভ ইংরাজি ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাঙ্গালার নবাব মীরজাফরের নিকট হইতে বর্দ্ধমান চাকলার ইজারা করাইয়া দেন ও ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট দিল্লীর সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান বিনিময়ে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার "দেওয়ানী" ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে পাওয়াইয়া দেন। ইহার ফলে কোম্পানী এই প্রদেশের সমুদয় রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন এবং দেশ রক্ষার জন্য সেনা রাখিবার অধিকার পাইলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে এই রাজস্ব বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম হইয়া কেবল ফৌজদারী বিভাগের কর্ত্তা হইয়া রহিলেন এবং কোম্পানীর নিকট হইতে বার্ষিক ৬০ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতে লাগিলেন।

ক্লাইভ সাহেব যে দ্বিবিধ শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে রাজ্যশাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার কিয়দংশ নবাবের হস্তে ও কিয়দংশ কোম্পানীর হস্তে ছিল। তাহার ফলে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। কোম্পানী দেওয়ানী পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যথা নিয়মে রাজস্ব আদায় হইতেছিল না। উত্তরোত্তর কোম্পানীর ঋণ বৃদ্ধি হইয়া ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছিল এবং তাহার পরিশোধের নিমিত্ত বিলাতের ডিরেক্টর সভা পীড়াপীড়ি করিতে ছিলেন। কিন্তু ১৭৭০ খৃঃ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" জন্য বঙ্গের এক তৃতীয়াংশ প্রজার প্রাণহানি ঘটিয়াছিল। ঋণ পরিশোধ অপেক্ষা রাজস্ব অনাদায়ে কোম্পানীর ঋণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ইহা দেখিয়া ডিরেক্টরগণ ১৭৭২ খৃঃ ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে বাঙ্গালার গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। হেষ্টিংস কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া মুর্শিদাবাদের নবাবের ৬০ লক্ষ টাকা বৃত্তির অর্দ্ধেক কমাইয়া দিলেন, বাদশাহ শাহ আলমের বৃত্তি ২৬ লক্ষ টাকা বন্ধ করিয়া দিলেন, এলাহাবাদ ইত্যাদি জেলা অযোধ্যার নবাবকে ৬০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিলেন, প্রতি জেলায় এক এক জন সাহেব কলেক্টর নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের হস্তে রাজস্বসংগ্রহ ও দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ভার অর্পণ করিলেন। ফৌজদারী মোকদ্দমার

বিচার ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ মুসলমান কাজির হস্তেই রহিল। এই সময় হইতে কোম্পানীর যাবতীয় কার্যালয় মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিল ও কলিকাতা কোম্পানীর মুলুকের রাজধানী হইল।

১৭৬০ খ্রীঃ বাঙ্গালার নবাব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বর্দ্ধমান চাকলা অর্থাৎ বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া বীরভূম বা সমগ্র মল্লভূমি দেওয়া সত্ত্বেও বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিংহ যাঁহারা এক হাজার বৎসর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারা সহজে ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহেন নাই, অধিকন্তু ইংরাজের নিকট হইতে কর আদায় করিতে ছাড়িতেন না। বাঙ্গালার নবাব নিষেধ করিলেও কাহারও পরামর্শ শুনিতেন না। এরূপভাবে ৫০ বৎসর যাবত তাঁহারা মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহী হইতেন ইহার ফলে বিষ্ণুপুর রাজার রাজত্ব লোপ পায়। মল্লভূমের এইরূপ অবস্থা হেতু ১৭৮৬ খ্রীঃ মিষ্টার পাই (Mr. Pye) বিষ্ণুপুরের কলেক্টর নিযুক্ত হন। পর বৎসর ১৭৮৭ খ্রীঃ মার্চ মাসে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ মিষ্টার পাইকে (Mr. Pye) কলিকাতা গেজেটে বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের কলেক্টর নিযুক্ত করেন, ইহার দুই মাস পরে মিষ্টার কিটিং (Mr. Keating) বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার প্রথম কলেক্টর হন। ১২ই নভেম্বর ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর পরগণা বর্দ্ধমানের রাজা ক্রয় করিলে পর বিষ্ণুপুরের রাজা মাধব সিংহ বিদ্রোহী হইয়া বাঁকুড়া কলেক্টরী আক্রমণ করেন ও যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় বন্দী হইয়া কলিকাতায় নীত হন ও বন্দী-ভাবে মৃত্যু পর্য্যন্ত কলিকাতার জেলখানায় ছিলেন। রাজা মাধব সিংহের নাবালক পুত্র গোপাল সিংহকে কোম্পানী মাসিক ৪০০৲ চারি শত টাকা বৃত্তি দিতেন।

কর্ণওয়ালিস ১৭৯২ খ্রীঃ কলেক্টরদিগের হাত হইতে বিচার ক্ষমতা তুলিয়া লন এবং প্রত্যেক জেলায় এক এক জন জজ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের হাতে বিচার ভার অর্পণ করেন। ইহাদিগকে হিন্দু ও মুসলমান আইন বুঝাইয়া দিবার জন্য পণ্ডিত ও কাজী নিযুক্ত হইলেন। এই সকল ইংরাজ জজ যখন হিন্দু পণ্ডিত বা মুসলমান কাজীর সাহায্য লইয়া বিচার করিতেন তখন হিন্দুরা ইহাকে পণ্ডিত আদালত ও মুসলমানেরা কাজীর দরবার বলিত। চার, পাঁচ জন পণ্ডিত হিন্দুদের বিচারের সময় জজের সঙ্গে বসিতেন। তাঁহারা বিষয় বিভাগ বণ্টনাদি মোকর্দ্দমায় হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থা প্রদান করিতেন তাঁহারা জজ পণ্ডিত নামে অভিহিত হইতেন। শান্তিপুর নিবাসী কুলীন প্রবর পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য একজন জজ পণ্ডিত ছিলেন সেই প্রকার চার পাঁচ জন কাজী মুসলমানদের বিচারের সময় বসিতেন।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূমের গঙ্গানারায়ণ বিদ্রোহী হইয়া মল্লভূমি, বীরভূমে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করেন। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ ও পুলিসের লোকেরা বর্দ্ধমানে গিয়া আশ্রয় লয়, ইহাতে মল্লভূমি বীরভূম ইত্যাদি স্থান গঙ্গানারায়ণের হস্তগত হয়, মল্লভূমের অন্তর্গত সোণামুখী গ্রামেও নির্দ্দয়ভাবে হত্যা ও লুটপাট করিয়াছিল। কিছুদিন পরে কলিকাতা হইতে ইংরাজ সৈন্যের আগমনে গঙ্গানারায়ণের বিদ্রোহী লোকেরা, বেশিরভাগ সাঁওতালরা জঙ্গলে ও পর্ব্বতে পলায়ন করে। গঙ্গানারায়ণ সিংভূমে পলায়ন করেন ও তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। সোণামুখীর লোকেরা এখনও এই গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামার কথা বলিয়া থাকেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান, বাঁকুড়া জেলার ভিতর কোনরূপ দুর্ঘটনা হইতে পায় নাই। বাঁকুড়া সহরের সেকওয়াতি সিপাহিগণের (Sheikhawati Battalion) ভিতর চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল। তাহারা নিজেদের কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে ও ছোট নাগপুরের বিদ্রোহিগণের অপেক্ষা করিতেছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সংবাদ আসে যে পুরুলিয়া হইতে বিদ্রোহী সিপাহিগণ, সাঁওতাল ও ছড়রা জাতি বাঁকুড়া সহরে আসিতেছে—এই সংবাদে বাঁকুড়ার সিপাহীদের ভিতর পুনরায় চাঞ্চল্য দেখা যায়। অযোধ্যার জমিদার গদাধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি পরে রায় বাহাদুর হন, তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বাঁকুড়া সহরের দুই তিন স্থানে যাত্রা, নাচ, তামাসা ও আহারের বন্দোবস্ত করেন। তিনি নিজ গ্রাম অযোধ্যায়ও যাত্রার ও ভোঁজনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই অযোধ্যা গ্রাম সোণামুখী হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে। বিষ্ণুপুর হইতে ৬ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে। বিষ্ণুপুর সোণামুখী হইতে ২১ মাইল দক্ষিণে। অযোধ্যায় আসিতে হইলে বিষ্ণুপুরের পরের ষ্টেশন রামসাগর ষ্টেশনে নামিতে হয়। রামসাগর ষ্টেশন হইতে অযোধ্যা ৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। রায় গদাধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর অযোধ্যার একজন বিখ্যাত জমিদার, তাঁর অনেকগুলি নীল কুঠী ছিল ইহাতে তিনি প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করেন ও অনেক জমিদারী ক্রয় করেন। এই সময় তাঁর বাৎসরিক আড়াই লক্ষ টাকা আয় ছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি সদাব্রত খুলিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে আহার দিয়াছিলেন। তিনি তাঁর গ্রামে নিজ ব্যয়ে একটী স্কুল খুলিয়াছিলেন তাহার নাম ছিল "অযোধ্যা M. E. স্কুল" (Ajodhya M. E. School) পরে ইহাই High School হয়। এখন আবার এই High School, M. E. School হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে অক্টোবর ১৮৯২ খ্রীঃ হইতে

জুলাই ১৮৯৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত পাগল হরনাথ দ্বিতীয় শিক্ষক স্বরূপে দশ মাস কাজ করিয়াছিলেন।

অযোধ্যার M. E. School শীঘ্রই High School হইবে এই সংবাদ সোণামুখীর High School এ আসিয়া পৌঁছে। অযোধ্যার রায় বাহাদুর গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুর হরনাথ ও শিবনারায়ণের আত্মীয় (লীলাকথার ৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) হরনাথের সোণামুখীর হাই স্কুলে শিক্ষকতা কালীন তাঁর সহকর্ম্মী শিক্ষক রসিকলাল দেকে, ঠাকুরের বড় ভাই শিবনারায়ণকে এই কথা বলিতে হরনাথ অনুরোধ করেন। হরনাথ তাঁহার বড় ভ্রাতা শিবনারায়ণকে এইরূপ মান্য ও ভয় করিতেন যে তিনি বৃদ্ধ হইয়াও বড় ভ্রাতার কথার উপর কথা কহিতেন না। বড় ভ্রাতার ভয়ে বাড়ীতে কখন তামাক খাইতেন না বা তামাক ইত্যাদির কোন প্রকার দ্রব্যের আয়োজন বাড়ীতে রাখিতেন না। শিবমন্দির বা কোন স্থানে হরনাথ থাকিলে সেই স্থানে শিবনারায়ণ প্রবেশ করিলে, হরনাথ তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিতেন। ঠিক যেন ভাসুর ভাদ্রবধূর মত আচরণ করিতেন। বড় ভ্রাতাকে কি প্রকার মান্য করিতে হয় তিনি আদর্শ ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। এই হেতু হরনাথ তাঁর বড় ভাই শিবুকে অযোধ্যার মাষ্টারির বিষয় সংবাদ দিবার জন্য রসিক বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শিবনারায়ণ এই সংবাদ অবগত হইয়া, রায় বাহাদুর গদাধরের পুত্র রাসবিহারীর সহিত দেখা করিতে অযোধ্যায় গমন করেন। রাসবিহারী বাবু হরনাথকে ২৫৲ বেতনে স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন। বামরা গ্রাম নিবাসী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, যিনি M. E. Schoolএর হেড মাষ্টার ছিলেন তিনি এই হাই স্কুলের হেড মাষ্টার হন। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত হরনাথের পূর্ব্বের পরিচয় ছিল না। রামচন্দ্র বাবু পরম ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। হরনাথ অযোধ্যার স্কুলে যোগদান করিলে পর, অল্প দিনের মধ্যে হরনাথ কি বস্তু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। হরনাথ যে একজন উচ্চ শ্রেণীর বৈষ্ণব তাঁহার বুঝিতে বাকি ছিল না। হরনাথ একদিনও কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ বা জপ এবং মালা তিলক ধারণ না করিলেও, তাঁর হৃদয় যে কৃষ্ণময় ছিল তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বাবু একজন নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং অনেক অলৌকিক শক্তি তাঁহাতে আশ্রয় করিয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে হরনাথ একজন উচ্চ শ্রেণীর বৈষ্ণব সাধক; বিভিন্ন মার্গাবলম্বী হইলেও, কোন দিন হরনাথ তাঁহাকে তাঁহার ধর্ম্মমত ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবতা আশ্রয় করিতে বলেন নাই। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে

পারা যায় যে সকল ধর্ম্ম এবং সাধন প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ উদারতা ছিল।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সোণামুখী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল কারণ সে সময় বাঁকুড়া জেলার পৃথক সৃষ্টি হয় নাই। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বাঁকুড়া জেলা বলিয়া একটী পৃথক জেলার সৃষ্টি হয়। ১৮৭৯ খ্রীঃ বাঁকুড়া জেলায় যে আয়তন ছিল এখনও সেই প্রকারই আছে, কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮১ সালে বাঁকুড়া সহরে, বাঁকুড়া জেলা জজের সদর কাছারি স্থাপনের ঘোষণা গেজেটে প্রচারিত হয়।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যবস্থা ও বিচার ভার বিষ্ণুপুরের রাজার হস্তে ছিল। পঞ্চায়েৎ বা গ্রামের মাতব্বর লোকের সাহায্যে সামন্ত রাজারা দোষীর বিচার করিয়া বিষ্ণুপুরের রাজার নিকট শেষ বিচারের জন্য প্রেরণ করিতেন। প্রতি গ্রামের পত্তনিদার বা জমিদারেরাই—গ্রামের রাজার স্বরূপ ছিলেন। অধিকাংশ দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিবাদ গ্রামের জমিদারই মীমাংসা করিয়া দিতেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রজারা অর্থের পরিবর্ত্তে ক্ষেতের উৎপন্ন শস্য দিয়া জমিদারকে খাজনা দিত। দশগণ্ডা কড়ি এক পয়সা স্বরূপ গণ্য হইত, পরে পাঁচ গণ্ডা কড়ি এক পয়সা ধরা হইয়াছিল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের পর বাঁড়ুয্যে বাবুরা সোণামুখীর জমিদার বা পত্তনিদার হইয়াছেন। বর্দ্ধমান রাজার পত্তনিদার। শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমৃতশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই ভাই সোণামুখীর জমিদার। উপস্থিত শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বংশের একজন জমিদার। তিনকড়ি বাবু যেমন ধার্ম্মিক তেমনি সদাশয় লোক। এখন নগদ অর্থ ছাড়া দ্রব্য বিনিময় দেওয়া উঠিয়া গিয়াছে। এখন আর জমিদারগণকে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকর্দ্দমা বিচার করিতে হয় না। খাজনা ছাড়া অন্য প্রকারের অর্থ সংগ্রহ করার ক্ষমতা জমিদার বাবুদের নাই।

বঙ্গাব্দ ১১০৩ সালে (শকাব্দা ১৬১৮ বা ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীমনোহর দাসের অনুরাগ-বল্লী নামক বৈষ্ণব গ্রন্থ বৃন্দাবনে রচিত হয়। এই মনোহর দাস সোণামুখীর দিনমণি গ্রন্থ প্রণেতা মনোহর দাস বাবাজী নন। এই অনুরাগ-বল্লী মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের ১৫০ বৎসর পরে রচিত হইয়াছে। মহাপ্রভু ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আষাঢ়ের শুক্ল পক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে রবিবার দিন তাঁহার অপূর্ব্ব লীলার অবসান করেন।

এই পুস্তকের তৃতীয় মঞ্জরীতে আছে যথা ঃ—

তবে ঠাকুর (শ্রীনিবাস) কহিলেন খরচ আছয়ে।
কি আছয়ে সত্য কহ গোসাঞি (শ্রীঅভিরাম) পুছয়ে॥
পাঁচ গণ্ডা কড়ি আছে শুনিলেন যবে।
বিস্মিত হইয়া মনে বিচারিল তবে॥
আজি পরীক্ষিব দেখি কি করে ব্রাহ্মণ।
লোকে কহে দেখ কোথা করয়ে রন্ধন॥
ঠাকুর (শ্রীনিবাস) ষোল কড়া দিয়া তণ্ডুল আনিল।
এক কড়া দিয়া এক খানি খোলা নিল॥
দুই কড়ার কাষ্ঠ এক কড়ার লবণ।
লইয়া দারুকেশ্বর নদীতে গমন॥

১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রণীত মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে কালকেতুর বিবাহের ব্যয়ের যে ফর্দ্দ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে সাধারণ বিবাহের ব্যয়ের একটা মোটামুটী ওজন পাওয়া যায়। ধর্ম্মকেতু ১৩ গণ্ডা কড়ি লইয়া বাজারে গিয়া নিম্নলিখিত ভাবে ব্যয় করিয়াছিলেন।

দুইখানা ধড়া (নেংটী, ধড়া ধটা বা ধুতি)		৻৫ পাঁচ গণ্ডা কড়ি বা কড়া
পাণ	...	৻১ এক গণ্ডা
মেটে সিন্দূর	...	৻১ " "
খয়ের	...	৻১ " "
চূণ	...	৷৹ দুই কড়ি
খুঞ্জ (বস্ত্র বিশেষ)	...	৻৪৷৹ সাড়ে চার গণ্ডা
		মোট ৻১৩ গণ্ডা কড়ি বা কড়ি

উপরোক্ত মাধবাচার্য্য বা মাধবাচার্য্য কীর্ত্তনীয়া পূর্ব্বে নিমাই পণ্ডিতের টোলের পড়ুয়া ও তাঁর মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। এই মাধবাচার্য্য নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গা দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর একমাত্র পুত্রের নাম জয়রাম চন্দ্র গোস্বামী। মাধবাচার্য্যের পিতার নাম পরাশর ও পিতামহের নাম ধরণীধর বিশারদ ইত্যাদি ইত্যাদি কোন কোন গ্রন্থকার বলিয়াছেন তবে ইহার প্রমাণের অভাব।

মহাপ্রভুর জন্ম ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সেই সময়ে দশ গণ্ডা কড়িতে একটী ঢেবুয়া তামার পয়সা হইত কিন্তু ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ গণ্ডা কড়িতে একটী ঢেবুয়া পয়সা হইত। আর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ হরনাথের জন্মের ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে

সোণামুখীতে পাঁচ গণ্ডা কড়িতে একটী ঢেবুয়া পয়সা বা রাণীমুখো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পয়সা হইত। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কড়ি ও ঢেবুয়া পয়সা চলিত। জমিদার বাবুদের রক্ষিত পুরাতন সেরেস্তার কাগজ পত্র খাতা ইত্যাদি দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে বঙ্গাব্দ ১২০৭ সালে বা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর সোণামুখী ইত্যাদি সহরে একমণ চাউল পনের আনায় (৸৶০) বিক্রয় হইত সেই সময় যে পরিমাণ চাউল, ধান, ডাইল কড়াই ইত্যাদি সোণামুখীতে উৎপন্ন হইত তাহা সোণামুখীতে ব্যবহৃত হইত গাড়ি গাড়ি রপ্তানি করিবার মত শস্য জন্মাইত না। প্রতি কাচি সের দুধ দশ গণ্ডা কড়িতে বিক্রয় হইত অর্থাৎ এক সের দুধ দুই পয়সায় পাওয়া যাইত। কিন্তু সে সময় সকল দ্রব্যই পরিমাণ বা মাপ করিয়া বিক্রয় হইত, ওজন করিয়া কোন দ্রব্যই বিক্রয় হইত না। চাউল, ধান, কলাই ইত্যাদি শস্য পালি, রেখ কুনকা, ধামা, ঝুড়ি ইত্যাদির পরিমাণে বিক্রয় হইত। তেল দুধ ইত্যাদি পরিমাণ করিয়া বিক্রয় হইত, যেমন বর্ত্তমানে গোয়ালারা দুধ পরিমাণ করিয়া বিক্রয় করে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সোণামুখীতে এক সেরের ওজন ৬৪ তোলা হইত, এইজন্য এই সেরকে কাঁচি "সের" বলিত। এই অনুপাতে এক মণ ৮০ তোলা সেরের ওজনে ৩২ সের হইত। ঘৃতের তিন আনা সের দাম ছিল। কোন প্রকার তৈলই বিক্রয় হইত না। সরিষা ইত্যাদি দিলে কলুরা সের প্রতি দশ গণ্ডা কড়ি মজুরী ও খোলের অর্দ্ধেক অংশ পাইত। অর্থাৎ প্রতি কাঁচি সের সরিষা ইত্যাদি হইতে দেড় পোয়া তেল ও আড়াই পোয়া খোল উৎপন্ন হইত। এক মণ (কাঁচি) সরিষায় সাড়ে বার সের তেল ও সাড়ে ২৭ সের খোল উৎপন্ন হওয়া গণ্য হইত। বর্ত্তমান কালে পাকি মণে ১৫ সের তেল ও ২৫ সের খোল হইয়া থাকে। খারাপ সরিষা হইতে ১৫ সেরের কম তেল নির্গত হয়। সরিষা ১৷৷০ মণ, মটর কলাই—৷৷৶১ দশ আনা মণ, মুগকলাই—১৷০ মণ, মাস কলাই ৸০ বার আনা মণ, ছোলা আস্ত—৷৷৴০ নয় আনা মণ কৃষ্ণকলাই - ৷৷০ আট আনা মণ, লবণ—৸০ বার আনা মণ, ময়দা বা আটা—১৸০ এক টাকা বার আনা মণ বিক্রয় হইত। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধান, চাউল ডাল, কলাই, ঘৃত, তৈল, লবণ ইত্যাদি কোন দোকানে বিক্রয় হইত না। মাংস বিক্রয় হইত না, মাছের কোন নির্দ্দিষ্ট দাম ছিল না। সাবান, সাজিমাটী, সোডা ইত্যাদি পাওয়া যাইত না। শাল কাঠের পোড়া ছাই বা ক্ষার দ্বারা সাজি মাটী বা সাবানের কাজ হইত। ধোপা, নাপিত, রাখাল, পুরোহিত বাৎসরিক ধানের সময় ধান পাইত। যাহারা সোণামুখীর নীল কুঠিতে

যাহারা সোণামুখীর নীল কুঠিতে কাজ করিত এরূপ মজুরেরা জলযোগের জন্য মুড়ি ও এক আনা মজুরী পাইত ও মধ্যাহ্নে নিজ নিজ বাড়ীতে আহার করিয়া আসিত। যে সকল কামিনদার বা মজুর গৃহস্থের বাড়ীতে বা তাঁদের ক্ষেতে কাজ করিত তাহারা জলযোগের জন্য মুড়ি, গুড় ও মধ্যাহ্নে আহার পাইত। ইহা ছাড়া প্রত্যেকে দুই পয়সা মজুরি পাইত, স্ত্রীলোক কামিনদারীগণ দুই পয়সার স্থলে এক পয়সা মজুরী পাইত। যে সকল শিক্ষিত লোক মুহুরীর কাজ করিত, মুড়ি গুড় ছাড়া ২৲ টাকা হইতে ২৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক মাহিনা পাইত, দুই বেলা আহার পাইত, গৃহস্থের বাড়িতে থাকিয়া ছেলে পড়াইত, গৃহস্বামীর সংসারের সকল কার্য্যই পর্য্যবেক্ষণ করিত। যে সকল মুহুরি কারখানা বা কুঠিতে কাজ করিত তাহারা আহার পাইত না। মুড়ি, গুড় পাইত ও মাসিক ৩৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত পাইত। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবরের সময়ের খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যের তালিকা দেওয়া গেল।

দাম, পয়সা বা ফুলুস নামক তাম্র মুদ্রা সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল। ৪০ দামে এক তঙ্কা হইত। তঙ্কা বা টাকার মধ্যে কোন খাদ ছিল না—সেই সময়ে টাকার ওজন এক ভরি ছিল। আকবরের সময় স্বর্ণের মূল্য রৌপ্যের মূল্যের ১০ গুণ বেশী ছিল। রূপার মূল্য তাম্রের মূল্যের ৭২ গুণ বেশী ছিল। সাধারণ মজুর দৈনিক ২ দাম পারিশ্রমিক পাইত অর্থাৎ এখনকার হিসাবে তিন পয়সা পাইত। উত্তম কারিগর বা সূত্রধর প্রভৃতি ৭ দাম পারিশ্রমিক পাইত অর্থাৎ এখনকার হিসাবে ১১ পয়সা পাইত।

অকবরের সময় সের বা মণ দরে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় হইত। ৪০ সেরে এক মণ হইত কিন্তু এক সের ৫৪ তোলায় হইত সুতরাং এক মণ এখনকার হিসাবে ২৭ সের হইত।

দ্রব্য	মূল্য প্রতি মণ (২৭ সের)	মূল্য প্রতি ৪০ সের মণের হিসাবে (৮০ তোলায় সের)
গোধূম	১২ দাম	১৮ দাম বা সাত আনা মণ
যব	৪ ,,	৬ ,, বা ৯ পয়সা মণ
জোয়ার	১০ ,,	১৫ ,, বা সাড়ে পাঁচ আনা মণ
কৃষ্ণকলাই	৮ ,,	১২ ,, বা সাড়ে চার আনা মণ
মটর	৬ ,,	৯ ,, ,, সাড়ে তিন আনা মণ
সরিষা	১২ ,,	১৮ ,, ,, সাত আনা মণ

উৎকৃষ্ট চাউল	১০০ ,,	১৫০ ,,	,,	তিন টাকা আট আনা মণ
সাধারণ চাউল	৮ ,,	১২ ,,	,,	সাড়ে চার আনা মণ
মুগ	১৮ ,,	২৭ ,,	,,	দশ আনা মণ
মাষকলাই	১৬ ,,	২৪ ,,	,,	নয় আনা মণ
সাদা তিল	২০ ,,	৩০ ,,	,,	এগার আনা মণ
কৃষ্ণ তিল	১৯ ,,	২৮½ ,,	,,	সাড়ে দশ আনা মণ
ছোলা	১৬½ ,,	২৫ ,,	,,	সাড়ে নয় আনা মণ
ময়দা	২২ ,,	৩৩ ,,	,,	বার আনা মণ
ঘৃত	১০৫ ,,	১৫৩ ,,	,,	৩।৵০ মণ
তিল তৈল	৮০ ,,	১২০ ,,	,,	দুই টাকা তের আনা মণ
দুগ্ধ	২৫ ,,	৩৭ ,,	,,	৸৶০ মণ
দধি	১৮ ,,	২৭ ,,	,,	দশ আনা মণ
সাদা চিনি	১২৮ ,,	১৯২ ,,	,,	৪॥০ মণ
লাল চিনি	৫৬ ,,	৮৪ ,,	,,	১৸৶১০ মণ
মেষ মাংস	৬৫ ,,	৯৭½ ,,	,,	২।০ মণ
ছাগ মাংস	৫৪ ,,	৮৪ ,,	,,	২৲ টাকা মণ
লবণ	১৬ ,,	২৩ ,,	,,	নয় আনা মণ

দ্রব্য	প্রতি সের (৫৪ তোলা)			
জাফরান	৪০০ দাম	৬০০ দাম	বা	১৪৲ সের
লবঙ্গ	৬০ দাম	৯০ দাম	বা	২৶০ ,,
গোলমরিচ	১৭ দাম	২৫½ দাম	বা	॥৴১০ ,,
এলাচ	৫২ দাম	৭৮ দাম	বা	১৸৴০ ,,
দারুচিনি	৪০ দাম	৬০ দাম	বা	১।৶১০ ,,

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ৮০ তোলায় সেরের হিসাবে ৪০ সের মণ ধরিয়া ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে দ্রব্যের কি প্রকার দর ছিল ও ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কি দর চলিতেছে নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

	১৬০০ খ্রীঃ	১৮০০ খ্রীঃ	১৯৩৭ খ্রীঃ
	মণ প্রতি দাম	মণ প্রতি দাম	মণ প্রতি দাম
সাধারণ চাউল	সাড়ে চার আনা মণ	৸৴০ আনা মণ	৩৲ মণ
	৩।৶০ মণ	টাকা মণ	৪৫৲

	১৬০০ খ্রীঃ	১৮০০ খ্রীঃ	১৯৩৭ খ্রীঃ
মটর	তিন আনা মণ	৶০ আনা মণ	১৶০ ,,
সরিষা	সাত আনা মণ	১৸৵ আনা মণ	৭৲ ,,
মুগ	৷৵০ আনা মণ	১৷৴০ মণ	৩৷০ ,,
মাষকলাই	৷৴০ আনা মণ	৷৶০ মণ	১৸৵০ ,,
ছোলা	৷৴১০ আনা মণ	৶০ মণ	১৶০ ,,
ময়দা	৶০ আনা মণ	২৶০ মণ	৫৲ ,,
দুগ্ধ	৶৵০ মণ	১৷৴০ মণ	৫৲ ,,
লবণ	নয় আনা মণ	৶৶০ মণ	২৷৵০ ,,
কৃষ্ণকলাই	সাড়ে চার আনা মণ	৷৵০ মণ	১৷৵০ ,,

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে একতোলা স্বর্ণের মূল্য ছিল ১০৲ টাকা, একতোলা রূপার মূল্য ছিল ১৲ টাকা, এক তোলা তামার মূল্য ছিল আধ দাম বা তখনকার আধ পয়সা।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে—	১ তোলা	সোণার দাম ছিল	১৪৲ টাকা
	১ ,,	রূপার দাম ছিল	৸৵০ আনা (চৌদ্দ আনা)
	১ ,,	তামার দাম ছিল	এক পয়সা
১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে—	১ ,,	সোণার দাম	৩২৲ টাকা
	১ ,,	রূপার দাম	৷৵০ আনা (দশ আনা)
	১ ,,	তামার দাম	এক পয়সা

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মনোহর দাস বাবাজীর সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসার লাভ করিয়াছিল। সকাল সন্ধ্যায় বৈষ্ণবগণ গান করিয়া বেড়াইত। তখন অষ্ট প্রহর, চব্বিশ প্রহর, নব-রাত্রি ব্যাপিয়া রাধাগোবিন্দের নাম কীর্ত্তন হইত কিন্তু ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের বা বঙ্গাব্দ ১১৭৬ সালে মন্বন্তরের সময় হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোন প্রকার ধর্ম্মের সাড়া ছিল না। দেব দেবীর প্রতিমা পূজা পূর্ব্বের ন্যায় সংখ্যায় অধিক না হইলেও একেবারে লোপ পায় নাই; কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসার একেবারেই ছিল না। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে অষ্ট প্রহর, চব্বিশ প্রহরব্যাপী কীর্ত্তন একেবারেই ছিল না। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অর্থাৎ হরনাথের জন্মের ১০।১২ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ধীরে ধীরে অষ্ট-প্রহর, চব্বিশ প্রহর কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। তবে মনোহর দাসের বাৎসরিক রাম-নবমীর উৎসব কখনই বন্ধ হয় নাই। পাগল হরনাথের প্রকট অবস্থায় কীর্ত্তনের স্রোত যে ভাবে চলিয়াছিল, এখন তাঁর অপ্রকট অবস্থায় যেন সে

স্রোতের ভাঁটা পড়িয়াছে। দেব দেবীর প্রতিমা পূজার সংখ্যা সিকি পরিমাণও হয় না। ইহার প্রধান কারণ সকলেরই অর্থের অনটন। অন্য কারণ আর পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মে আস্থার অভাব। ইহা করিলে কি হইবে, উহা করিলে কি হইবে, ইহাই হইয়াছে এখন সকলের চিন্তার বিষয়। বাঙ্গলার অন্যান্য গ্রামের ন্যায় ম্যালেরিয়া ইত্যাদি জন্য সোণামুখী গ্রামের লোকের বসতি বিশেষ কম হয় নাই। সোণামুখীতে ডাকাতির উপদ্রব নাই, চোরের উপদ্রব নাই বলিলেই চলে। পুষ্করিণী, বাঁধ বা জলাশয় প্রায় মজিয়া গিয়াছে; অনাবৃষ্টি জন্য পূর্ব্বের ন্যায় ফসল ও তরিতরকারি জন্মে না। পূর্ব্বে সোণামুখীর জল বায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল, এখন সোণামুখী সকল প্রকার রোগের আলয় হইয়াছে, ম্যালেরিয়া ও কলেরার এত অধিক প্রাতুর্ভাব যে এই ভাবে কিছু দিন চলিলে বাঙ্গলার অন্যান্য গ্রামের ন্যায় শীঘ্রই সোণামুখী লোকশূন্য হইয়া জঙ্গলে পূর্ণ হইবে। পূর্ব্বে সোণামুখীতে মুসলমানের বাস ছিল না এখন কয়েক ঘর মুসলমান বাস করিয়াছে ও ক্রমশ মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে। সোণামুখীর একটী পাড়ার নাম পীরতলা। তবে এখনও বৃহৎ কোন মস্‌জিদ স্থাপিত হয় নাই, মস্‌জিদ যে শীঘ্র হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। প্রতি বৎসর কুলদা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আম বাগানে মুসলমানদের মুরগির লড়াই হইয়া থাকে। পাগল ঠাকুর এই মুরগির লড়াই দেখিতে ভালবাসিতেন. ভাগবতও তাঁহার সঙ্গে এই মুরগির লড়াই দেখিয়াছে। মোরগের পায়ে শার্নিত এক প্রকারের ছুরী বাঁধিয়া দেওয়া হয়, ছুরী বাঁধিয়া দুইটী মোরগকে ছাড়িয়া দিলে পরস্পর পরস্পরের বুকে ছুরীর আঘাত করিতে থাকে. যে মোরগ ছুরীর আঘাতে পরাজিত হয় সে তখনি রক্তাক্ত কলেবরে মরিয়া যায়। এই পরাজিত মৃত মোরগকে যাহার মোরগ পরাজয় করিয়াছে সে পাইয়া থাকে। সোণামুখীতে অনেক নিম্ন শ্রেণীর লোকের বাস, তাহারা শূকরের ব্যবসা করিয়া থাকে। সোণামুখীতে অনেক হনুমান দেখা যায়। সোণামুখীর চারিধারে শালগাছের জঙ্গল। সোণামুখীর প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি মৎস্য ও মাংস খাইয়া থাকেন, এখানে বৈষ্ণবেরাও মৎস্য খাইয়া থাকেন। পিঁয়াজ ও ডিম অনেকেই আহার করেন। ডিঙ্গলে বা কুমড়া, পোস্তদানা, কড়াই ডাল, অম্বলের মৎস্য সকলেরই প্রিয় খাদ্য। আম, কাঁটাল, তাল প্রচুর জন্মে। সোণামুখীর লোকেরা কি ভাবে কচি তাল খাইয়া থাকেন তাহার সামান্য বর্ণনা দিই। দুই, তিন জন লোকে কাঁধি কাঁধি তাল পাড়ে ও ২।৩ জন লোক শানিত কাটারি দিয়া তালের বোঁটার দিকে কাটিয়া

ফেলে ও কেবল জল খাইয়া থাকেন। তালশাঁস খাইবার প্রত্যাশা রাখেন না। নারিকেল ও খেঁজুর গাছ নাই বলিলেই হয়। পানের বরজ আছে তবে বাহির হইতে পান আমদানি করিতে হয়। পাতিনেবু, কাগজি নেবু, বাতাবি নেবু, লিচুফল, গোলাপ জাম, পটল, আলু, পালম শাক, কপি ইত্যাদি পাওয়া যায় না বলিলেই চলে; যাহা জন্মে তাহা ভাল হয় না।

১৮৪০।১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পথে বা যে কোন স্থানে যে কোন জাতি বা ভেকধারী বৈষ্ণবরা ব্রাহ্মণকে দেখিলে তিন প্রকার প্রণাম মধ্যে যে কোন প্রকারের প্রণাম করিত। যথা (১) সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, অর্থাৎ দিঘন হইয়া ব্রাহ্মণের চরণপ্রান্তে শুইয়া পড়িয়া অর্থাৎ দণ্ডবৎ প্রণাম করিত (২) ভূমিষ্ঠ প্রণাম - অর্থাৎ ভূমিতে জানু পাতিয়া মস্তক দ্বারা চরণ স্পর্শ করা (৩) সাধারণ প্রণাম—অর্থাৎ ভূমিতে জানু না পাতিয়া হস্ত দ্বারা চরণস্পর্শ করা। একদিনে একবারের অধিক বার সাক্ষাৎ হইলে, বার বার প্রণাম না করিলেও দোষ বা অপরাধ হইত না। যেমন ব্রাহ্মণকে দেখিলে প্রণাম করার পদ্ধতি ছিল সেই ভাবে কোন ব্রাহ্মণ রমণীকে দেখিলে প্রণাম করিত। সোণামুখীর ব্রাহ্মণগণ এই ভাবে সকল জাতির সম্মান পাইয়া আসিয়াছেন। ২০।২৫ বৎসর হইতে সোণামুখীর ব্রাহ্মণগণ আর পূর্ব্বকার সম্মান পাইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, সোণামুখীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেবল হরনাথই পূর্ব্ব লিখিত প্রকারের প্রণাম পাইতেন। এখন সোণামুখী বা অন্য স্থানের ব্রাহ্মণগণ সাষ্টাঙ্গ, ভূমিষ্ঠ বা সাধারণ প্রণামের পরিবর্ত্তে (১) কাক ঠোক্কুর প্রণাম অর্থাৎ সামান্য অবনত হইয়া এক হস্ত দিয়া চরণ স্পর্শ করা (২) চাষাড়ে প্রণাম অর্থাৎ মস্তক সামান্য অবনত করিয়া করযোড়ে প্রণাম করা (৩) কুড়ুলে প্রণাম—অর্থাৎ মস্তক অবনত না করিয়া করযোড়ে যেমন কাঠুরিয়ারা কুড়ুল লইয়া কাঠ কাঠে সেই ভাবে প্রণাম পাইয়া থাকেন। পাগল হরনাথকে চাষাড়ে বা কুড়ুলে প্রণাম করিতে কাহাকেও দেখি নাই তবে কেহ কেহ কাক ঠোক্কুর প্রণাম করিতেন। মাতা ঠাকুরাণীকে ও চারি প্রকারের প্রণাম মধ্যে কোন না কোন প্রকারে প্রণাম করিয়া থাকেন যথা (১) সাষ্টাঙ্গ, (২) ভূমিষ্ঠ, (৩) সাধারণ (৪) কাক ঠোক্কুর প্রণাম।

পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সোণামুখীর লোকেরা কেবল ছোট ধুতি পরিতেন, প্রায় কেহ জামা পরিতেন না। তবে মেরজাই চলন ছিল, তাহা ব্রাহ্মণ ইত্যাদি উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা ব্যবহার করিতেন। স্ত্রীলোকরা কাঁচুলি পরিতেন; এই কাঁচুলিই এখন জ্যাকেটে পরিণত হইয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের

জামাও থাকে নাই। কোট, পাঞ্জাবি সার্ট, গেঞ্জি ইত্যাদি তখন ছিল না। শীতকালে গায়ে দিবার কাঁথা, কম্বল বা শাল ছিল। সামাজিক কার্য্য উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি লোকেরা একখানি চাদর গায়ে দিয়া নিমন্ত্রণ স্থানে, দূরঁ স্থানে বা জমিদার ইত্যাদির বাড়ীতে যাইতেন। পায়ে প্রায় জুতা থাকিত না. চটি জুতা ব্যতীত অন্য প্রকারের কোনরূপ জুতার চলন ছিল না। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ধুতির সঙ্গে গামছা লইয়া নিমন্ত্রণ ইত্যাদি স্থানে যাইতেন, তাহারা চটি জুতা ও ব্যবহার করিতেন না। সোণামুখীতে সে সময় জামা বা চটি জুতা করিবার দরজির বা মুচির দোকান ছিল না। এখন সোণামুখীতে জামা ও জুতার দোকন হইয়াছে। কবিরাজি চিকিৎসা ছাড়া অন্য কোন প্রকারের চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। স্ত্রীলোকেরা সকলের সম্মুখে বাহির হইতেন না, তাঁহারা অন্দর মহলে থাকিতেন। দাবা পাশা, কপাটি খেলার চলন ছিল ও এখনও ইহার চলন আছে। হরনাথ পাশা খেলিতে ভালবাসিতেন, ইহার বর্ণনা যথা স্থানে দেখিতে পাইবেন। খ্রীঃ ১৮০০ সালে সোণামুখী গ্রামে ২৫।৩০ খানা ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী ছিল। অন্যান্য বাড়ীগুলি সবই খড়ের বা উলু ঘাসের ছাউনির ছিল। সোণামুখীর গ্রামের মধ্যে চলাচল পথগুলি বালি ও কাঁকরে পূর্ণ, ঠিক যেমন সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান। ইহার কারণ পূর্ব্বে মনোহর তলার নিকট দিয়া বর্ষাকালে শালি নদীর বন্যার জল গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত, ইহাতে গ্রামের আবর্জ্জনা ধৌত হইয়া যাইত ; তাহাতে সোণামুখীর স্বাস্থ্য ভাল থাকিত। শালি নদী মজিয়া যাওয়ায় এখন পূর্ব্বের মত বন্যার জল গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় না, ইহাই যত অনিষ্টের মূল হইয়াছে। বিলাসিতা কাহাকে বলে তাহা সোণামুখীর লোকেরা জানিত না। এখনও এরূপ সরলতা দেখা যায় কিন্তু পারিপার্শ্বিক সংস্পর্শ দোষের কুফল সোণামুখীব যুবকদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, পূর্ব্বে গন্ধ তৈল. এসেন্স, সাবান, চা, কফি, সিগারেট, বিড়ী কেহ ব্যবহার করিত না কিন্তু এখন ইহাদের চলন সোণামুখীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জলযোগের জন্য মুড়ি ও গুড়ের পরিবর্ত্তে সন্দেশ, রসগোল্লার চলন হইয়াছে—এখন সন্দেশ রসগোল্লার অনেক দোকান হইয়াছে।

পূর্ব্বে বিবাহে কোনরূপ পণ বা যৌতুক নগদ টাকা হিসাবে বা অলঙ্কারভাবে কন্যা পক্ষ হইতে লইবার ব্যবস্তা ছিল না। পৌরাণিক যুগে বরের নিকট হইতে এক বা দুইটী গো-মিথুন গ্রহণ করিয়া বিধানানুসারে কন্যাদান করা হইত অথবা বরের নিকট হইতে কন্যাপণ অর্থ গ্রহণ করিয়া কন্যাদান করা হইত। কিন্তু এ প্রথা রহিত হইয়া কন্যার নিকট হইতে বরপণ অর্থ দিবার প্রথা চলিত হইয়াছে।

এই প্রথা কি প্রকারে, কবে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বরপক্ষের ব্রাহ্মণদিগকে এই পণগ্রহণ করিতে দেখা যায়। ১৮৩৫ খ্রীঃ হরনাথের পিতা জয়রামের বিবাহে জয়রাম পণ হিসাবে ৫১৲ টাকা পান। পরে জয়রামের পুত্র শিবনারায়ণ ও হরনাথের বিবাহে তাঁহারা ১০১৲ টাকা হিসাবে পণের টাকা পাইয়াছিলেন। সোণামুখী বলিয়া নহে বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্র এই পণের টাকা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পণ বা কুল-মর্য্যাদা হিসাবে ৫৲ টাকা দিলেই চলিত। সেই সময় বরকে সোণার একটি আংটী ও কন্যাকে রূপার অলঙ্কার দেওয়া হইত। ১৫ শত খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে শ্রীচৈতন্যদেব যখন প্রথম লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন তখন শ্বশুরালয় হইতে তিনি পঞ্চহরিতকী মাত্র উপঢৌকন বা যৌতুক পাইয়াছিলেন।

এই পণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ, বাঙ্গালা দেশে এখন নানা প্রকারের অলঙ্কারের চলন আর ভোজ দিবার ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যয় বাহুল্য। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদের শিরোভূষণ বলিয়া কিছুই ছিল না। কেবল বালিকা এবং যুবতীরা খোপা বাঁধিয়া তাহাতে বড় বড় রূপার পুঁটে লাগাইয়া দিত। এখন পুঁটের চলন নাই বলিলেই চলে। তাহার স্থানে পাথর বসান সিঁথী মধ্যস্থলে ধুকধুকী ঝুলিয়া কপালের উপর আসিয়া পড়ে, গুঁজীকাঠী, নানাপ্রকারের ফুল, চিরুণী, প্রজাপতি ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে এই সকল রূপার হইলে চলিত, এখন ঐ সকল পাথর বসান সোণার হওয়া চাই।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সোণামুখীতে এই কয় প্রকার রূপার অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত। যথা :—মস্তকের অলঙ্কার পুঁটে, গুঁজিকাঠীর মত কাঁটা তারা খোঁপার জন্য। অন্যান্য রূপার অলঙ্কার যথা :—বীর-বউরী, পদক ও বন্ধুক (ইহা সোণারও হইয়া থাকে- হরনাথ রূপার পদক পরিতেন), কেয়ূর বা বাজুবন্ধ বালা (ইহা সীসা ও পিতলের হয়), কোমরের গোট বা মেখলা, বাঁকমল, আঙ্গট বেঁকী, গুজরী, পঞ্চম, পাওড়া। আংটী, নথ, মাকড়ী, বেসর, নোলক বোন্দা, কর্ণফুল, মাদুলী, বাজু—এই কয়টী সোণার নির্ম্মিত হইত।

বিবাহ ইত্যাদি কার্য্যে বা অন্য কোন কারণে গ্রামান্তরে যাতায়াত জন্য গো-শকট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গো-শকট ছাড়া অন্য কোন প্রকার যান ছিল না ও এখনও নাই।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তির ভোজনের জন্য শালপাতা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সাধারণ সকলেই শালপাতায় আহার করিয়া থাকিতেন, এখন কাঁশার ও পিতলের

বাসন ব্যবহৃত হইতেছে। পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে "গুয়া পান" অর্থাৎ পান শুপারি, মাল্য ও চন্দন বিতরণের বিধি ছিল, কিন্তু আহার করার কথা থাকিত না।—যেমন বর্ত্তমানে শ্রাদ্ধের দিন সভার অধিবেশনে হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ভোজনের জন্য চিড়া, মুড়কি, মুড়ি গুড় রম্ভা, কাঁটাল, দুগ্ধ বা দধি দেওয়া হইত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয়বার বিবাহে গাত্রহরিদ্রা ও অধিবাসের দিন কেবল মালা, চন্দন, গুয়াপান বিতরণের উল্লেখ চৈতন্যভাগবতের আদি পর্ব্বে আছে।

১৭০০ খ্রীঃ হইতে সোণামুখী বা মল্লভূমে নানাপ্রকারের অত্যাচার যথা মারাট্টাদিগের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারী ও নীল কুটীর সাহেবদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও সমগ্র বঙ্গদেশের তুলনায় মল্লভূমি অষ্টম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পরম শান্তির স্থান ছিল—এইজন্য মল্লভূমিকে স্বর্গ বলিত। অষ্টম শতাব্দী হইতে ইংরাজদিগের আমল আরম্ভ পর্য্যন্ত মল্লভূমির রাজারা সকলেই ধার্ম্মিক হিন্দু ছিলেন, এইজন্য ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য জাতির লোকেরা এই মল্লভূমে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। নানা কারণে ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা এখন $\frac{১}{১০}$ একের দশম অংশও নাই।

মল্লভূমি ব্যতীত বঙ্গের অন্যান্য অংশে নিম্নলিখিত অত্যাচার ঘটিয়াছিল। কিন্তু মল্লভূমিতে এই সকল অত্যাচার ছিল না।

(১) মামুদ সরিফ ইত্যাদি মুসলমান ডিহিদারগণ পতিত ভূমি আবাদী বলিয়া লিখিয়া লইত ও ১৫ কাঠায় বিঘা ধরিয়া খাজনা আদায় করিত। খাজনা দিতে না পারিলে ধান, গরু, কুঁড়ে ঘর, লাঙ্গল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া লইত। ইহাতে খাজনা শোধ না হইলে গৃহস্বামীকে কয়েদ করা হইত ও যুবতী ভার্য্যা, পুত্রবধূ বা কন্যা থাকিলে মুসলমানদিগকে ৫।৭ টাকায় বিক্রয় করিয়া খাজনা ওয়াসিল করা হইত। এইভাবে প্রজাগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পাছে প্রাণটি লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া যায় এই জন্য কোটাল ও জমাদারগণ পথ অবরোধ করিয়া পাহারা দিত। দরিদ্র মুকুন্দরাম (কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী) সাত পুরুষ যাবৎ চাষাবাদ করিয়া দামুন্যায় বাস করিতেছিলেন; কিন্তু এই রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনি স্বীয় গ্রামে কোনরূপেই থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মুনিব গোপীনাথ নন্দী খাজনার দাবী পূর্ণ করিতে না পারিয়া বন্দী হইলেন, কবি মুকুন্দরাম গম্ভীর খাঁর সহিত যুক্তি করিয়া চণ্ডীগড়ের শ্রীমন্ত খাঁর সাহায্যে শিশু পুত্র, স্ত্রী ও ভ্রাতা রামানন্দের সহিত

পলাইয়া দেশত্যাগী হইলেন। ১৫৭৭ খ্রীঃ কবি দামুন্যা ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুরের অন্তর্গত আড়বা গ্রামে রাজা বাঁকুড়া রায় দেবের রাজত্বে আসিয়া বাস করেন।

(২। কাজির উপর ছিল বিচারের ভার, কাজির নীচে শিকদার, শিকদারের অধীনে দেওয়ান ছিল। দেওয়ানের কার্য্য ছিল খাজনা সংগ্রহ করা ও খাজনার হার নির্দ্ধারণ করা। এই দেওয়ানরা সর্ব্বপ্রধান দেওয়ানের নিকট খাজনার টাকা পোঁছিয়া দিত। ইহা ছাড়া কোটাল ছিল (Superintendent of Police) এই কোটালের অধীন দারগা ছিল। গ্রামের বা সহরের সকল সংবাদ দারগারা কোটালকে দিত। প্রতি গ্রামে একজন "মণ্ডল" নিযুক্ত থাকিত—এই "মণ্ডল" গ্রামের একরূপ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সকল কর্ম্মচারীরা সকলেই মুসলমান ছিল। ইহা ছাড়া বরকন্দাজ, পেয়াদা, নফর, নাজির, জুমলদার, সিকদার, হাবিলদার ইত্যাদি উপাধিধারী কর্ম্মচারীও ছিল।

দেওয়ানগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বৎসরে দুইবার খাজনা আদায় করিত। এই দেওয়ানগণের সঙ্গে বরকন্দাজ, পেয়াদা, নফর, হাবিলদার, জুমলদার, সিকদার ইত্যাদিতে ৩০।৩৫ জন লোক থাকিত। গ্রামে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের পুষ্করিণীর পাড়ে ছাউনি করিতেন। মুসলমান আইনের একটী ধারা এইরূপ ছিল:—"যদি কোন মুসলমান দেওয়ান হিন্দুর নিকট কর আদায় করিতে উপস্থিত হন, তবে সেই হিন্দুর সম্পূর্ণ নত হইয়া তাহা দিতে হইবে, অপিচ যদি মুসলমান দেওয়ান ইচ্ছা করেন যে কাফেরের মুখে থুথু প্রদান করিবেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুখ ব্যাদান করিয়া তাহা লইতে হইবে -ইহাতে তাহাদের ঘৃণায় বিন্দুমাত্রও কারণ নাই। এই থুথু প্রদানের কয়েকটা নিগূঢ় অর্থ স্বীকার করিতে হইবে ইহা দ্বারা সরকারের আশ্রিত কাফেরের সম্পূর্ণ বশ্যতার পরীক্ষা হইবে এবং একমাত্র ইসলাম ধর্ম্মের গৌরব ও মিথ্যাধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শিত হইবে।

"When the Collector of the Dewan asks them (the Hindoos) to pay the tax, they should pay it with all humility and submission and if the Collector wishes to spit into their mouths, they should open their mouths without the slightest fear of contaminations so that the Collector may do so. The object of such humiliation and spitting into their mouths is to prove the obedience of the infidel subjects under protection and promote if possible the glory of the Islam, the true religion

and to show contempt to false religions (Von Neor's Akbor, সম্রাট আকবর এই আইন রদ করিয়াছিলেন।

এই সকল মুসলমান দেওয়ান প্রতিগ্রামে ৮।১০ দিন করিয়া অপেক্ষা করিত। গ্রামের যুবতীগণের অব্যাহতি ছিল না। দেওয়ানগণের অবস্থান কালে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিত সুন্দরী যুবতী হইলে তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত। এদিকে কুলাচার্য্যের কার্য্য ছিল এই সকল দোষের কথা লিপিবদ্ধ করা। ব্রাহ্মণদিগের কুলের দোষ লিপিবদ্ধ হওয়াতে সহজে তাহারা কন্যাদের বিবাহ দিতে পারিত না।

(৩) ব্রাহ্মণের পৈতা দেখিলে, মাথায় শিখা, বৈষ্ণবের হাতে বা গলায় মালা, গৃহে গোময় লেপন, দেবদেবী বা শালগ্রাম শিলা পূজা হইলে নানা প্রকারের অত্যাচার হইত। সেই বাটীতে গরু কাটা হইত, মার ধর করা হইত ইত্যাদি ইত্যাদি। বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে এইরূপ আছে যথা ঃ—

"যাহার মস্তকে দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলায় বাঁধি লয় কাজির সাক্ষাৎ॥
কক্ষতলে মাথা থুইয়া বজ্র মারে কিল।
পাথর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বৈসে অতিশয়।
ঘরেতে গোময় না দেয় দুর্জ্জনের ভয়॥
বাছিয়া ব্রাহ্মণ পায় পৈতা যার কাঁধে।
পেয়াদাগণ নাগ পাইলে হাতে গলায় বাঁধে॥

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে সোণামুখীতে চুরি, ডাকাতি, বলাৎকার, পরস্ত্রী হরণ, খুন, জখম, দাঙ্গা হাঙ্গামা ইত্যাদি হইত না। পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে দেবতাদিগের মধ্যেও নানাপ্রকারের ব্যভিচার লক্ষিত হয়। তবে কি সোণামুখীর লোকেরা দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন? তাহা নহে; কদাচিৎ চুরি ইত্যাদি হইত, সাধারণতঃ এই সকল মন্দ কার্য্য ঘটিত না। তাহার কারণ বিষ্ণুপুরের রাজাদের শাসন এমন কঠোর ছিল ও শাস্তি এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে লোকে শাস্তির ভয়ে মন্দ কার্য্য করিতে সাহস করিত না।

"French traveller, Abbe Raynal, who visited the Bishnupore Government during the reign of Gopal Singh in 1712 says of what he saw—

"This fortunate spot which extends about a hundred and sixty miles is called Bissenpore. The singular situation of this country has preserved to the inhabitants their primitive happiness and the gentleness of their character, by securing them from the danger of being conquered or imbruing their hands in the blood of their fellow-creatures. Nature has surrounded them with water; and they need only open the sluices of their rivers to overflow the whole country. The armies sent to subdue them have so frequently been drowned, that the plan of enslaving them has been laid aside, that the projectors of it have thought proper to content themselves with an appearance of submission.

Liberty and property are sacred in Bissenpore. Robbery either public or private, is never heard of."

সোণামুখীর লোক কোন প্রকারের অন্যায় কার্য্য করিলে তাহাকে গ্রামের মণ্ডল, জমিদার বা ইজারাদারের নিকট চৌকিদার ধরিয়া আনিত, মণ্ডল তাহাকে ইন্দাসের সামন্ত রাজার নিকট প্রেরণ করিত, সামন্ত রাজা প্রাণদণ্ড ছাড়া অন্য প্রকারের সকল প্রকারের শাস্তি দিয়া অপরাধীকে ছাড়িয়া দিত'। অপরাধীকে জেলখানায় রাখার নিয়ম ছিল না। কেবল যাহারা খাজনা বা কর দিত না তাহাদিগকে জেলখানায় রাখা হইত এই জেলখানায় থাকা কালীন তার আত্মীয়েরা কর জমা দিলে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই জেলখানার ঘর ও আহার এত মন্দ ছিল যে খাজনা দিতে অসমর্থ কয়েদি দুই তিন মাস জেলখানায় থাকিলে মরিয়া যাইত।

মানব বা গো হত্যা, দুইবারের অধিক চুরি করা, ডাকাতি করা, পরস্ত্রী গমন, বলাৎকার, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়া ইত্যাদি অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত। এই সকল অপরাধীকে সামন্ত রাজারা বিষ্ণুপুরের রাজার নিকট বিচার জন্য প্রেরণ করিত। নিম্নলিখিত প্রকারের প্রাণদণ্ড হইত।

(১) ফাঁসি হইত—সাধারণ চলন পথের ধারে হাটের নিকট নদী বা পুষ্করিণীর ধারে কোন গাছের ডালে রজ্জু, রসি বা দড়ি বাঁধিয়া ফাঁস করিয়া তাহাতে অপরাধীকে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইত—ফাঁসি দিবার পূর্ব্বে অপরাধীকে

শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গ্রামে গ্রামে ঢাক বা ঢোল বাজাইয়া ঘোষণা করিয়া বেড়ান হইত, পরে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানের গাছে লটকাইয়া দেওয়া হইত। অপরাধী মরিয়া গেলেও তাহাকে গাছ হইতে নামান হইত না। গাছে থাকিয়া পচিয়া যাইত ও গাছতলায় তাহার কঙ্কাল পড়িয়া থাকিত।

(২) শূলে দেওয়া হইত—সাধারণতঃ শূল শাল কাঠের নির্ম্মিত হইত। লম্বায় ১৬।১৮ হাত এই শূল কাঠকে ৫।৬ হাত মাটিতে পোতা হইত। শূলকাঠের অগ্রভাগ সূচের ন্যায় সরু ও গোড়ার দিকে মোটা হইত। শূলকাঠকে গোল করা হইত। এইরূপ শূলকাঠ রাজ সরকারে তৈয়ারী করা থাকিত। শূলকাঠ মাটীতে পোতা হইলে মাচা বাঁধিয়া শূলকাঠে তেল ও ঘি মিশ্রিত করিয়া মাখান হইত। অপরাধীকে মাচায় উঠাইয়া হাত পিছন দিকে, দুই পা ও কোমরে খুব ভারি পাথর রজ্জুর সহিত বাঁধিয়া, অপরাধীর মলত্যাগের দ্বারে শূলের অগ্রভাগ স্থাপন করিয়া মাচা হইতে পাথর নিক্ষেপ করা হইত। পাথর নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে শূলের অগ্রভাগ মস্তক ভেদ করিয়া নির্গত হইত। শূলে বিদ্ধ হইলে তখনই মৃত্যু হইত না তিন চারি ঘণ্টা জীবিত থাকিত সে সময় তাহার হাত ও পা খুলিয়া দেওয়া হইত।

(৩) অনাহারে রাখা হইত—অপরাধীকে একটা ছোট ঘরে হাত পা বাঁধিয়া ঘরের মধ্যস্থলে খোঁটায় বাধিয়া রাখা হইত। ১৪।১৫ দিন ঘর বন্ধ থাকিত, মৃত্যু হইলে জঙ্গলে ফেলিয়া দেওয়া হইত। কখন কখন মাঠের মধ্যে হাত পা গাছের সহিত বাঁধিয়া রাখা হইত ও রাজার লোকেরা পাহারা দিত।

(৪) ক্রমশঃ হত্যা করা হইত—প্রথমে অপরাধীর দুই হাত কাটা হইত তাহাতে মৃত্যু না হইলে—দুই পা কাটিয়া দেওয়া হইত ইহাতেও মৃত্যু না হইলে, মস্তক কাটা হইত। কখন কখন সর্ব্বাঙ্গ খণ্ড খণ্ড করা হইত।

(৫) অপরাধীকে সর্পাঘাত করান হইত—পাছে একটা সর্পাঘাতে মৃত্যু না হয় সেইজন্য তিন চারিটা বিষাক্ত সর্পাঘাত করান হইত। কখন কখন বিষ প্রয়োগ করান হইত।

(৬) সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি জন্তুদের পিঁজরার মধ্যে নিঃক্ষেপ করান হইত। শিক্ষিত কুকুর দ্বারা জীবিত মানুষকে খাওয়ান হইত।

(৭) মাটীর ভিতর পুতিয়া ফেলা হইত বা ইটের দেওয়ালে গাঁথিয়া দেওয়া হইত। পাহাড় বা উচ্চস্থান হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইত ও জীবিত থাকিলে পাথর বা ইট মারিয়া হত্যা করা হইত।

(৮) হস্তি-পদতলে বা বোঝাই গাড়ির চাকায় দলিত করা হইত।

(৯) হাত পা বাঁধিয়া পাথরের সহিত নদীতে বা পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করা হইত।

(১০) অপরাধীকে মাঠের মাঝে হাত পা বাঁধিয়া রাখিয়া তীরন্দাজেরা তীর দ্বারা মারিয়া ফেলিত।

অপরাধ-বিশেষের নির্দ্দিষ্ট কোন প্রকারের শাস্তির বিধান ছিল না, রাজার খেয়াল মত কি প্রকারের মৃত্যু দণ্ড হইবে হুকুম দিতেন যাহাদের অপরাধে মৃত্যু দণ্ড না হইত তাহাদিগকে গ্রামের মণ্ডলরা বা সামন্ত রাজারা নিম্নলিখিত প্রকারের শাস্তি দিতেন।

(১) প্রথমবার চুরি অপরাধে, অপরাধীর এক কাণ কাটিয়া দেওয়া হইত। সামান্য সামান্য চুরি, আম, কাঁটাল ক্ষেতের, ফসল, তরিতরকারি, পুষ্করিণীর মাছ, কাপড় ইত্যাদি চুরি অপরাধে উক্ত প্রকারের শাস্তি দেওয়া হইত।

রাত্রে সিঁদ দিয়া চুরি করা অপরাধে এক হাত কাটিয়া দেওয়া হইত। এইরূপ ব্যক্তি পুনরায় চুরি করিলে অন্য কাণ বা হাত কাটিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু রাজার জন্য যুদ্ধে পা, হাত বা কাণ কাটা যাইলে তাহারা রাজার সার্টিফিকেট পত্র পাইত।

(২) প্রবঞ্চনা করা অপরাধে—নাক কাটিয়া দেওয়া হইত।

(৩) দুধ, ঘৃত বা কোন খাদ্য দ্রব্যে অন্য কিছু মিশাইলে বেত্রাঘাত করা হইত।

(৪) ব্রাহ্মণকে কটু কথা বলা অপরাধে বা মারামারি করা অপরাধে—মস্তক মুণ্ডন করাইয়া মুখে চূণ কালি মাখাইয়া সাতদিন ভিন্ন ভিন্ন হাটে ঘুরাইয়া বেড়ান হইত।

(৫) কোন রমণী ভ্রষ্টা হইলে পুরুষের প্রাণদণ্ড হইত ও ঐ রমণীর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া—হাটে হাটে ঘুরাইয়া বেড়ান হইত ও সামান্য মূল্যে হাড়ি, ডোম, কাওরা ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর লোকদের নিকট বিক্রয় করা হইত। এই সকল স্ত্রীলোকদিগকে বেশ্যা বৃত্তি করিতে বাধ্য করা হইত বা কাওরা পুরুষকে বিবাহ করিতে হইত।

(৬) ডাকাতের দলের সর্দ্দারের প্রাণদণ্ড হইত—সঙ্গীদের অন্ধ করিয়া দেওয়া হইত।

(৭) যে, গ্রামের লোকের সহিত কলহ করিত তাহাকে সেই গ্রাম হইতে

তাড়াইয়া দেওয়া হইত। নূতন গ্রামে গিয়াও কলহ করিলে—তাহাকে মল্লভূমি হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইত।

(৮) অর্থ বা শস্য কর্জ্জ করিয়া পরিশোধ না করিতে পারিলে তাহার ঘর গরু ইত্যাদি বিক্রয় করা হইত। ইহাতে ঋণ শোধ না হইলে বিনা পারিশ্রমিকে পাওনাদারের নিকট মজুরের কাজ করিতে হইত। কতদিন কাজ করিতে হইবে গ্রামের মণ্ডল নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। পুত্র, কন্যা পরিবারবর্গকে ঋণ পরিশোধ জন্য কামিনদারের বা মজুরের কাজ করিতে হইত।

উপরোক্ত প্রকারের শাস্তি দেওয়া ছাড়া লোহা পুড়াইয়া বা তামাক খাওয়া কলিকা পুড়াইয়া পাছায় দাগ দেওয়া হইত, হাতের আঙ্গুল হাতুড়ির দ্বারা ছেঁচিয়া দেওয়া হইত, আঙ্গুলের নখের মধ্যে বেল কাঁটা বিদ্ধ করা হইত। এইরূপ নানা প্রকারের শাস্তি দিবার ব্যবস্থা ছিল।

এই সকল কারণে সোণামুখীর লোকেরা বা মল্লভূমের কেহ কোন প্রকার অন্যায় কাজ করিতে ভয় পাইত। অবশ্য মুসলমান রাজত্বে ইহা ছাড়া আরও অনেক প্রকারের শাস্তি হইত। যথা—জীবন্ত মানুষের ছাল ছাড়ান হইত, ইন্দারায় বা কূপে নিক্ষেপ করিয়া পাথর দিয়া কূপ পূর্ণ করা হইত, ইত্যাদি ইত্যাদি।

নবম পরিচ্ছেদ

উপসংহার

"অমিয় হরনাথ লীলা কথা"র প্রথম ভাগ, ভূমিকা অংশ সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে লেখকের একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। ঠাকুর হরনাথ বুঝিয়াছিলেন যে তাঁর অনুগত ভাগবত, তাঁর জীবনচরিত নিশ্চয়ই লিপিবদ্ধ করিবে; তাই তিনি তাঁর কাশ্মীর অবস্থান কালে স্বহস্তে তাঁর জীবনীর অনেক ঘটনা যখন যেমন স্মরণ হইত, বা ভাগবত মিত্র অনুরোধ করিলে পত্র দ্বারায় লিখিয়া পাঠাইতেন। অনেকে

তাঁর মুখে তাঁর জীবন কাহিনী শুনিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, তাঁর নিজ জীবন কাহিনী স্বহস্তে বর্ণনা করিয়া আর কাহাকেও তিনি পত্র লেখেন নাই। এইরূপ জীবনী পত্র হরনাথ যদি আর কাহাকেও লিখিয়া থাকেন ইহার বিষয় জানিতে পারিলে আমার এই ভ্রান্ত ধারণা সানন্দে সংশোধন করিব ও কৃতার্থ হইব। নিম্নে এইরূপ পত্রের নমুনা দিলাম।

[illegible]

ঠাকুর হরনাথের স্বহস্ত লিখিত পত্রের সরলপাঠ

স্নেহের ভাগবত—

বাবা তোমার পত্র পেলাম বাবা মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বে জীব বেশ স্থির হয় কোন কিছু সুখ দুঃখ পার্থীর মনে করিতে পারে না বলেই মনে হয় এই বিষয়ের ঠিক সংবাদ কে দিতে পারে বাবা। ওকথা কেন আমায় বার বার জিজ্ঞাসা কর। বাবা যার ফাঁসী হয় ফাঁসী হবার আগে তার কত কি ছটফটানী হয় তারপর যখন তাকে ফাঁসী কাঠে তুলা হয় তখন তার প্রাণে একটা কেমন শান্তি আসে তখন তার ভয় হয় না কোন আশাতেই তাকে যাতনা দেয় না বলেই মনে হয়— সেই রকম মৃত্যুর সময় আর কোন চিন্তা তাকে কষ্ট দেয় না তখন কেমন একটা শান্তি এসে যায় বলেই মনে হয় তবে ঠিক কি তা কে জানে বাবা।

বাবা আমি ৩ বার B. A. Examination দিয়াছিলাম লক্ষবার পরীক্ষা দিলেও আর pass করিতে পারিতাম না কারণ তখন আমার প্রাণ পৃথিবীর কোন কিছুতেই মজিত না। তখন পৃথিবীটা একটা অপূর্ব্ব ছায়াবাজী বলেই মনে হইত তখন প্রাণটী যা ধ্রুব সত্য তাতেই মজে থাকিতে চাহিত এবং থাকিত। বাবা সে সময়ের কথা মনে হলেও প্রাণে অপার আনন্দ পাই সেই পীরিতের পূর্ব্বরাগ তাই এত মধুর মনে হইত। তখন বিবাহ হইয়াছিল যে বৎসর B A দিই সেই বৎসর বোধ হয় অনুর জন্ম হয় বাবা আমার কোন সময়ই ঠিক মনে থাকে না। 1889এ প্রথমবার B. A. দিই 90তে দিই, তারপর এক বৎসর বাড়ীতে বসে থাকি আবার জোর করে পড়িতে দেয় আবার B. A. দিই 1892 তারপর 1893 শেষে কাশ্মীর যাই বাবা কাশ্মীরও আমায় কেউ নিয়ে গিয়েছিল।

আমার গ্রামেই মামার বাড়ী যে পাড়ায় তোমাদের মামা বাড়ী আমারও সেই পাড়ায় উজ্জ্বল তর্কালঙ্কারের বংশে আমার মাতামহের নাম স্বর্গীয় কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমি বাল্য জীবনের অনেক সময় মামা বাড়ীতেই কাটাইতাম। আমার এখন মামীও ২টী মামাত ভাই একটী ভগিনী জীবিত আর ২ জন খুড়তাত মামা জীবিত আছেন। বাবা ও সকল কথা কেন আর মনে করে দাও। আমার পিতা যে কোন সালে খেলা শেষ করেছেন বলিতে পারি না তবে অনুমান ১২৭৫ কি ৭৬ সালে- দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলে

ঠাকুর হরনাথের স্বহস্ত লিখিত পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

ঠাকুর হরনাথের স্বহস্ত লিখিত পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার সরল পাঠ

যদি বলিতে পারেন তাঁকে একখানা reply card লিখিলে সকল জানিতে পারিবে। বাবা কলিকাতায় ৭নং Bysack's Lane এ আমার এক খুড়ার গালার আড়ৎ ছিল প্রথমবার সেইখানে থাকিয়া B. A. দিই প্রথমবার, Chorebagan Banstalaর গলির ৪০ কি ৪১ মনে নাই নিমু কুণ্ডুর গালার আড়তে যাদের সঙ্গে আমাদের কারবার চলিত সেইখানে থাকিয়া B. A. দিই আর একবার শেষবার আমাকে Baranoshi Ghoseএর Streetএ প্রতাপ রায় কি মজুমদার মনে নাই তাদের একটা বাড়ীতে mess করে থাকি।

এইভাবে কলিকাতার জীবন শেষ করে চাকরী জীবন লই। যখন Baranoshi Ghose's Streetএ mess করে'ছিলাম তখনকার একটী friend Radha Gobinda Biswas এখন Bankuraতে খ্যাতনামা উকিল তিনি তখন B. L. পড়িতেন। কলেজে পড়িবার সময় আমি কারও সঙ্গে কথা কহিতাম না এইজন্য এত দিনের মধ্যে আমার একটীও বন্ধু থাকে নাই। এও একটা মজার কথা। তখন ছুটি হলেই বাড়ী আসিতাম।

বাবা ও সকল কথা আমাকে লিখিয়া আমার মনকে আর বিচলিত করিও না। তোমরা যা পার কর। তোমার মার অসুখ কেমন আছে বৌমা কেমন আছে। বাবা নাগপুর প্রভৃতি কোন কোন স্থান হতে পুস্তকের তাগিদ স্নেহময় শরৎ বাবার নিকট আসিয়াছে, শরৎ বাবা আজকাল বড় কাতর আর নাগপুরের বাবারা তেমনই পুস্তক পাবার জন্য কাতর, তাই বলি একবার যেয়ে যাতে পুস্তকগুলি যায় করিয়া আসিও।

তোমার স্নেহের

হর।

ইহা ব্যতীত তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর শিবনারায়ণ লিখিত ২২খানা। প্রত্যেকটি চারি পৃষ্ঠা ব্যাপী লেখা) পত্র আছে। শিবনারায়ণ ও হরনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী কমলা দেবী যিনি শিবনারায়ণ ও হরনাথকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন ও হরনাথের অন্তর্ধানের দুই বৎসর পরে দেহ রাখিয়াছেন, তিনি আমাকে হরনাথের বাল্য জীবনের অনেক কথা বলিয়াছেন, ঐ সকল বর্ণনা আমি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। জীবনের অনেক কথা অর্থে কেহ যেন না বুঝেন যে এই কথাগুলি কেবল অসার মিথ্যা অলৌকিক ঘটনার কথা। একটীও অলৌকিক ঘটনার কথা কমলার নিকট হইতে অবগত হই নাই। তিনি পড়িতে লিখিতে জানিতেন না, ছল চাতুরী শূন্য সরল-প্রকৃতির গ্রাম্য স্ত্রীলোক তাঁর বর্ণনাগুলিকে আমি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। জয়রামের বন্ধু ও ব্যবসায়ের অংশীদারগণের বংশধরগণের নিকট অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি।

ঠাকুর হরনাথের পিতা জয়রামের স্বহস্তের লিখিত হিসাবের খাতা হরনাথের অভ্রান্তভাবে বাল্য জীবনী লেখার প্রধান সহায় হইয়াছে। হরনাথের জন্মের ২০ বৎসর পূর্ব্বে কোনদিন এক পয়সার মাছ তরিতরকারি বাবদ খরচ হইত ৩।৪ দিন কোন খরচ হইত না। অর্থাৎ এক মাসে আট পয়সা বা দশ পয়সা খরচ হইত। হরনাথের জন্মের ৫।৬ বৎসর পূর্ব্ব হইতে কোন দিন এক পয়সা তৎপর

দিন দুই পয়সার বাজার খরচ হইত এই প্রকার হিসাব খাতায় লেখা আছে। নিম্নে ১২৭০ সালের জয়রামের হিসাবের খাতার একখানি পাতার ফটো প্রদত্ত হইল। অর্থাৎ হরনাথের জন্মের দুই বৎসর পূর্ব্বের হিসাবের খাতার পাতা দেখান হইল।

ঠাকুর হরনাথই সর্ব্ববিষয়ে তাঁর জীবনী সংগ্রহের পরম সহায় হইয়াছিলেন। তিনিই আমাকে অযোধ্যায় মাষ্টারি করার ফটো, ১৯০৪ খ্রীঃ শ্রীনগরের ফটো, হাতরাসের ফটো, হাতে জপের মালা ও গলায় মালা ফটো, রাণাঘাটের হেম ঘোষের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। শেষোক্ত এই ফটো খানির ব্লক করিয়া পাগল হরনাথ পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে একবার ছাপা হইয়াছিল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, ৭।৮ বৎসর বয়সে সোণামুখীতে কলিকাতার কোন ফটোগ্রাফার ছবি তুলিয়াছিল ও ১৮৮৭ সালে বর্দ্ধমান রাজ কলেজে পড়ার সময় একখানি ফটো লওয়া হয়। ইহার পর অযোধ্যার ফটো লওয়া হয়।

আমি বর্দ্ধমানের ফটো সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, কিন্তু ৭।৮ বৎবর বয়সের ফটো সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

এই ফটো ছাড়া আর একটী জিনিষ ঠাকুরের জন্ম-কোষ্ঠী সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ঠাকুরের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে ভাগবতের নিকট যেন তাঁর কোষ্ঠীটি পৌঁছায়। এখন বুঝিতেছি যে এই কোষ্ঠীটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আড়বেলিয়া নিবাসী স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মিত্র, যিনি কটকের সবজজ ছিলেন—তাঁর সহোদর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিষ্ণুপুরের Inspector of Police ঠাকুরের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি পুস্তক লিখিবেন বলিয়া ঠাকুরের বড় ভাই শিবনারায়ণের নিকট হইতে এই কোষ্ঠীটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঠাকুর জানিতে পারিয়া সুরেন বাবুকে বলেন "বাবা এই কোষ্ঠীটি ভাগবতকে দিব ঠিক করিয়াছিলাম, যত শীঘ্র পার ইহা ভাগবতকে দিও"। দুই বৎসর যাবৎ এই কোষ্ঠীটি ফেরৎ না দেওয়াতে—ঠাকুর আমাকে পত্র দ্বারা কেবল তাগিদ করিতে বলেন। আমি তাঁকে পত্র লেখাতে কেবলই শীঘ্রই পাঠাইব লেখেন। শেষ পত্রের উত্তর দেন, পুস্তক লেখা না হইলে কোনরূপে কোষ্ঠী ফেরৎ দিবেন না—ইহাতে লাঠালাঠি করিতে হয় করিবেন। এই পত্রখানি ঠাকুরকে দেখাইয়াছিলাম ঠাকুর বলেন, "তাঁর পুস্তক লেখা হইবে না—ইহা নষ্ট হইল, জানিয়া রাখ ও আর পত্র লিখিও না"। ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর, তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন—তখন আবার তাঁকে কোষ্ঠীর কথা লিখি, পত্রের উত্তর পাই নাই। এই রোগে তাঁর মৃত্যু হইলে তাঁর পুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত মাধবপ্রসাদ মিত্র (উপস্থিত তিনি বাঁশবেড়িয়ার জুট মিলের এসিস্টাণ্ট মেডিক্যাল অফিসার) তাঁকেও এই কোষ্ঠীর কথা লিখিয়াছিলাম পত্রের উত্তরে তিনি জানান, "এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে স্থান পরিবর্ত্তনের সময় এই কোষ্ঠী কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। ঠাকুর তাঁর অন্তর্ধানের ৭ বৎসর পূর্ব্বে যে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন তাহা এখন সত্য হইয়াছে, যথা "সুরেন বাবুর কোন পুস্তক ছাপান হইবে না ও কোষ্ঠীটি হারাইয়া যাইবে"। সেই সময় হরনাথের এই কথাগুলির কোন মূল্য ছিল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই।

শাণ্ডিল্য বংশাবলী অনুসন্ধান করিতে আমার তিন বৎসর সময় লাগিয়াছে। বাইবেলে লিখিত যীশুখৃষ্টের বংশলতার ন্যায় হরনাথের বংশাবলী অনুসন্ধান করিবার প্রথম আকাঙ্ক্ষা হয়। ২২শ পরিচয়ের বিশ্বেশ্বর পর্য্যন্ত বাহির করি ও ৩৪পঃ রামমুরলী হইতে ৩৯ পরিচয়ের হরনাথের সন্ধান পাই। ২৩পঃ হইতে

৩৩ পরিচয়ের কোন সন্ধান করিতে পারি নাই। কারণ ২২ পরিচয়ের বিশ্বেশ্বর কুলভঙ্গ করেন। কুলীনদিগের নাম ব্যতীত ভঙ্গদিগের নাম কুলাচার্য্যগণ কুলগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমি একেবারে হতাশ হইয়া পড়ি—দুঃখে ও ক্ষোভে জীবনী লেখা বন্ধ করিয়া দিই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একরাত্রে স্বপ্ন দেখি, কে যেন স্বপ্নে বলিতেছেন—"তোমার হতাশ হইবার কোন কারণ দেখি না। কলিকাতায় এত library থাকিতে চেষ্টা না করিয়া মূর্খের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছ—একবার সন্ধান করিয়া দেখ, কৃতকার্য্য হইবে। ১০।১১টা লাইব্রেরী অনুসন্ধান করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ হয়। ইহাতে আমার প্রাণে পরম শান্তি আসিয়াছে এখন আমার অনুমান হইতেছে যে এ বৃদ্ধ বয়সে পাগল বাবার জীবনী লেখা শেষ করিতে পারিব। ১৯২৩ খ্রীঃ ৩৫ পরিচয়ের নিম্নতর বংশাবলীর তালিকা ঠাকুরকে দিয়াছিলাম ; তাহাতে তিনি বলেন, "তুমি একটী মহৎকার্য্য করিলে, বিবাহাদির সময়ে পিতৃপুরুষগণের নাম উল্লেখ করিতে পারিতাম না, সে ক্ষোভ তুমি পূরণ করিলে।" আজ তিনি জীবিত থাকিলে তাঁর হাতে এই বংশাবলীর তালিকাটী দিতে পারিলে কৃতার্থ হইতাম। তিনি প্রীত হইয়াছেন জানিয়া আরও ঊর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষগণের নাম অনুসন্ধান করিতে বিরত ছিলাম। পরে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় এ কার্য্য আরম্ভ করি। এই অনুসন্ধান কার্য্য শেষ হইলে আমার মনে হইল যে অপরের লেখার উপর আমি ভিত্তি স্থাপন করিয়াছি ; যদি পুস্তক লেখকের ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে সকলই বৃথা হইল। কুলাচার্য্যগণের শ্লোকে ভ্রম আছে কিনা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় অনেকের সহিত আলোচনায় রত হই। নিম্নে একটী মাত্র উদাহরণ দিলাম।

"সোণামুখীর প্রাচীন কথা" অষ্টম পরিচ্ছেদে সোণামুখীর সিদ্ধান্তপাড়া নিবাসী গদাধর শিরোমণির উল্লেখ করিয়াছি। তাঁর বংশ অতি প্রাচীন। তিনি বাৎস্য গোত্র ও পুতিতুণ্ড গাঁঞি ছিলেন। বাৎস্য গোত্রে চক্রপাণি জন্মগ্রহণ করেন। চক্রপাণির পুত্র ভূধর, তৎপুত্র প্রভাকর, তৎপুত্র সুরাই, তৎপুত্র শিবানন্দ, তৎপুত্র গোপাল, তৎপুত্র মকরন্দ, তৎপুত্র অরবিন্দ, তৎপুত্র সুবুদ্ধি রায় (ঘটক সিংহ), তৎপুত্র নারায়ণ রায় (কবিচন্দ্র), তৎপুত্র বৈষ্ণবদাস (চক্রবর্ত্তী) সোণামুখীতে বাস, তৎপুত্র শচীনন্দন (বিদ্যাবাগীশ), তৎপুত্র চৈতন্যচরণ (সার্ব্বভৌম), তৎপুত্র গদাধর শিরোমণি, তৎপুত্র বিশ্বম্ভর বিদ্যাভূষণ (অপুত্রক)। এই বিশ্বম্ভর বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোণামুখীর বাবু পাড়ার বিখ্যাত বৈষ্ণব জমিদার শ্রীযুক্ত তিনকড়ি

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতামহ। এই তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শাণ্ডিল্য-গোত্রীয়। ইঁহার নিকট ঠাকুর হরনাথের বংশাবলীর তালিকা লইয়া গিয়া আলোচনা করি। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলেন ১৩ পরিচয়ের হরি বন্দ্যোর নাম পর্য্যন্ত পাইয়াছেন ও গত ২০ বৎসর যাবৎ অনুসন্ধান করিয়া তাঁর বংশ-লতার উদ্ধার করিতে পারেন নাই তিনকড়ি বাবু ঠাকুর হরনাথের বংশাবলী দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হন ও তাঁর বংশাবলীর উদ্ধার করিবার জন্য অনুরোধ করেন ও কলিকাতায় আমাকে যে পত্র লেখেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সোণামুখীর পরম ধার্ম্মিক বৈষ্ণব কুলতিলক জমিদার শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বংশাবলী সম্বন্ধে যে পত্র লেখেন তাহার নকল দিলাম।

শ্রীশ্রীহরি শরণং — সোণামুখী ১০—২—৩৭

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভাগবত মিত্র

কল্যাণবরেষু

আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার ৬ই তারিখের পত্র এবং বুক পোষ্টে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বন্দ্যঘটী বংশাবলীর তালিকা যথাসময়ে পাইয়াছি। আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়া তালিকাটী সংগ্রহ করিয়া পাঠানর জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। এই তালিকাটী আমার বিশেষ উপকারে আসিবে। আপনার বিপুল সংগ্রহ তজ্জন্য অনুরোধ যদি সুযোগ ও অবকাশ মত কেশরের পুত্র হরিরামের বংশাবলী সংগ্রহ করিয়া দেন তাহা হইলে বড়ই উপকৃত এবং বাধিত হইব।

সোণামুখী Municipal townএর mapএর true copy করাইয়াছি, আপনার আদেশ পাইলেই পাঠাইয়া দিব। সে জন্য যাহা খরচ হইয়াছে তাহা আপনাকে দিতে হইবে না।

সোণামুখীর প্রাচীন কথা লিখিবেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। আশাকরি তাহাতে আদি কথক পরম ভাগবত স্বর্গীয় গদাধর শিরোমণি ও তৎপুত্র ৺বিশ্বম্ভর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উল্লেখ থাকিবে।

আশা করি কুশলে আছেন। অপর মঙ্গল ইতি

বশংবদ শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

পূজনীয় শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বাবুর শেষোক্ত আদেশ পালন করিবার শক্তি প্রভু আমাকে দিয়াছিলেন ও ঐ বংশ তালিকাটী পাঠাইলে তিনকড়ি বাবু পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। তিনকড়ি বাবু তাঁর নিজ ব্যয়ে সোণামুখী Municipal town এর map পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁর নিকটে আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম ও চিরতরে তাঁর চরণে ক্রীতদাস হইয়া রহিলাম।

যে কোন সাধু মহাপুরুষের জীবন চরিত পাঠ করিলে দেখিতে পাই যে তাঁর শিষ্য, সেবকগণ ঐ মহাপুরুষদিগকে অবতার না বলিয়া, স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম আসিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ণব্রহ্ম হইতে এক ধাপ অবতরণ করিলে তাঁকে অবতার বলা হয়। অনুরক্ত শিষ্যগণ তাঁহাদিগের গুরুকে ষোলকলায় পূর্ণ পরমব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করেন। কে পূর্ণব্রহ্ম বা কে অবতার—ইহার সম্বন্ধে নানাপ্রকারের মতভেদ আছে। নিম্নে তাহার বিবরণ দিলাম।

(১) হিন্দুদিগের ভিতর এক শ্রেণীর ভক্ত আছেন যাঁহারা এক শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ষোলকলায় পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন না। ষোলকলা হইতে এককলা ন্যূন হইলে তিনি হইবেন "অবতার"। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর সকলকেই অবতার বলিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের যুক্তি সচ্চিদানন্দ চিন্ময় বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি। সচ্চিদানন্দ চিন্ময় বিগ্রহ মানব-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিলেও তিনি জগতের কোন অসৎ, পরিবর্ত্তনশীল ইত্যাদি কোন পদার্থই উপভোগ করেন না। আমাদিগের দৃষ্টিতে জগতের যে সকল অসৎ পদার্থ উপভোগ করিতে দেখি প্রকৃত জ্ঞান দৃষ্টিতে ঐগুলি অসৎ পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি চিন্ময় পদার্থ ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন যশোদার স্তনের দুগ্ধ যাহা শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে পান করিয়াছিলেন ঐ দুগ্ধ জগতের পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় পদার্থ উপভোগ করিয়াছিলেন।

ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি ও মৃতদেহের সৎকার অর্জ্জুন করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে উল্লেখ আছে, তাহা স্বীকার করেন না। চিন্ময় বিগ্রহ অদৃশ্য হইবে বা বাতাসের সহিত মিশাইয়া মানব চক্ষের অগোচর হইবেন বলিয়া থাকেন।

(২) অন্য এক শ্রেণীর বৈষ্ণব ভক্ত আছেন যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ষোলকলায় পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন ও সেই সঙ্গে নবদ্বীপের চৈতন্য মহাপ্রভুকেও ষোলকলায় পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। আর সকল বিগ্রহকেই অবতার

বলিয়া থাকেন। ইঁহারাও শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ প্রভু বা টোটা গোপীনাথের অঙ্গে মিলাইয়া গিয়া মানব চক্ষের অগোচর হইয়াছেন বলিয়া থাকেন।

(৩) আর এক শ্রেণীর ভক্ত আছেন যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ও তাঁহাদিগের গুরুকে ষোলকলায় পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া থাকেন বা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহাদিগের গুরুকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নচেৎ তাঁহাদিগের গুরুগণকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করা বিষয়ে ভিত্তিশূন্য হইয়া পড়ে। এই জন্যই তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেবকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছে এই দুই বা তিন মূর্ত্তি ছাড়া আর সকল মূর্ত্তিগুলিই অবতার বিগ্রহ বলিয়া থাকেন।

(৪) হিন্দুদিগের ভিতর আর এক থাক ভক্ত আছেন যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি কাহাকেও ষোলকলায় পূর্ণব্রহ্ম বলেন না। সকল গুলিকেই অবতার বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন একমেবাদ্বিতীয়ম্ নিরাকার ব্রহ্মের যখন জগতে আসিয়া কোন রূপ গ্রহণ করিতে হইলে একধাপ নামিয়া আসিতে হয়। আবার অন্যান্য ভক্ত বলিয়া থাকেন যে নিরাকার ব্রহ্মকে চারি ধাপ নামিলে তবে তিনি ব্রহ্মাণ্ডে আসিতে পারেন। ইহাই তাঁর নিয়ম এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিবার তাঁর শক্তি থাকিলেও তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। যথা প্রথম ধাপ—তাঁহাকে গর্ভোদশায়ী নারায়ণ হইতে হয়—দ্বিতীয় ধাপ কারণোদশায়ী নারায়ণ তৃতীয় ধাপ—ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ তৎপরে তিনি বিশিষ্ট কোনরূপ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে আসিতে পারেন। অতএব যে কোনরূপ গ্রহণ করিতে হইলে পরমব্রহ্মকে অবতরণ করিতে হয়—এই নিয়মের অন্যথা নাই।

(৫) আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা বলেন সকলেই সমান সকলেই অবতার ইহার তারতম্য নাই। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মানব ইত্যাদি প্রত্যেক অবতারের কার্য্যের সহিত অন্য অবতারের কার্য্যের সহিত তুলনা করিলে বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এইজন্যই আমরা একজনকে ঈশ্বর অবতার আখ্যা দিয়া থাকি, অন্যগুলিকে জীব বা পাপী বলিয়া থাকি। আমাদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইলেও সকলেই সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের অবতার সকলেই শ্রীগোবিন্দের অবতার বলিয়া তাঁহাদিগের মুখের গঠন, স্বর, হাব, ভাব ভিন্ন ভিন্ন, কখন এই অবতারের পুনরাবৃত্তি হইবে না অতএব এক হাজার বা দুই হাজার ঈশ্বর অবতার

আসিয়াছিলেন ইহার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। পরমব্রহ্ম প্রতি মুহূর্ত্তে অনন্ত কোটী অবতার রূপ গ্রহণ করিতেছেন ও করিবেন। ইহাই ব্রহ্মের বহু হইবার ইচ্ছা।

উপরোক্ত পাঁচ প্রকারের মত ব্যতীত আরও অনেক প্রকারের মত আছে যথা চার্ব্বাক ইত্যাদির মত। এই সকল মত আলোচনা করিলে ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় "ঘটে ঘটে বিরাজে রাম," "যেই জীব সেই শিব," "Ye are the temples of God" সকলেই অবতার তবে কোন অবতারের স্তাবক বা পূজাকারী ভক্ত আছেন, অন্য অবতার মূর্ত্তির পূজাকারী ভক্ত নাই। যাঁহার যত স্তাবক সংখ্যা বেশী তিনি তত বড় অবতার। মূলতঃ কোন অবতার মূর্ত্তির স্তাবক থাকুক আর নাই থাকুক, প্রভেদ নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না। পরমব্রহ্ম অবতরণ করিয়া অবতার হইলে যে শ্রেণী বা বিভাগে অবতরণ করেন সেই শ্রেণীর দোষগুণ লইয়া আসিতে হয়। অবতরণ অর্থ উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে নামিয়া আসা নহে, ব্রহ্ম ছিলেন নিরাকার রূপে, পর মুহূর্ত্তে সাকার হইলেন ইহাই তাঁহার অবতরণ। ব্রহ্ম অবতরণ করিয়া মানব অবতার গ্রহণ করিলেই কামনা ও ঈর্ষ্যা, সুখ ও দুঃখ লইয়া আসিতে হইবেই ইহার অন্যথা নাই। সুখ প্রাপ্তির কামনা, দুঃখ ভোগে বিদ্বেষ বা ঈর্ষ্যা, আত্মভ্রান্তি ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকিবেই থাকিবে. এইরূপ কামনা, ঈর্ষ্যা, ভ্রান্তি ইত্যাদির বর্ণনা যে অবতারের জীবনীতে দেখা যায় না, সেখানে বুঝিতে হইবে যে ঐরূপ জীবনী লেখার মধ্যে লুকোচুরি আছে। কোন সাধু মহাপুরুষের জীবনী লিখিতে গেলে মহাপুরুষগণের সেবক ও শিষ্যগণের প্রধান কার্য্য হয় তাঁহাদিগের গুরুকে অবতার বলিয়া বর্ণনা করিবার জন্য ঐ সকল বিষয় গোপন করিয়া ফেলা।

অবতার, সাধু, মহাত্মাগণের জীবনীতে কেবল সদ্গুণেরই উল্লেখ দেখিতে পাই, ইহাই জীবনী লেখার সাধারণ নিয়ম। লেখকগণ একটীও দোষের উল্লেখ করেন না। জীবনী লেখক যে সমাজভুক্ত সেই সমাজের লোকেরা যেগুলিকে দোষ বলিয়া জানেন, সত্যই সেগুলি অপর সমাজের লোকের নিকট গুণ বলিয়া ধারণা থাকিলেও, লেখক সেগুলিকে গোপন করিয়া থাকেন। লেখক যখন তাঁর আরাধ্য দেবতাকে ষোলকলায় পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন তখন যে সকল সত্য ঘটনা তাঁর প্রমাণের অন্তরায় হইবে সেগুলিকে জানিয়া শুনিয়া তিনি এড়াইয়া যান। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর তাঁর দেহকে অর্জ্জুন সংকার করিয়াছিলেন, এই সকল বিবরণ পুরাণে উল্লেখ

াকিলেও যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ষোলকলায় পূর্ণত্বে বিশ্বাস করেন তাঁহারা পুরাণের এই সৎকারের বর্ণনাটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া থাকেন। আবার গৌরাঙ্গদেবের সমুদ্রে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলে দোষ ঘটে বলিয়া কেহই সমুদ্রের কথা উল্লেখ করেন নাই। কেহ জগন্নাথদেবের সহিত, কেহ টোটা গোপীনাথের সহিত গৌরাঙ্গদেব মিশিয়া গিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আমি পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবকে (জন্ম ১২৪২, ৬ই ফাল্গুন বুধবার, মৃত্যু ১২৯৩, ৩১শে শ্রাবণ রবিবার) তিনবার স্বচক্ষে দেখিয়াছি. প্রথমবার যখন দেখি তখন আমার বয়স ৬ বৎসর অর্থাৎ ১২৮৪ সাল। তখন পরমহংস দেবের বয়স ৪২ বৎসর। ইহার পর আরও দুইবার দেখিয়াছি। পরমহংসদেব যখন কাশীপুরের বাগানে দেহত্যাগ করেন তখন ভক্তগণ সকলে বরাহনগর কুটিঘাটের লাইব্রেরীতে স্থান পান। মহাত্মা মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারা স্থাপিত Metropolitan Branchএর হেড মাষ্টার ছিলেন। গুপ্ত মহাশয়ের নিকট পড়িতাম। প্রতি রবিবার তাঁর সহিত বরাহনগর পরে আলমবাজার যাইতাম। বরাহনগরে কাহাকেও গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিতে দেখি নাই। তখন কালী, শশী. সারদা, গঙ্গা, নরেন, বাবুরাম ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিতে শুনিয়াছিলাম। তখন পরমহংস দেব সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিয়াছি এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণনা পুস্তকে পড়িয়া থাকি। মার (পরমহংসদেবের স্ত্রীর) কথা পড়িয়া চিত্রকরের চিত্র নৈপুণ্য দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। উপরোক্ত সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া হরনাথ জীবনচরিত চিত্রিত হইতেছে।

ঠাকুর হরনাথের পিতা জয়রামের ও মাতা ভগবতী দেবীর সম্বন্ধে সকল প্রকারের গুণের কথাই উল্লেখ করিয়াছি। তবে কি তাঁদের চরিত্রে সামান্য মাত্রও দোষের চিহ্ন ছিল না? জয়রাম সম্বন্ধে একটী কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয় নাই। তিনি বেলিয়াড়া গ্রামে সন্ন্যাসী আগমনের পূর্ব্বে আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হন নাই। জয়রাম মাতুলদিগের দামোদর শালগ্রাম শিলা পূজা করিতেন। এই পূজা শেষ করিতে তিন ঘণ্টার উপর সময় লাগিত, ইহাতে বাড়ীর সকলে বিরক্ত হইয়াছিলেন। জয়রামের মাতা ও মাতুল ইত্যাদি সকলে দেখিয়াছিলেন যে জয়রাম পূজা করিতে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। এই কারণে তাঁহারা জয়রামের পূজা কার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন জয়রাম এইজন্য আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, পরে প্রকাশ পায় যে জয়রাম ঘুমাইয়া পড়েন না, তিনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়েন। মাতুল ইত্যাদি সকলে

তাঁহাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারেন ও পুনরায় জয়রামকে পূজা করিতে দিয়াছিলেন। এই ধ্যানস্থ হওয়ার লক্ষণ জয়রামের শেষ দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। জয়রাম সাধন করিয়া এই একাগ্রতা লাভ করেন নাই, জন্ম সময় হইতে এই একাগ্রতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব।

জয়রাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া বিশেষ কোন প্রকার দোষের কথা জানিতে পারি নাই। তিনি ঘন ঘন তামাক খাইতেন অন্যের হাতের তামাক সাজা পছন্দ করিতেন না, অনেক সময় নিজে তামাক সাজিতেন—হাঁটা পথে বা গো-যানে কলিকাতা যাইবার সময় তামাকের সরঞ্জাম সঙ্গে থাকিত। তামাক না হইলে তাঁর চলিত না।

কোন সিদ্ধ পুরুষ, সাধক, শ্রেষ্ঠ ভক্ত বা অংশ অবতারকে যাঁহারা স্বচক্ষে দেখেন তাঁহারা বিশেষ ভ্রমে পড়েন, তাঁহারা বাহিরে এরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, যাহা দেখিলে প্রত্যক্ষদর্শিগণ বিষম ভ্রমে পড়েন, ইহাই মহামায়ার অদ্ভুত আবরণ লীলা। পাগল হরনাথকে যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহাদিগের ভিতর অনেকেই বা কেহই তাঁহাকে পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে সকলকে আশ্বাস দিয়া হরনাথ বলিয়াছিলেন যাহারা আম্র ফল চোখে দেখে নাই, কেবল মধুর রস, সুগন্ধ ইত্যাদির বিষয় শুনিয়াছে, তাহাদের পূর্ণানন্দের জ্ঞান হইয়া থাকে সেইরূপ জ্ঞানের তুলনায় যাহারা আম্রফল স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন বা আস্বাদ করিয়াছেন, আমের আঁটী, খোসা ইত্যাদির বিষয় দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন তাঁহাদের জ্ঞান ভিন্ন শ্রেণীর পর্য্যায় হইয়া থাকে। ইহাতে মানবের দোষ নাই, ইহাই তাঁর বিরাট খেলার মাধুর্য্য। ঠাকুর বলিতেন মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন তখন যদি সকলে মহাপ্রভুকে গোলোক-বিহারী আসিয়াছেন মনে প্রাণে বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে স্ত্রী, পুরুষ সকলে উন্মত্ত হইয়া গৃহাদি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবের চিরবাঞ্ছিত গোলোকবিহারী মহাপ্রভুর চরণতলে দিন রাত্রি পড়িয়া থাকিত, মারিয়া তাড়াইলেও নড়িত না, অনাহারে থাকিয়া গোলোকবিহারীর পরম শীতল চরণতলে লক্ষ লক্ষ ভক্ত জীবন বিসর্জ্জন করিত, কিন্তু সেভাব কয় জনের জাগ্রৎ হইয়াছিল। হরনাথের সময়েও আমরা সেই একই প্রকারের আবরণ লীলা দেখিতে পাই। হরনাথকে বুঝিতে পারিয়াছেন কয় জন? যাঁহারা হরনাথকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বুঝিয়াছেন বলিয়া অহঙ্কার বশতঃ গলাবাজি করিতেছেন, Socrates ও Platoর ভাষায় তাঁহাদিগকে হরনাথ রাজত্বের অবোধ শিশু বলা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

ভগবতী দেবীর সকল প্রকারের গুণের কথাই বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু ভগবতী দেবী ও জয়রামকে স্বচক্ষে দেখি নাই, কেবলমাত্র তাঁহাদিগের কথা কর্ণে শুনিয়াছি মাত্র। ভগবতী দেবীর হৃদয় সকল প্রকারের সদ্গুণ ও করুণ রসে পূর্ণ ছিল, কিন্তু তাঁহার ভিতর অন্যান্য গুণ যাহাকে আমরা বদ্গুণ বলি তাহাও ছিল। ভগবতী দেবী মৃত্যুকে বড় ভয় করিতেন। এক সময়ে ঠাকুর হরনাথ যখন তিনি কুচিয়াকোল হাই স্কুলে পড়েন ও ক্ষ্যেপী ঠাকুরাণী ঘর করিতে শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় হরনাথ, তাঁর মাতা ভগবতী দেবীকে মৃত্যু-ভয় দেখাইয়া খেলা করিয়াছিলেন। ঠাকুর অনেক সময় তাঁর মাতাকে মৃত্যু-ভয় ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই। একদিন হরনাথ উপরের ঘর হইতে নীচে আসিয়া মাতাকে মিথ্যা করিয়া বলেন উপরে একটা সাপ দেখিলাম, ইহা শুনিয়া ভগবতী দেবী শিবনারায়ণ ও অন্যান্য লোকদিগকে ডাকাইয়া সাপ মারিতে উপরে পাঠান। হরনাথ মাতাকে উপরে লইয়া যান ও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মাতার নিকটে ঐ সাপ বলিয়াছিলেন। মাতা, শিবু ও হরুকে ঠেলিয়া দিয়া মাগো বলিয়া পলাইয়া যান। ইহাতে সকলে হাসিতে থাকেন ও হরনাথ মাকে বলেন, এই না তুমি ছেলেদের ভালবাস, ছেলেদের সাপের মুখে ঠেলিয়া দিয়া আপনার প্রাণ বাঁচাইয়া নীচে পলাইয়া আসিলে, আপনাকে না ভুলিতে পারিলে স্বামী, পুত্র, কন্যা, কাহাকেও, ভালবাসা যায় না; ইহা কেবল মুখের ভালবাসা দেখান। এই ঘটনাটী মাতাঠাকুরাণী কুসুমকুমারী জানেন।

ভগবতী দুই পুত্র-বধূকে ভাল বস্ত্র পরিতে বা ভাল খাইতে দিতেন না। বস্ত্রের কথা বলিলে ছেঁড়া বস্ত্র সেলাই করিয়া পরিতে বলিতেন। আহার সম্বন্ধে পুত্রবধূগণকে বিশেষ কষ্ট দিতেন, ঘরে আম, কাঁটাল, গুড় থাকিলেও দুই পুত্র-বধূকে একধামি করিয়া মুড়ি দিতেন, প্রাণ ধরিয়া আম, কাঁটাল দিতে পারিতেন না। মধ্যাহ্নে কেবলমাত্র একথালা ভাত, ভাতের উপর খানিকটা ডাল ঢালা ও দুইটা তিনটা কাঁচা লঙ্কা ও সামান্য পরিমাণ শাকের ঘণ্ট দিতেন। বধূগণ কোন দিনও মাছের মুখ দেখিতে পাইতেন না। যে মাছ আসিত তাহাকে ১৬ খণ্ড করা হইত। ৮ খণ্ড থাকিত শিবুর জন্য, ৪ খণ্ড থাকিত হরুর জন্য, আর বাকি ৪ খণ্ড শিবনারায়ণের কন্যা বিনোদিনী ও হরনাথের কন্যা ইন্দুমতীর জন্য থাকিত। ১২৯৬ সালে (ইং ১৮৯০ সালে) দ্বিতীয়বার বি, এ, পরীক্ষা দিয়া হরনাথ সোণামুখীতে আসেন। হরনাথ হঠাৎ একদিন যে স্থানে গোলাপ সুন্দরী ও কুসুম কুমারী মধ্যাহ্নে ভোজন করিতেছিলেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হন,

এরূপ কেবল ভাতের থালা দেখিয়া তিনি দুঃখ করেন ও রাত্রির রক্ষিত মাছ ও তরকারি দুইজনের পাতে দিয়া পলাইয়া যান। ইহার জন্য পুত্রবধূগণ ভগবতীর নিকট হইতে নানাপ্রকার কথা শুনিয়াছিলেন। আমার নিকট জয়রামের হস্তলিখিত হিসাবের খাতা আছে। এই হিসাবের বিষয় ও হিসাবের খাতার ছবি ১৭১ পাতায় দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, তিনি কোন দিন দুই পয়সার কোন দিন এক পয়সার বাজার করিতেন। কখন কখন দুই এক আনার লবণ ও রন্ধন মশলার হিসাব লেখা দেখিতে পাইয়াছি। তণ্ডুল ও তৈলের উল্লেখ দেখি নাই। সম্ভবতঃ চাষের ধান, কলাই, সরিষা, লঙ্কা ইত্যাদি পাইতেন। আস্ত সরিষার বিনিময়ে তেলীর নিকট হইতে তৈল পাইতেন, ধান দিয়া চাউল করাইতেন। জয়রামের মৃত্যুর পর ভগবতী দেবী সংসার চালাইবার জন্য স্বামীর পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনিও কোন দিন এক পয়সার মাছ, তৎপর দিন দুই পয়সার তরিতরকারি, শাক ও মাছ খরিদ করিতেন। যখন পুত্রগণের বিবাহ দেন তখনও এইরূপ চালে চলিয়াছিলেন। পুত্রগণের দুই একটী করিয়া সন্তান জন্মিলেও দুই পয়সার বেশি বাজার হইত না। ভগবতী দেবী বৃদ্ধা হইলে তাঁর মৃত্যুর ৭।৮ বৎসর পূর্ব্ব হইতে খাজনার টাকা ও সংসার খরচ শিবনারায়ণের হাতে ন্যস্ত করেন। শিবনারায়ণও খরচ সম্বন্ধে ভগবতী দেবীর প্রদর্শিত পথে চলিয়াছলেন। সে সময় আমরা সোণামুখী যাইলে শিবনারায়ণ বিশেষ বিরক্ত হইতেন। দ্বিতীয় দিনে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "কোন ট্রেণে যাইবে" অর্থাৎ পানাগড় হইতে কোন ট্রেণে কলিকাতা রওনা হইব জিজ্ঞাসা করিতেন। ভগবতী দেবীর ইহাতে আমি আদৌ দোষ দেখিতে পাই না। তিনি যখন বিধবা হন তখন চারিখানা চালা ঘর ছাড়া বসবাসের জন্য জয়রাম ইঁটের দালান বা বাড়ী করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি এরূপ কৃপণতা না করিলে ছেলেদের মানুষ করা, কন্যার বিবাহ দেওয়া ও ইঁটের দ্বিতল বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন না। এইরূপ কৃপণস্বভাবা হইয়া তিনি শেষ জীবনেও তাঁর এই কার্পণ্য-স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

উপরোক্ত সর্পের ঘটনাটী মাতাঠাকুরাণী ও বাটীর অন্যান্য সকলের সম্মুখে ঘটিয়াছিল। ঠাকুর এই দৃষ্টান্ত দিয়া সকলকেই শিখাইয়া গিয়াছেন যে আত্মভোগ বা তৃপ্তির ধ্বংস না হইলে প্রকৃত ভালবাসা আসিতেই পারে না। ঠাকুর বলিতেন ষোল আনা স্বার্থপরতা একদিনে যায় না ইহার ক্রম আছে, যে যত নিজের

স্বার্থপরতার কার্য্যগুলি দেখিতে পাইবে ততই তার নিকট হইতে স্বার্থপরতা বিদায় গ্রহণ করিতে থাকিবে, ধীরে ধীরে সে তখন নিঃস্বার্থ হইতে শিক্ষা করিবে। নিঃস্বার্থ লোকেরাই ভাল লোক, তাঁহারা কৃষ্ণ বলুক আর নাই বলুক, এই সব লোক দেখিলেই আমার কেমন একটা প্রাণে আনন্দ হয়. তাহাদিগের সঙ্গে কৃষ্ণ কথা কহিতে মন চায়।" তিনি বলিতেন "সাধনের প্রথম ও প্রধান সোপান হইতেছে পরোপকার করা। যশঃ ইত্যাদির প্রত্যাশা না রাখিয়া যিনি যত পরোপকার করিতে পারেন তিনি ততই উন্নত হইতে থাকেন"।

একদিনের ঘটনার উল্লেখ করিব। একটী ভদ্রলোক ৫।৭ দিন ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ ঠাকুরের নিকট হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা শুনিতে আসিতেন ও এসম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য ঠাকুরকে তাঁর বাসনা জানাইতেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁর কথার কোন উত্তর দিতেন না, যেমন হাসি ঠাট্টা তামাসা অন্যের সঙ্গে করিতেন সেই ভাবেই হাসি ঠাট্টা করিতে থাকিতেন। উপরোক্ত ভদ্রলোকটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ঠাকুরকে পুনরায় বলিলেন আপনার নিকট হইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে শুনিবার জন্য আসিয়াছি কিন্তু আপনি হাসি তামাসা লইয়া থাকেন কিছু ভাল কথা শুনিতে পাইব না কি? এইবার ঠাকুর তাঁর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "কৃষ্ণ আমার ঘরের চাকর নহেন যে তাঁকে হুকুম করিলে তিনি ধর্ম্মকথা আমার মুখে যোগাইয়া দিবেন। বাবা তত্ত্ব কথা শুনিবার পূর্ব্বে স্বার্থপরতা ত্যাগ করিতে শিখুন, অন্যের আনন্দে আনন্দ করিতে শিখুন, কটুকথা বলিয়া অন্যের প্রাণে কষ্ট দেওয়া বন্ধ করুন। মন নির্ম্মল হ'লে তত্ত্ব কথা শুনিবার অধিকার জন্মিবে তখন যেখানে সেখানে সব কথার মধ্যে তত্ত্ব কথা শুনিতে পাইবেন। ঠাকুর আর কোন কথা বলিলেন না, সেই ভদ্রলোকটিও চুপ করিয়া রহিলেন। ভদ্রলোকটি কিছুক্ষণ পরে বিরক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, এই শিক্ষিত ভদ্রলোকটিকে আমি পূর্ব্ব হইতে চিনিতাম। তিনি নিয়মিত ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। তাঁর সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলাম তিনি ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল বেশ বুঝিয়াছেন। তিনি মাছ, মাংস, এমন কি পাণ পর্য্যন্ত খাইতেন না। এক কথায় তাঁকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম। তাঁহার প্রতি ঠাকুরের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া আমি ঠাকুরের উপর বিরক্ত হইয়াছিলাম। ঐ ভদ্রলোকটি সেই অবধি ঠাকুরের নিকট আর আসেন নাই। এই ঘটনার ৬।৭ মাস পরে একদিন অফিস হইতে আসিয়া শুনিলাম অমুকের স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছেন, অনুসন্ধান করিয়া অবগত হই যে ঐ ভদ্রলোকটি অফিসের

কাপড় চোপড় পরিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে তাঁর স্ত্রীকে এমন কটুবাক্য বলিয়া মর্ম্মবেদনা দিয়াছিলেন যে তিনি যেমন বাড়ী হইতে আফিসে যাইবার জন্য উপরতলা হইতে রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর ঘরে রক্ষিত কারবলিক্ এসিড পরিমাণ এক আউন্স) তাঁর স্ত্রী উদরস্থ করেন ও তাঁকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার সময় পথে মৃত্যু হয়। এই ভদ্রলোকটি যিনি ঠাকুরের নিকট হইতে ধর্ম্মকথা শুনিতে চাহিয়াছিলেন. তিনি আমার পূজনীয় মাতুল শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাল্যবন্ধু ও এখনও জীবিত আছেন, রায় সাহেব হইয়াছেন ও গভর্ণমেণ্টের একজন পেন্‌সন ভোগী।

ঠাকুর ঐ ভদ্রলোকটিকে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহা উড়ো কথা বলিয়াই আমার তখন ধারণা হইয়াছিল। তখন আমি ভাবিয়াছিলাম কে না কটু কথা বলে. বা সারাজীবনে একবার না একবার কটু কথা বলিয়াছে। সংসারে থাকিতে হইলেই কটু কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে, এইজন্য বোধ হয় ভদ্রলোকটি ঠাকুরের কথার কোন উত্তর দেন নাই। কিন্তু ঐ ভদ্রলোকটির স্ত্রীর আত্মহত্যার পর বুঝিয়াছিলাম, তিনি স্বার্থপরতার দাস ছিলেন, পাণ হইতে চুণ খসিলেই তাঁর স্বার্থে আঘাত করিত, সেই সময় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া কটু উক্তি করিতেন বা স্ত্রীকে প্রহারও করিতেন, কিন্তু বাহিরে তিনি বক-ধার্ম্মিক সাজিয়াছিলেন। ঠাকুর কোন বিশিষ্ট শক্তির বলে মানুষ চিনিতে পারিতেন, সাধারণ লোকদিগের মধ্যে এইরূপ শক্তি থাকা অসম্ভব তাহা বুঝি, কিন্তু সত্য সত্যই যাঁহারা সাধু তাঁহাদিগের ভিতর এই শক্তির অভাব দেখা যায়। এই শক্তি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া ঠাকুরকে এই শক্তির সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলাম। ঠাকুর বলিয়াছিলেন "মহাপ্রভু নীলাচলে থাকিতেন, প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কালনা, কাটোয়াবাসী, কুলীন-গ্রামবাসী, খণ্ডবাসী ইত্যাদি গৌড়ের নানাস্থানের ভক্তগণ পুরীতে আসিয়া সমবেত হইতেন, তথায় চারি মাস থাকিয়া যে যাহার গ্রামে ফিরিয়া যাইতেন। মহাপ্রভুর নিকট বিদায় লইবার পূর্ব্বে কুলীনগ্রামী এক ভক্ত মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন:—

কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন।
প্রভু আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্য সাধন॥
প্রভু কহে বৈষ্ণব-সেবা নাম-সংকীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥

তিঁহো কহে কে বৈষ্ণব ? কি তার লক্ষণ ?
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তাঁর মন ॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
যেই সে বৈষ্ণব ভজ তাঁহার চরণে ॥
বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিক্ষাইল ॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম ॥

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দেখ বাবা, যে মালা তিলক পরিয়াছে ও মুখে কৃষ্ণ রাম, হরি বলিতেছে তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি, এই বৈষ্ণব ধারণার মধ্যে ভ্রম ভ্রান্তি থাকে। যাঁহার মালা তিলক নাই, যিনি মুখে একবারও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন না, তিনি অন্তরে প্রকৃত বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাকে সকলে বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে পারেন না, এই সকল বৈষ্ণব মূর্ত্তিকে কেবল বৈষ্ণবেরাই চিনিতে পারেন, তখন তাঁহাদের ভিতর কৃষ্ণ প্রেম বিকাশ হয়। ইহারা বৈষ্ণবতর। আবার যাঁহার বাহিরে বৈষ্ণবের কোন চিহ্ন না থাকিলেও যাহাকে দেখিয়া বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব সকলের ভিতর ঈশ্বরের কথা স্ফূর্ত্তি হয়, তিনিই বৈষ্ণবতম।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে বলি 'তাহা হইলে আপনি বৈষ্ণবতম কারণ আপনি বাহিরে কোন বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ করেন না ও মুখেও কৃষ্ণ কৃষ্ণ শব্দ করেন না, অথচ সর্ব্বসাধারণ লোকে আপনাকে দেখিলে সংসারের কথা ভুলিয়া গিয়া আপনার নিকট বসিয়া থাকেন।

ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"তোর অত বিচার করতে হবে না, আমি যাহ বলিতেছি শোন্"।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"যাঁহারা বৈষ্ণবতর তাঁহাদের ভিতর কেবল ভাল লোকদিগেরই ছাপ পড়ে, কিন্তু বৈষ্ণবতম তিনি যাঁহার প্রাণে বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব এই দুই রকম লোকেরই ছাপ পড়ে। বৈষ্ণবতম শ্রেণীর মহাজনগণ সকল লোকের সঙ্গেই আলাপ করেন, কিন্তু যে মন্দ লোক ভণ্ডামি করিয়া ভাল

লোকের ভাব দেখায় তাহাদিগের সহিত কথা কহিতে বা ইষ্ট গোষ্ঠী করিতে মন চাহে না। আমি কাশ্মীরে যেরূপ লোক চিনিতে পারিতাম এখন তাহার কিছুই নাই। কেন যে পারিতাম তাহা প্রভুই জানেন। চরিতামৃতে আছে, "বৈষ্ণব পারে বৈষ্ণব চিনিতে" মহাপ্রভুর উক্তির অর্থ নহে যে সকলেই বৈষ্ণব চিনিতে পারিবে। আগে বৈষ্ণব হও তখন কে বৈষ্ণব কে অবৈষ্ণব স্ফূর্ত্তি হবে। আমি যে সকল কথা বলি সে সকল পাগলের কথা মনে করো না, আমার ভেতর যেমন ছাপ পড়ে আমি সেইভাবে কথা বলি। আমার ভিতর এ শক্তি ছিল সত্য, তাই বলিয়া মনে করো না যে অন্য লোকের ভিতর এ শক্তি নাই। লোকে আমাকে ঈশ্বর জ্ঞানে ভালবাসতে আসে কিন্তু কৃষ্ণের সৃষ্ট জীব জন্তু কাহাকেও ভালবাসিতে জানে না। নিজেদের ভিতর ভালবাসার অভাব, পরস্পর শত্রুতা করে, অন্যে কষ্টে পড়িলে তাকে সহায়তা করা দূরে থাকুক, আনন্দ অনুভব করে ইহাতে কৃষ্ণ প্রীত হন না। সেরূপ লোকেরা কোন কালেও কৃষ্ণের নিজ জন হইবে না, তাঁর ভালবাসা পাইবে না। এই জন্য সকলকে বলি, যদি কৃষ্ণ-ভালবাসা চাও, তাহা হইলে তাঁর সৃষ্ট সকল প্রাণীকে ভালবাসিতে শিখ। "If you love me love my dog" ইহা ধ্রুব সত্য। এই প্রথম সোপান পরিত্যাগ করিলে, অন্যের ছেলেকে নিজের ছেলের মতন দেখিতে না শিখিলে, নিজে মাতার ন্যায় অন্যের মাতাকে দেখিতে না পারিলে, লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণনাম করিলে কি হবে। আগে কৃষ্ণ ভুলাইবার বেশভূষা কর, তখন কৃষ্ণকে না ডাকিলেও তিনি আপনি আসিয়া আলাপ করিবেন।"

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধদেব ইত্যাদির চরিত্র মধ্যে রাশি রাশি ত্রুটী ছিল, পুরাণ ইত্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের চরিত্রেও অনেক ভ্রম, দোষ বা ত্রুটী দেখা যায়, সে সকল ত্রুটী মহাপ্রভু নিজে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। আহারান্তে মহাপ্রভুর মুখশুদ্ধির জন্য, গুপারি খণ্ড, এলাচি বা হরীতকীর আবশ্যক হইত। এক সময়ে হরিদাসের নিকট মুখশুদ্ধির জন্য কোন দ্রব্য চাহিয়াছিলেন, হরিদাস তৎক্ষণাৎ একটী হরীতকী সংগ্রহ করিয়া অর্দ্ধেক মহাপ্রভুকে দেন ও হরীতকীর অপর অর্দ্ধেক অংশ বস্ত্রে বাঁধিয়া রাখেন। এই হরিদাস, যবন হরিদাস বা ছোট হরিদাস নহেন, ইনি মহাপ্রভুর একজন আত্মীয় ছিলেন। তৎপর দিন আহারান্তে মহাপ্রভু হরিদাসের নিকট মুখশুদ্ধির দ্রব্য চাহেন। হরিদাস বস্ত্র মধ্য হইতে পূর্ব্বদিনের হরীতকীর অপর অর্দ্ধেক অংশ বাহির করিয়া দেন ইহাতে হরীতকী কোথায় পাইলে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করেন

যখন মহাপ্রভু জানিলেন যে এই হরীতকী পূর্ব্ব দিনের সঞ্চিত, তখন তাঁহাকে সঞ্চয়ী ও ঘোর বিষয়ী বলেন ও এইরূপ লোকদিগকে সন্ন্যাসীর স্পর্শ করিতে নাই বলিয়া পরিত্যাগ করেন। আহারের সময় প্রত্যহ মহাপ্রভুর আচারের আবশ্যক হইত নচেৎ তাঁহার আহারে তৃপ্তি হইত না। এই জন্য রাঘব পণ্ডিত মহাশয় প্রতি বৎসর এক বৎসরের উপযোগী আচার নীলাচলে আনিতেন। এই আচার গোবিন্দ যত্নের সহিত এক বৎসর রাখিতেন। এই আচার সম্ভারকে "রাঘবের ঝালি" বলিত। এই যত্নের রক্ষিত আচার মহাপ্রভু প্রত্যহ আহার করিতেন, এই আচার কোথা হইতে আসিয়াছে মহাপ্রভু জানিতেন ও গোবিন্দ ইহা এক বৎসর যাবৎ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন তাহাও জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু গোবিন্দকে ঘোর সংসারী বলিয়া ত্যাগ করেন নাই। উভয়েই প্রভুর জন্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, একজনের কার্য্য দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিল অন্যের কার্য্য দূষণীয় বলিয়া গণ্য হয় নাই।

মহাপ্রভুর যে ভ্রম হইত তাহা তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। একটী বালক প্রত্যহ মহাপ্রভুকে দেখিতে আসিত। বালকটী দেখিতে সুশ্রী, মহাপ্রভু তাকে বিশেষ স্নেহ ও আদর করিতেন। এই বালকটী এক সুন্দরী যুবতী অল্প বয়সের বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্র। দামোদরের ইহা ভাল লাগিত না, দামোদর বালককে আসিতে নিষেধ করিলেও সে প্রত্যহই মাতার সহিত আসিত। একদিন দামোদর মহাপ্রভুকে বলেন আপনি পরমা সুন্দরী যুবতী বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্রকে বিশেষ স্নেহ করিয়া থাকেন, নিজেও পরম সুন্দর যুবক কিন্তু মুখর জগতের মুখ কি আচ্ছাদিত করিতে পারিবেন? মহাপ্রভু বিরক্ত না হইয়া তাঁর ভ্রম বুঝিতে পারেন ও দামোদরের প্রশংসা করেন।

মহাপ্রভু নীলাচল হইতে তীর্থ যাত্রায় যাইবার মনন করেন কিন্তু সঙ্গে কাহাকেও লইবেন না এইরূপ স্থির করেন। ভক্তগণ ইহাতে প্রমাদ গণিল, তাঁহারা অনেক মিনতি করিলেন মহাপ্রভু কাহারও কথা শুনিলেন না. কাহাকেও সঙ্গে লইবেন না, ইহাই তাঁহার চরম সিদ্ধান্ত বলিয়াছিলেন। যখন সকল ভক্ত হতাশ হইলেন তখন নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন, তোমার দুই হস্ত কৃষ্ণনাম গণনে বদ্ধ থাকিবে (মহাপ্রভু মালায় জপ করিতেন না, অঙ্গুলি পর্ব্বে সংখ্যা রাখিতেন) এমন অবস্থায় কৌপীন, বহির্ব্বাস ও জল পাত্র কেমন করিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইবে, ইহার উপর তুমি যখন প্রেমাবেশে চেতনা শূন্য হইয়া পড়িবে, তখন এ সকল দ্রব্য কেমন করিয়া রক্ষা করিবে? অতএব হঠকারিতা পরিত্যাগ করিয়া

সরল ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লও। এইবার মহাপ্রভু তাঁর ভ্রম বুঝিতে পারিলেন ও কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর আহারান্তে গোবিন্দ প্রত্যহ প্রভুর হাত পা টিপিয়া দিতেন কিন্তু জগদানন্দ চন্দনাদি তৈল মহাপ্রভুর ব্যবহারের জন্য গৌড় হইতে নীলাচলে আনিয়াছিলেন। মহাপ্রভু একজন মর্দ্দনিয়া রাখ বলিয়া ঐ তৈল গ্রহণ করেন নাই।

১ম—গোবিন্দ যে মহাপ্রভুর মর্দ্দনিয়া ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সন্ন্যাসীর মর্দ্দনিয়া রাখা নিষিদ্ধ, যখন মহাপ্রভু সকল প্রকারের কঠোর নিয়ম গুলি পালন করিতেন না, বা ভক্তগণ করিতে দিতেন না। শয্যা বা বালিস ব্যবহার করা সন্ন্যাসীর নিষিদ্ধ হইলেও ভক্তগণের আগ্রহে কলার পাতের শয্যা ও বালিস বহির্বাস দ্বারা আবৃত করিয়া ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। মিষ্ট আহারাদি সন্ন্যাসীর নিষিদ্ধ কিন্তু তিনি ভক্তগণের অনুরোধে প্রচুর মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিতেন ইত্যাদি অনেক বিষয় যাহা সন্ন্যাসীর অকর্ত্তব্য মহাপ্রভু তাহা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এমন অবস্থায় জগদানন্দ-আনীত চন্দনাদি তৈল সন্ন্যাসীর গ্রহণ করা নিষিদ্ধ বা মর্দ্দনিয়া নিয়োগের কথা বলার অর্থ কি?

২য়—বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস মহাপ্রভুর দেহ পাঞ্চভৌতিক মানব দেহের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় চিন্ময় বিগ্রহ ছিলেন। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত দ্বারা তাঁর দেহ নির্ম্মিত হয় নাই। মহাপ্রভু চিন্ময় বিগ্রহ ছিলেন বলিয়া জগন্নাথ বা টোটা গোপীনাথের দেহের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। নর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভুর ক্লান্তি হইয়াছিল, তাঁহার সর্ব্ব শরীরে ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন, যেমন সাধারণ পঞ্চভূত-গঠিত মানব দেহে হইয়া থাকে, তিনি শয়ন করিয়া পাশ ফিরিতে পারিতেছিলেন না। মহাপ্রভু যদি চিন্ময় বিগ্রহ হন, পাঞ্চভৌতিক মানব দেহের ন্যায় ক্লান্তি কোথা হইতে আসিল!

৩য়—মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞভাবে বিচরণ করেন নাই, অপরে কোন বিষয়ের সংবাদ না দিলে তিনি কোন বিষয় জানিতে পারিতেন না। বহুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণের শ্রম হইয়াছে নিত্যানন্দ প্রভু জানাইলে তবে মহাপ্রভু জানিতে পারিয়াছিলেন। যে প্রসাদান্ন দুই তিন দিন মধ্যে পসারীরা বিক্রয় করিতে না পারিলে ফেলিয়া দিত, পচাগন্ধে গাভীরাও খাইত না,

এই প্রসাদ অন্ন রঘুনাথ দাস গৃহে লইয়া গিয়া লবণের সহিত আহার করিতেন। গোবিন্দ এই বিষয় মহাপ্রভুর গোচরীভূত করিলে, প্রভু একদিন রঘুনাথের বাসায় গিয়া একগ্রাস প্রসাদান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ছোট হরিদাসের বিষয়ে ঠিক ইহার বিপরীত লীলা করিয়াছিলেন। ভগবান আচার্য্য নামে মহাপ্রভুর একজন ভক্ত, তিনি প্রভুকে একদিন নিমন্ত্রণ করেন। আচার্য্য মহাশয় প্রভুর কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে শিখি মাহাতীর ভগিনী পরম বৈষ্ণবী বৃদ্ধা-তপস্বিনী মাধবী দেবীর নিকট হইতে উৎকৃষ্ট চাউল মাগিয়া আনিতে বলেন, হরিদাস তাঁহার নিকট হইতে তণ্ডুল আনিয়া আচার্য্য মহাশয়কে দিয়াছিলেন। প্রভু আহারে বসিয়া শালি অন্ন দেখিয়া এই চাউল কোথায় পাইলে আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আচার্য্য মহাশয় হরিদাস দ্বারা মাধবী দেবীর নিকট হইতে আনাইয়াছেন মহাপ্রভুকে বলেন। প্রভু বাসায় ফিরিয়া আসিয়া গোবিন্দকে বলেন "আজ হইতে হরিদাসকে আসিতে দিবে না।" পুরী গোঁসাঞি স্বরূপাদি সকল ভক্ত হরিদাসের "অল্প অপরাধ" বলিয়া মহাপ্রভুকে ক্ষমা করিতে বলেন কিন্তু প্রভু কাহারও কথা শুনেন নাই।

আজকাল চৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়া থাকেন ছোট হরিদাস অতি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, তাঁহার গান শুনিলে সকলেই আকৃষ্ট হইতেন। হরিদাস কোন কাজের অছিলায় প্রায়ই মাধবী দেবীর বাড়ীতে যাইতেন, মাধবীর বাড়ীতে কোন যুবতীর সহিত হরিদাসের গুপ্ত প্রণয় ছিল এই কারণে হরিদাস মাধবীর বাড়ীতে গিয়া গান করিতেন ও তাঁর প্রণয়িনীকে দেখিবার, হাঁসি, ঠাট্টা, তামাসা করিবার অবসর পাইতেন। রামানন্দ, স্বরূপাদি, এক এক জন পরম বৈষ্ণব চূড়ামণি তাহাদের কাহারও ধারণা হয় নাই যে সন্ন্যাসী বেশধারী হরিদাস একজন লম্পট। এই মহান্তগণ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর না হইলেও অনুসন্ধানে তাঁহাদিগের জানিতে বাকি ছিল না যে হরিদাস কোন দোষে দোষী ছিল না, তাই তাঁহারা বারবার হরিদাসকে ক্ষমা করিতে মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন। অনেক সময় মহাপ্রভু ভাল হউক বা মন্দ হউক বিষম একগুয়েমি করিতেন ইহা সকল পার্ষদ ভক্তগণই জানিতেন।

স্বরূপ গোঁসাঞি কহে শুন হরিদাস।
সবে তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী করহ বিশ্বাস॥

প্রভু হট করিয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কভু কৃপা করিবেন দয়ালু অন্তর॥
তুমি হঠ কৈলে তাঁর হঠ যে বাড়িবে।
স্নান ভোজন কর তবে আপনি ক্রোধ যাবে॥

মহাপ্রভু সমুদ্রে স্নানকালীন নিম্ন স্রোতে আকর্ষিত হইয়া জলমগ্ন হইয়াছিলেন যাঁহারা তাঁর সহিত স্নান করিতেছিলেন তাঁহারা সকলেই এ বিষয় অবগত ছিলেন। শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাদিগের নিকট এ ঘটনার বর্ণনা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া বৈধব্যবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শিগণের কথা কোন পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয় নাই। মহাপ্রভুর মৃতদেহ পাওয়া যাইলে, হরনাথের ন্যায় মহাপ্রভুর মৃত দেহেরও সংকার করিতে হইত। মহাপ্রভু চিন্ময়বিগ্রহ ছিলেন ইহা অতি কষ্টসাধ্য কল্পনা। চিন্ময় স্বরূপকে এক ধাপ অবতরণ করিয়া পৃথিবীর যে কোন মূর্ত্তির হার ভাব পাঞ্চভৌতিক রূপ গ্রহণ করিতে হয়। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ৭৯ বৎসর বয়সে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হইলে তার মৃতদেহ ঘৃত, চন্দন কাষ্ঠ দ্বারা দাহ করা হইয়াছিল। বৌদ্ধদেবের পাঞ্চভৌতিক অস্থি, দন্ত ইত্যাদি অদ্যাপি আছে।

৪র্থ—মহাপ্রভু মানবের হাব ভাব ভূল ভ্রান্তি লইয়া লীলা করিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুর যে ভ্রম বা ভ্রান্তি হইত ইহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। অধিকন্তু তাঁহাকে কঠোর সাধন করিতে হইয়াছে অন্যান্য মহাপুরুষগণ যাঁহারাই অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন, সকলকেই সাধারণ মানবের ন্যায় সাধন করিতে হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। হরনাথও কাশ্মীর অবস্থানকালে সাধন করিয়াছিলেন। হরনাথের এরূপ ভুল ভ্রান্তি ছিল না একথা বলি না, তাঁর সেরূপ ভ্রম যুক্তি দ্বারা দেখাইলে তিনি মহাপ্রভুর ন্যায় ভ্রম স্বীকার করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন "আমি তোমাদের মত একজন"।

সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থেই অসম্ভব অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। এই সব ঘটনার উল্লেখ না থাকিলে ধর্ম্মগ্রন্থ ভালরূপে সাজে না, এইগুলিই ধর্ম্মগ্রন্থের ভূষণ স্বরূপ। এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া ঐ সকল ঘটনাগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই প্রকারের লোক, সকল সময়ে ছিলেন এখনও আছেন ও ভবিষ্যতেও থাকিবেন। পুরাকালে

মহাপুরুষের বর্ণনায় দেখা যায় মহাপুরুষগণ প্রকাণ্ড শরীর-বিশিষ্ট মানব ছিলেন, কাহাকে হস্তীতে মাথায় তুলিয়া লইয়া রাজা করিয়াছেন, কাহাকেও বাঘে স্তন্য-দুগ্ধ পান করাইয়াছে, কাহারও বা মাথায় সাপে ফণা বিস্তার করিয়াছিল, কাহারও বা মস্তকে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল। রামায়ণে আছে যে হনুমান পৃথিবীর জীব হইয়া সূর্য্যকে কক্ষচ্যুত করিয়া বগলে পুরিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণাদিতে দেখা যায় পুতনা রাক্ষসীর মৃত দেহ ছয় ক্রোশ ব্যাপী ছিল। পুরাকালের গ্রন্থে এইরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়।

পুরাকালের কথা ছাড়িয়া দিলেও আধুনিক গ্রন্থে এইরূপ গল্পের স্থান কেমন করিয়া পাইয়াছে, ইহার মীমাংসা করা সহজ নহে। বেশী দিনের কথা নয় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সম্বন্ধে এইরূপ গল্পের দুই একটীর উল্লেখ করিলে বুঝা যাইবে এই সকল গল্পের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? একদিন মহাপ্রভুর অঙ্গনে একটী আম্রবীজ রোপণ করা হয়, বীজ রোপণ মাত্রই বীজ অঙ্কুরিত হইল, বৃক্ষটী বাড়িতে লাগিল ও দেখিতে দেখিতে সেই আম্রবৃক্ষে আম্র ফলিল ও পাকিল। মহাপ্রভু দুই শত পাকা আম্র পাড়াইলেন ও সকলকে ভোজন করিতে দিলেন। জগাই মাধাই উদ্ধার সময়ে মহাপ্রভু চক্র চক্র বলিয়া ডাকিবা মাত্র সুদর্শন চক্র আসিয়া উপস্থিত হয়। এই প্রকারের অনেক গল্প আছে, কেমন করিয়া এই সকল গল্পের যোজনা হইয়াছে বলা যায় না।

মহাপ্রভুর সহিত কাজীর যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার বিবরণ আদিলীলা, সপ্তদশ পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। এই অংশটী কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের নিজের কল্পনা-প্রসূত নহে ইহা সকলেই বিশ্বাস করেন। সত্যই যদি মহাপ্রভু চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের বর্ণিতভাবে কাজীর সহিত কথোপকথন করিয়া থাকেন তাহা হইলে হিন্দুরা যে বেদের কর্ম্মকাণ্ড অনুসরণ করিয়া মহিষ, ছাগ ইত্যাদি দেবদেবীর সম্মুখে হত্যা করিয়া থাকেন তাহাতে দোষ দেখিলেন না কেন? ছাগ-দুগ্ধ মানবে পান করিয়া থাকেন, এই ছাগ শ্রেণীকে মাতারূপে গণ্য করিলেন না কেন? ছাগের কথা ছাড়িয়া দিলেও হিন্দুরা যে মহিষ হত্যা করেন মহিষীর দুগ্ধ মানবে পান করেন ও মহিষ অন্ন উৎপন্ন করে। ইহারা পিতা মাতার স্বরূপ হইল না কেন? গো বধ যখন অন্যায় বুঝিয়া ছিলেন তখন কাজীকে নরকের ভয় দেখাইতে হইল কেন? তিনি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে গো বধ বন্ধ করিতে পারিতেন। গো বধ জন্য যে অস্ত্র গ্রহণ করিবে সে তৎক্ষণাৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলে পৃথিবী হইতে এক ঘণ্টার

মধ্যে গো বধ উঠিয়া যাইত। তাঁহাকে চতুর্ভুজ হইয়া কোন স্থানে উপস্থিত হইতে হইত না। গো বধ যদি মঙ্গলময়ের অভিপ্রেত না হইত, পৃথিবী সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেই তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতেন। গো বধ রহিত হওয়া হিন্দুর ইচ্ছা হইতে পারে ইহা মঙ্গলময়ের ইচ্ছা নয় বেশ বুঝা যায়।

যাঁহারা কোন অবতারকেই ষোলকলায় পূর্ণ ভগবান বলিয়া গণ্য করেন না, যাঁহারা সকল অবতারকেই ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের উপরোক্ত মত একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। হিংসা করিয়া প্রাণী সকলকে জীবনধারণ করিতে হইবে, এই ভাবে ঈশ্বর জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি হিংসা করিয়া জীবন ধারণ করিবে এইরূপ কৌশলেই শ্রীগোবিন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাদিগকে অহিংসা পরমোধর্ম্ম শিখাইলে চলিবে কেন? এই ভাবে মানব ইত্যাদি সকল জীব, জন্তু, প্রাণীরা অন্যকে হত্যা করিয়া পুষ্ট হইতেছে। বৃক্ষলতা গুল্ম ইহাদিগের প্রাণ নাই বলিলে চলিবে কেন? কৃষ্ণই সৃষ্ট হইতেছেন অন্য কৃষ্ণকে পুষ্ট করিবার জন্য।

পাগল হরনাথ যখন জীবিত ছিলেন সেই সময়ের প্রকাশিত জীবন চরিত্রে অনেক মিথ্যা গল্পের যোজনা হইয়াছে। আর কিছুদিন পরে এই সকল মিথ্যা গল্পগুলি সত্য ঘটনা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। এখন এই সকল মিথ্যা গল্পের অনুসন্ধান করিলে এই সকল গল্পগুলি সত্য কি অসত্য জানিবার উপায় আছে কিন্তু আর ১০।১৫ বৎসর পরে এই মিথ্যা গল্পগুলিই সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে।

ঠাকুর হরনাথ সম্বন্ধে যে সকল অসত্য গল্পের স্রোত চলিয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ দিলাম। ইহাতে বেশ বুঝা যাইবে অন্যান্য অবতারগণের জীবনীতে যে সকল গল্পের যোজনা হইয়াছে ও ঠাকুর হরনাথের জীবনীতে যে সকল অসত্য গল্পের যোজনা হইতেছে এই সকল গল্পের সৃষ্টি একই প্রকারের ইহাতে কোন প্রকার বিভিন্নতা নাই।

(১) ঠাকুর হরনাথ একজন সঙ্গতিপন্ন ধনী ব্যক্তির সন্তান। ইহা সম্পূর্ণ অসত্য। তাঁর জন্মস্থান কুঁড়ে ঘর দেখিলেই বুঝা যায়।

(২) শিব মন্দির প্রতিষ্ঠায় ২৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল ইহা সত্য নহে। শিব মন্দিরই ইহার প্রমাণ দিবে।

(৩) ঠাকুরের পিতা জয়রাম কলিকাতায় রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া প্রাতঃকালে সোণামুখীতে পৌছান ইহা ভ্রমপূর্ণ কারণ সে সময় রেলের রাস্তার

সৃষ্টি হয় নাই। এখনও কলিকাতায় রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়া তৎপর দিন প্রাতঃকালে রেলযোগে সোণামুখীতে পৌছান যায় না।

(৪) যাঁতি কলে সাপ ধরা পড়া সত্য নহে কারণ সে সময়ে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যাঁতি কলের সৃষ্টি হয় নাই।

(৫) মহাপুরুষের মস্তক দ্বিতল গৃহের ছাদ স্পর্শ করিয়াছিল এই বিষয়টী ঠাকুর হরনাথ নিজে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু দশচক্রে ভগবান্ ভূত, তাঁহার নিষেধ বাক্য জীবনী-লেখকগণ শুনেন নাই।

(৬) ১৯৷২০ বৎসর বয়সের সময় ঠাকুর হরনাথের কাসরোগ হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হরনাথ এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দেন তখন তাঁহার স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল। কাসরোগের কথা বাড়ীর কেহই জানেন না এমন কি তাঁর স্ত্রীও জানেন না।

(৭) ঠাকুর হরনাথের সহধর্ম্মিণীকে বিষাক্ত সর্পে দংশন করে ও তাঁর স্ত্রী কুসুমকুমারী রাধাগোবিন্দ নাম উচ্চারণ করিয়া বাঁচিয়া যান। এই সর্প দংশনের ঘটনা কুসুমকুমারী নিজে জানেন না বা বাড়ীর কেহ কখন শুনেন নাই।

(৮) নব্য ভক্তগণের ও লেখকগণের গল্পগুলি বিখ্যাত উপন্যাস লেখকগণকে হার মানাইয়া দিয়াছে। এই প্রকার শত শত গল্প নিত্য নূতন টংএ ও রংএ প্রকাশিত হইতেছে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর হরনাথ অটল বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছেন এই পত্রখানি পাগল হরনাথ পত্রাবলী পুস্তকের ৪র্থ খণ্ডে ২৮০ পাতায় ১৭৪ নম্বরে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে সকল অস্বাভাবিক ঘটনা ঠাকুর হরনাথকে উপলক্ষ করিয়া ঘটিয়াছিল তাহার তালিকা ঠাকুর হরনাথ নিজেই দিয়াছেন।

(১) মথুরের কন্যার বিষয়, (২) তুগুলার হারাণ ডাক্তারের বিষয়, (৩) জংসনের বিনোদ ডাক্তারের বিষয়, (৪) বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রদ্বয়ের বিষয়, (৫) জংসনে মেলট্রেনের বিষয়, (৬) হরির মুক্তির বিষয়, (৭) তোমার নিজের বিষয় (অর্থাৎ শূল বেদনা ও বসন্ত রোগের বিষয়), (৮) মাধবের কথা, (৯) তুগুলার টিকিট হারানো সুরেনের কথা, (১০) বিপিনের ভাইয়ের কথা, (১১) জ্যোতিঃপ্রসাদের কথা, (১২) রাধাবিনোদ নিয়োগীর উন্মাদ অবস্থার কথা ইত্যাদি।

ঈশ্বর যে সকল অস্বাভাবিক কার্য্যাদি ঠাকুর হরনাথ দ্বারা করাইয়াছিলেন, ঐ সকল অস্বাভাবিক কার্য্য করা হরনাথের ইচ্ছার অধীন ছিল না, এই কথাই ঠাকুর সর্ব্বদাই নিজমুখে বার বার বলিয়াছেন ও পত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, অস্বাভাবিক ঘটনাগুলি ঠাকুরকে উপলক্ষ করিয়া ঘটিয়াছে, ঐ সকল ঘটনা যথাবথভাবে রঞ্জিত না করিয়া বর্ণনা করিলে দেখা যায় ঐ ঘটনাগুলি খুব সাধারণ না হইলেও চমকিত হইবার মত অস্বাভাবিক নহে। উচ্চস্তরের মহাপুরুষগণ পৃথিবীতে মানবভাবে জন্ম গ্রহণ করিলে, মানবের দোষ, গুণ, আত্মবিস্মৃতি, হাব, ভাব ইত্যাদি বরণ করিয়াই আসিয়া থাকেন। তখন তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বলিয়া বিচরণ করেন না। ঠাকুর হরনাথও এইভাবে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন। যাহারা জুয়াচুরি করিয়া ভক্ত বা ঈশ্বর সাজিতে চান, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় যাঁহারা সত্য সত্যই সাধক বা ভক্ত তাঁহারা সাধারণভাবে থাকিতে চাহেন। তাঁহারা সম্মান বা যশের ভিখারী হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে ঘৃণা করিতেন বা করেন। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর পরম পিতা পরমেশ্বর মানব আকারে অবতীর্ণ হইয়া ভিখারীর ন্যায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অলৌকিক কার্য্যাদি করিয়া সকলের নিকট হইতে ঈশ্বর বলিয়া পূজা পাইবার জন্য সারাজীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন এই প্রকার অতিরঞ্জিত জীবন চরিত বর্ণনাকারিগণের গল্পগুলিতে কোন প্রকারে বিশ্বাস আসিতে পারে না।

ঠাকুর হরনাথ অস্বাভাবিক ঘটনা দেখাইবার জন্য পেশাদার যাদুকরের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ঘুরেন নাই। কোন আশ্রিত অনুগত সেবক বিপদগ্রস্ত হইয়া করুণাবতার হরনাথের আশ্রয় ভিক্ষা করিলে হরনাথের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। তখন তিনি কি উপায়ে তার মঙ্গল করিতে পারেন চিন্তা করিতে থাকিলে তাঁর দিব্য দৃষ্টি খুলিয়া যাইত, তাই তিনি সেই সময়ের জন্যই কেবল ঐ বিপদগ্রস্ত লোককে কি উপায়ে রক্ষা পাইবেন, বলিয়া দিতেন। নিম্নে উদাহরণ দিলাম। ইহা পাঠে বুঝা যায়, হরনাথ পূজা পাইবার জন্য তাঁর যাদুগিরি দেখান নাই। অস্বাভাবিক কার্য্যগুলি হইতেই হরনাথের প্রাণের ভালবাসার গভীরতাই দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) সুরেন্দ্রনাথ মিত্র রেলওয়ে হেড অফিস হইতে তুণ্ডলার রেল ষ্টেসনে রেলের টিকিট Booking Officeএ বিক্রয় জন্য লইয়া যাইতেছিলেন টিকিটের packing boxটী তাঁহার নিকটে ছিল। সুরেন বাবু গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন, সুরেন বাবুর কামরায়

একজন জমিদার বাবু ছিলেন, তিনি তাঁর গন্তব্য ষ্টেসনে নামিলে, জমিদার বাবুর চাকরেরা অন্যান্য দ্রব্যের সহিতে টিকিটের packing box নামাইয়া লন। সুরেন বাবু তুণ্ডলায় নামিলে তাঁর প্যাকিং বাক্স দেখিতে পান না। রেলওয়ে কোম্পানি অবিক্রীত রেলের টিকিটকে নগদ টাকা বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন তাই সুরেন বাবুকে রেলের কর্তৃপক্ষীয়েরা পুলিষের হাতে সমর্পণ করেন। সুরেন বাবুকে পুলিসের হাজতে থাকিতে হয়। সুরেন বাবু অতি কাতর-ভাবে হরনাথকে পত্র লেখেন, তিনি এক বৎসর দুই বৎসর জেল খাটার জন্য চিন্তা করেন নাই, তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যারা কি করিবে ও তাঁর চাকরি যাইলে আত্মহত্যা ছাড়া উপায় নাই এইভাবে ঠাকুরকে জানান। হরনাথ সুরেন বাবুকে ভালবাসিতেন, তাই তাঁর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিলেন টিকিটগুলি পাওয়া যাইবে। ঠাকুর সুরেন বাবুকে লিখিলেন—"কোন চিন্তা করিও না, কৃষ্ণ মঙ্গলই করিবেন।" জমিদার ভদ্র লোকটী কএকদিন পরে টিকিটের বাক্সটী রেল ষ্টেসনে জমা দিয়াছিলেন। রেলওয়ে কোম্পানি সুরেন বাবুর নামে মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লন। অসাবধানতার জন্য সুরেন বাবুকে ছয় মাসের জন্য ৫৲ টাকা হিসাবে মাহিনা কম লইতে হইয়াছিল।

(২) অটল বিহারী শূল বেদনার বিষয় ঠাকুর হরনাথকে বলিয়াছিলেন, ঠাকুর রোগ হইতে মুক্তি পাইবার উপায় অটলকে বলিয়া দিয়াছিলেন এইরূপ নূতন লোককে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিলেন কেন? সরল অটলবিহারী অতি কটুবাক্য হরনাথকে বলিয়াছিলেন ইহাতে তিনি বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন। স্পেশাল ট্রেণ আসিবার কথা ষ্টেসনে রটিয়াছিল এইজন্য সকলেই টিকিট চাহিয়াছিল কিন্তু হরনাথ যখন টিকিট চাহেন তখন তাঁকে কটুবাক্য বলেন। হরনাথের নিকট অটল কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, অটলের সরলতা দেখিয়া তাঁকে ক্ষমা করিয়াছিলেন ও তাঁকে নিজজন বলিয়া গণ্য করেন।

উপরোক্তভাবেই অস্বাভাবিক ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল কিন্তু এখন অনেক অসত্য ঘটনা অনেকেই প্রচার করিতেছেন। যে সকল কথা পূর্ব্বে কখন কেহ

শ্রবণ করেন নাই এইরূপ অসম্ভব গল্প প্রচার করিয়া ঠাকুর হরনাথকে অবতার প্রমাণ করিতে গিয়া তাঁহাকে পেশাদার যাদুকররূপে বর্ণনা করিতেছেন।

পাগল হরনাথ পুস্তকের পরিশিষ্ট অংশেও অনেকগুলি চতুর লোকের কেরামতি লক্ষিত হয়। ধর্ম্মগ্রন্থে কি ভাবে প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রবেশ করিয়াছে তাহা পত্রাবলীর পরিশিষ্ট অংশের আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়। এই পরিশিষ্টের একটী মাত্র উদাহরণ দিব।

তৃতীয় ভাগ পাগল হরনাথ পুস্তকের পরিশিষ্ট অংশের ২৯ পৃষ্ঠায় চুঁচড়ার নন্দলাল পালের পত্র ছাপা হইয়াছে। নিম্নে ছাপা অংশ তুলিয়া দিলাম।

"লেখক শ্রীযুক্ত নন্দলাল পাল, ষণ্ডেশ্বরতলা, চুঁচড়া" :—

"প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল আমি জম্বুতে ঠাকুরের বাড়ীতে ছিলাম। একদিন আহারান্তে যখন বিশ্রাম করিতেছিলাম ঠাকুর আমায় হঠাৎ বলিলেন 'বাড়ীতে মা আজ কেন এত অস্থির হইয়া কাঁদিতেছেন। তাঁহার চিন্তার কোন কারণ নাই; আপনি তাঁহাকে পত্র লিখুন, বৃথা যেন চিন্তা না করেন।' ঘড়ি দেখিলাম বেলা তখন প্রায় তিনটা। ঠাকুরকে বলিলাম 'আমার স্ত্রী কাহার জন্য কাঁদিতেছেন বা কিসের জন্য অস্থির হইয়া কাঁদিতেছেন?' তিনি বলিলেন 'জামাই বাবাজীর জন্য, তাহার অসুখের কথা শুনিয়া কাঁদিতেছেন!' বাড়ীতে পত্র না লিখিয়া দুই দিন পরে জম্বু হইতে ফিরিলাম। শ্রীবৃন্দাবন হইয়া বাড়ী আসিতে ৯ দিন বিলম্ব হইল। বাড়ী আসিয়াই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে ঠিক ঐ দিনে ঐ সময়ে জামাই বাবাজীবনের অসুখের কথা শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া ঘরের মেজেতে পড়িয়া কাঁদিতেছিলেন। ঠাকুরের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম ঠিক মিলল।

"আর একদিন যখন শ্রীনগরে ছিলাম বেলা প্রায় এগারটা, তখন বলিলেন একটা "তার" (Message) আসিতেছে। প্রায় এক ঘণ্টার পর একটা Telegram আসিল, লেখা ছিল, 'Gopal dying Doctors say case hopeless" অনেক চিন্তার পর ঠাকুর বলিলেন 'গোপাল ভাল আছে' এক ঘণ্টা পরে পুনশ্চ টেলিগ্রাম আসিল, 'Gopal better, case hopeful' কয়েক দিন পরে পত্রে জানা গেল. গোপাল বাবু সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস, রাওলপিণ্ডিতে চাকুরী করেন।"

১৯০৭ সালে নন্দলাল ও গোষ্ঠবিহারী শীল বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে হাতরাস জংসন ষ্টেসনে অটলবিহারী নন্দীর সহিত পরিচিত হন। কথায় কথায়

আগামী বৎসর অমরনাথ তীর্থে যাইবেন এই কথা নন্দ পাল অটল বিহারীকে বলেন। কাশ্মীর অমরনাথ তীর্থে যাইলে হরনাথ ঠাকুরের বাসায় অবস্থান করিতে নন্দ পালকে অটলবিহারী বলেন। পর বৎসর ২৭শে জুন ১৯০৮ সালে নন্দপাল ও গোষ্ঠবিহারী শীল রাওলপিণ্ডি হইয়া শ্রীনগর সহরে ঠাকুর হরনাথের বাসায় গিয়া পৌঁছান। সেই সময় ঠাকুর, ঠাকুরাণী, অনুকূল, কৃষ্ণদাস ও হরনাথের বড় ভ্রাতা শিবনারায়ণের পুত্র গোকুল শ্রীনগরে ছিলেন। অনুকূল ও গোকুল কাশ্মীরে থাকিয়া সেই সময় ম্যাট্রিক পড়িতেছিলেন। ১লা আগষ্ট ১৯০৮, নন্দ পাল, গোষ্ঠবিহারী, অনুকূল ও গোকুল শ্রীনগর হইতে অমরনাথ তীর্থের পথে রওনা হন। ১৫ই আগষ্ট তাঁহারা শ্রীনগরে ফিরিয়া আসেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯০৮ নন্দ পাল ও গোষ্ঠবিহারী শীল কলিকাতা অভিমুখে রাওলপিণ্ডি হইয়া রওনা হন। ঠাকুর ও তাঁর পরিবারবর্গ ২৫শে অক্টোবর ১৯০৮ সালে শ্রীনগর হইতে রাওলপিণ্ডি হইয়া জাম্মু রওনা হন। নন্দ পাল একবার মাত্র শ্রীনগরে গিয়াছিলেন, তিনি জাম্মুতে যান নাই। ঠাকুরের ভক্তগণের মধ্যে মাধব ঘোষ ও হেম ঘোষ জাম্মুতে গিয়াছিলেন। পত্রাবলী পুস্তকে নন্দপালের এই পত্র প্রকাশিত হইলে নন্দ পাল অতিরঞ্জিত পত্র প্রকাশের জন্য প্রতিবাদ করেন। তবে এ অতি রঞ্জিত পত্র লিখিল কে? ১৯১২ সালে যখন এই পাগল হরনাথ পুস্তক রামরাখাল ঘোষের ইণ্ডিয়া প্রেসে (India Press) ছাপা হয় তখন তারক নাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর প্রুফ দেখার, ভাগবত মিত্রের উপর পত্র সংগ্রহ ও কপি করার ও রামরাখাল ঘোষ ও তাঁর প্রেসের ম্যানেজার চিন্তাহরণ গুহের উপর পুস্তক প্রকাশের ভার ছিল। ভাগবত মিত্রের উপর পত্রাবলী পুস্তকগুলি হইতে উপদেশ সংগ্রহ করা ভার ছিল। এই সংগৃহীত উপদেশগুলিই "উপাদেশামৃত" নামে পুস্তক আকারে বুক কমিটি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের বিভাগ ঠাকুর করিয়া দিয়াছিলেন। নন্দ পালের পত্র সম্বন্ধে কেহ কিছু জানেন না এই কথাই সকলে বলিয়াছিলেন।

গোপালচন্দ্র দাস রাওলপিণ্ডির মিলিটারি একাউণ্টস্ অফিসে কাজ করিতেন ও রাওলপিণ্ডি ক্যানণ্টনমেণ্টে সুজান সিংএর হাতায় থাকিতেন, ঠাকুর শ্রীনগর হইতে জাম্মু বা জাম্মু হইতে শ্রীনগর যাইবার পথে রাওলপিণ্ডি অবস্থানকালে গোপাল দাস ইত্যাদি সকলের সঙ্গে মিলিত হইতেন ও গোপাল দাসের বাড়ীতে কয়েকবার ছিলেন ও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। গোপাল দাসের রাওলপিণ্ডি অবস্থানকালে টাইফয়েড জ্বর হয়, ইহার জন্য Gopal dying বলিয়া পত্র বা

telegram করেন নাই। গোপাল বাবু ১৯১৪ সালে জারমান গ্রেট ওয়ারের (The Great War) সময় রাওলপিণ্ডি হইতে Controller of Military Accounts, Western Command, Poona, অফিসে বদ্‌লি হন ও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে পেন্সন লন। তিনি এখন সুস্থ শরীরে জীবিত আছেন ও কলিকাতায় ৪৪নং শম্ভু বাবুর লেনে থাকেন।

উপরোক্ত মিথ্যা গল্পের আশ্রয় লইয়া ঠাকুর হরনাথের জীবনী লেখকগণ কত প্রকারের অসত্য গল্পের অবতারণা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা অসাধ্য। এই মিথ্যা গল্পের প্রবল স্রোত বন্ধ করিবার কাহারও শক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ সরল বিশ্বাসী লোকেরা বিচারশূন্য হইয়া এই সকল গল্পে আনন্দ অনুভব করেন; ইহাই সাধারণ মানব স্বভাব। ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব হইতে আরম্ভ করিয়া যে সকল মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন যথা (১) বুদ্ধদেব, (২) শঙ্করাচার্য্য, (৩) গুরুনানক, (৪) বল্লভাচার্য্য, (৫) গৌরাঙ্গদেব, (৬) রামানুজাচার্য্য, (৭) তুলসীদাস, ৮) কবির, (৯) নিম্বার্কাচার্য্য, (১০) রামকৃষ্ণ, (১১) তৈলঙ্গ স্বামী, (১২) ভাস্করানন্দ স্বামী, ১৩) বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, (১৪) দয়ানন্দ সরস্বতী ইত্যাদি মহাত্মগণ যে প্রকার হাব, ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন, হরনাথ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হরনাথ মূল্যবান কাপড়, জামা, জুতা পরিতেন যেন বিলাসী পুরুষের আদর্শ ছিলেন। তিনি একজন চা খোর ছিলেন। তিনি মৎস্য খাইতেন, পেঁয়াজ খাওয়াও তাঁর অভ্যাস ছিল। দাবা ও পাশা খেলিতে বিশেষ আনন্দ পাইতেন। ছিপে মাছ ধরিতেন, তাঁর নিজের মাছধরার সরঞ্জাম ছিল। পান, জরদা, মেনথল (menthol) খাইতেন। তামাক, বিড়ি ও উৎকৃষ্ট সিগারেটের ধূমপান করিতেন। পাখী ইত্যাদি নানা প্রকারের জীব, জন্তু পুষিয়াছিলেন। তাঁহার টম কুকুর মরিয়া গেলে তিনি বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলি কখন তিনি গোপনভাবে করেন নাই, সকলের সম্মুখে করিয়াছিলেন। মুখর জগৎ এই সকল কার্য্য করিতে দেখিলে তাঁহাকে মহাত্মা, মহাপুরুষ বা অবতার বলিবে না, এ ভয় তাঁহার একেবারেই ছিল না। ঠাকুর হরনাথ তাঁহার সারা জীবনে কখন কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ নিজে উচ্চারণ করেন নাই, কোন প্রকার কীর্ত্তনে তিনি যোগদান করেন নাই। তাঁহার নিকটে খোল, করতাল লইয়া কেহ কীর্ত্তন করিলে তিনি তাহাতে যোগদান করিতেন না। একবার শরৎদের বরাহনগরের বাগান বাড়ীতে অবস্থানকালে রাত্রি ২টার সময়

উপর হইতে নামিয়া আসিয়াছিলেন, জনকয়েক যুবক সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন করিবে বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছিলেন। ঠাকুর সেই ঘরে প্রবেশ করেন ও কীর্ত্তনকারী-দিগকে বলেন "এ বেশ্যাবৃত্তি করিতেছ কেন?" তাঁহার তিরস্কার শুনিয়া সকলে কীর্ত্তন বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঠাকুর হরনাথ নিজে কখন কখন একাকী গান করিতেন। এই গান "রাধাগোবিন্দ জয়, রাধাগোবিন্দ জয়" নহে, ইহা করুণ প্রেমের গান। এই ভাবের গান কেহ একাকী গাহিলে ঠাকুর বিশেষ আনন্দ পাইতেন। ঈশ্বরকে কি ভাবে ভালবাসিতে হয় এই শিক্ষা দিয়াছিলেন, তবে যাঁহারা ভালবাসা কি বা কি প্রকারে ভালবাসা শিক্ষা করা যায়, জানিতে চাহিতেন না তাঁহাদিগকে পত্রে বা উপদেশচ্ছলে কৃষ্ণনাম করিতে বলিতেন। ঠাকুর যখন কৃষ্ণ বিষয়ক কথা বলিতেন তখন ভালবাসা বা প্রেম সম্বন্ধেই বক্তৃতা করিতেন। চৈতন্যদেবের সহিত হরনাথের তুলনা করিলে, এই বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। চৈতন্যদেব কৃষ্ণ কৃষ্ণ বা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি নানাপ্রকারের নাম গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেন, কিন্তু হরনাথ একদিন ও ঐ ভাবে কীর্ত্তনে নৃত্য করেন নাই। চৈতন্যদেব বিধিমার্গে ছিলেন ও সকলকে বিধিমার্গে চলিতেই ঈঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন ও গোস্বামিগণ গ্রন্থ রচনা করিয়া বিধিমার্গে থাকিতে সকলকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। হরনাথ বিধিমার্গে নিজে চলেন নাই। কাহাকেও বিধিমার্গে চলিতে বলিতেন না। গুরু মহাশয় হিসাবে চৈতন্যদেব প্রথম পাঠ শিখাইতে আসিয়াছিলেন, হরনাথ আসিয়াছিলেন দ্বিতীয় পাঠ প্রেমতত্ত্ব শিখাইতে। যাঁহাদের প্রথম পাঠ এ জন্মে বা পূর্ব্ব জন্মে শেষ হইয়াছে তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় পাঠ আরম্ভ করাইতে অধ্যাপক ভাবে হরনাথ আসিয়াছিলেন। জীবনী লেখকগণ ও আধুনিক ভক্তগণ প্রচার করিতেছেন যে হরনাথ নাম প্রচার ও কতগুলি আজগুবি অলৌকিক কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন। এই সকল অসত্য অলৌকিক কার্য্যগুলি যাহা তাঁহারা দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন তাহা প্রচারিত করিবার উদ্দেশ্যে পুস্তক ছাপাইয়া বিতরণ করিতেছেন। তাঁহারাই হরনাথ তত্ত্ব বুঝিয়াছেন ও নিজেরাই গৌরগণ নির্দ্দেশ করিয়া লইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোহান্তরূপে হরনাথ-ভক্ত-সমাজে প্রচারিত হইবার ও পূজা পাইবার প্রত্যাশায় পুস্তক ও নিজের ছবি ছাপাইয়া বিতরণ করিতেছেন।

হরনাথ যে কি বস্তু তাহা তিনি কাহাকেও বুঝিবার অবসর দেন নাই।

ভক্তশ্রেষ্ঠ অতি সরল গাতরায়ের অটলবিহারী নন্দীর বিষয় আলোচনা করিলে এই বিষয়টী বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। হরনাথ ভক্তদিগের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন, উঠিয়াছিলেন, বসিয়াছিলেন অতএব ভক্তগণ যে নিশ্চয় পুনর্জন্মের হাত হইতে এড়াইতে পারিবেন ও নিশ্চয় বৃন্দাবনের প্রেমলাভ করিবেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিনা সাধনায় এইরূপ আশা হৃদয়ে পোষণ করা যায় কিনা ইহারই আলোচনা করিব। অটলবিহারী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হরনাথের সহিত পরিচিত হন ও হরনাথ তাঁহাকে রাধাগোবিন্দের নাম করিতে বলেন। রাধাগোবিন্দের নাম গ্রহণ করিলে অম্লশূল রোগ হইতে মুক্তি পাইবেন, হরনাথ বলিয়াছিলেন। হরনাথ গুরুকরণ করিয়া রাধাগোবিন্দের নাম গ্রহণ করিতে হইবে এ কথা বলেন নাই। হরনাথ প্রদত্ত রাধাগোবিন্দের নাম বিনা অনুষ্ঠানে গ্রহণ করিতে অটলবিহারী দ্বিধা বোধ করিয়াছিলেন তাই তিনি নিজেদের কুলগুরু দ্বারা অনুষ্ঠানের সহিত বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। অটলবিহারী ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত হরনাথ দ্বারা লিখিত ভিন্ন ভিন্ন ভক্তগণের পত্রসকল সংগ্রহ করিয়া ১৯০৫ সালে পুস্তক আকারে ছাপান। ঐ পুস্তকে হরনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী বাহির হইয়াছিল। এই জীবনী পড়িয়া অটলবিহারী কি চোখে হরনাথকে দেখিতেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই, কারণ, জীবনী লিখিয়াছিলেন ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য্য ও অনুকূল মুখোপাধ্যায়, এই জীবনীতে অটল বিহারীর দ্বারা লেখা একটা কথাও নাই, অধিকন্তু এই দুইজনকেই অটলবিহারী কটু কথা বলিয়া গালিগালাজ করিতেন। এই জীবনীতে এমন সব কথা লেখা হইয়াছে যাহা কেহ কখন সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। মিথ্যা চিরকালই মিথ্যাই থাকিবে।

হরনাথ সম্বন্ধে অটলবিহারীর কি বিশ্বাস ছিল তাহা বুঝিবার অন্য উপায় আছে। অটলবিহারী অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি নিজে জীবনী লিখিলে একটীও অসত্য কথা লিখিতেন না। বালেশ্বরের জমিদার রাধাচরণ দাস ঠাকুর, ঠাকুরাণী ও অন্যান্য ১৭।১৮ জন ভক্তকে বালেশ্বরে লইয়া গিয়াছিলেন। অটলবিহারী ও ভাগবত সেই সঙ্গে ছিলেন। বালেশ্বরে অবস্থানকালে বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত পুস্তকে হরনাথ জীবনীতে অনেক অসত্য কথা ছাপা হইয়াছে অটলবিহারী জানিতে পারেন, কারণ, জীবনীর ঘটনাগুলির সত্যাসত্যতা অটলবিহারী বিচার করেন নাই। অটলবিহারী এই অসত্য ঘটনার উল্লেখের বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন ও কি করা কর্ত্তব্য ইহার মীমাংসা করিবার জন্য

ঠাকুর হরনাথ যে স্থানে বসিয়াছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া ক্ষীরোদের কীর্ত্তির কথা ঠাকুরকে কাঁদ কাঁদ সুরে বলেন। ঠাকুর সকল কথা শুনিয়া বলেন "তুই যে কেঁদে ফেলেছিস্ যাহা হইয়াছে তার উপায় কি? তুই চুপ করে বসে থাক যা করিতে হয় আমি করিব।" এই ঘটনাটী ১৯০৮ সালের কথা। অটলবিহারী আর তাঁহার প্রকাশিত দুই খণ্ড পুস্তক নিজের হাতে রাখিতে অনিচ্ছুক হন। হরনাথ, পুস্তক দুইখানি ভাগবতের হাতে দিতে বলেন ও অটলবিহারী ঐ দুইখানি পুস্তকের সত্ত্ব ভাগবতের নামে লিখিয়া দেন। এই সত্ত্বের পত্রখানি ভাগবত ২৪নং মিডিল রোডের রামরাখাল ঘোষের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। এই মিডিল রোডের বাড়ীতে 'হরনাথ বুক কমিটি' স্থাপিত হয়। এই কমিটি দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ ও চতুর্থ ভাগ পত্রাবলী ও উপদেশামৃত প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বুক কমিটিই পরে হরনাথ তত্ত্ব প্রচারিণী সমিতি তৎপরে হরনাথ তত্ত্ব প্রচারিণী সভা নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনের আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়, ইহার কিছু পূর্ব্বে অটলবিহারী রেলের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। সন ১৩৩০ সালের শিবরাত্রির পর দিন তিনি অমরধামে চলিয়া যান। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে অটলবিহারী ভেক লইবার ইচ্ছা করেন, হরনাথ তাঁহাকে নিষেধ করেন, কিন্তু অটলবিহারী ঠাকুরের নিষেধ না শুনিয়া বৃন্দাবনের ব্যাসের ঘেরার স্বরূপদাস বাবাজীর নিকট হইতে ভেকের দীক্ষা গ্রহণ করেন। অটলবিহারী ব্রজবাস সার্থক করিবার জন্য ডোর কৌপীন বহির্বাস গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুক হইয়াছিলেন। হরনাথের কথায় অটলবিহারী সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি যদি হরনাথকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি হরনাথের কথা অনুসারে কার্য্য করিতেন, কখন ভেক লইতেন না। অটলবিহারীর ন্যায় ভক্তকে হরনাথ যখন তিনি কে বুঝিতে দেন নাই, তখন অন্য পরে কা কথা।

অন্য আর একটী বিষয়ে হরনাথ যে কে অটলবিহারীকে বুঝিতে দেন নাই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অটলবিহারী তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে একটী রেজেষ্ট্রীকৃত উইল করেন। অটল বিহারীর সন্তানাদি কিছুই ছিল না, ঐ উইলে লেখা ছিল যে তাঁর স্ত্রীর দেহান্তে সমস্ত সম্পত্তি ও নগদ টাকা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ পাইবেন। এই ভ্রাতুষ্পুত্রগণ চিরকাল তাঁর শত্রুতা করিয়াছিলেন কিন্তু অটলবিহারী উদার-ভাবে বা সংসারের মোহবশতঃ তাহাদিগের কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। এই

উঠিলে অটলবিহারী তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরুকে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন ও হরনাথকে ২০৲ টাকা মাত্র দানের কথা লিখিয়াছিলেন। ঠাকুর হরনাথ এই বিষয় জানিতেন ও ইহার সম্বন্ধে হরনাথকে বলিতে শুনিয়াছি যে ২০৲ টাকার কথা না লেখা থাকিলেই ভাল হইত। আমার মনে হয় অটলবিহারীর নিকট হরনাথ কি বস্তু প্রকাশিত হন নাই তাই অটলবিহারী হরনাথকে মাথাল ঠাকুর মনে করিয়াছিলেন।

উপরি উক্ত বিষয় আলোচনায় বেশ বুঝা যায় যে হরনাথ কাহাকেও বুঝিতে দেন নাই, তিনি কে আসিয়াছিলেন। হরনাথ তাঁর গ্রামবাসী বা নিজের বাড়ীর কাহাকেও বুঝিতে দেন নাই যে তিনি কোন সিদ্ধপুরুষ, আবেশ অবতার, অংশ অবতার চৈতন্যদেব বা শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন। এখন যাঁহারা চিৎকার করিয়া বলিতেছেন যে তাঁহারা হরনাথ কি বস্তু বুঝিয়াছেন তাঁহাদিগের বুঝার গভীরতা কত সন্দেহের বিষয়। এমন প্রাচীন ভক্ত দেখিয়াছি যিনি দ্বিতীয় হরনাথ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিলেন যাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দিবার অধিকার হরনাথ দিয়াছিলেন, হরনাথ নাম উচ্চারণ করিলে যাঁহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইত তিনিই সোণামুখীর নাপিত ডাঙ্গার জমি খরিদ কালীন মধ্যস্থতা করিতে গিয়া হরনাথের উপর সমস্ত বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। অনেক ভক্তকে দেখিয়াছি যাঁহারা হরনাথকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিয়া পাঁচ সাত বৎসর পরে ধোপার ধোপে তাঁহাদিগের হরনাথ রং উঠিয়া গিয়াছে যাঁহারা জানিয়া শুনিয়া ব্যবসাদারী হিসাবে মিথ্যা গল্প রচনা করিয়া হরনাথকে অবতার প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাঁহাদিগের হরনাথ রং অচিরাৎ ধোপে উঠিয়া যাইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২৯ পৃষ্ঠায় কনকলতা ঠাকুরাণীর উপাখ্যান দেওয়া হইয়াছে। এই উপাখ্যান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। এই উপাখ্যান মধ্যে যে সকল গল্পের অবতারণ করা হইয়াছে, ইহা লেখকের নিজের রচনা গল্প নহে, লেখক যেমন বন্দ্যোপাধ্যায় বংশধরগণের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন সেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মাতা ঠাকুরাণী কুসুমকুমারী ও রাধাশ্যামসুন্দরের অন্যান্য সেবাইত সোণামুখীর যজ্ঞেশ্বরের বংশধরগণ এখনও এই সকল গল্প করিয়া থাকেন। প্রচলিত গল্পগুলির উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা অসম্ভব। বিশিষ্ট ভক্তকে শ্রীভগবান কৃতার্থ করিবার জন্য অলৌকিক কার্য্য দেখাইতে পারেন কিন্তু সাধারণ লোকে সেই সকল কার্য্য দেখিতে পাইবে ইহা অসম্ভব বলিয়া

মনে হয়। এইরূপ বর্ণনা যেখানেই দেখা যায় সেইখানেই অতিরঞ্জিত বলিয়া ধারণা হয়।

পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬৭ পৃষ্ঠায় **"পাগল হরনাথের স্ত্রী কুসুম-কুমারীর পিতামহ বংশ"** বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। এখন আরও উর্দ্ধতন পূর্ব্ব পুরুষের নাম অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কুসুমকুমারীর পিতার বংশ সারস্বত ব্রাহ্মণ বংশ, গোত্র ও প্রবর বাৎস। ত্রিবেণী, এলাহাবাদে বাস ছিল। পরে মার্কণ্ডের বংশ বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন।

গৌরী শঙ্কর (ত্রিবেণী, এলাহাবাদ)

কুসুমকুমারীর অন্য এক ভ্রাতার নাম উল্লেখ করিতে ভুল হইয়াছে। এই ভ্রাতার নাম কালীপদ, জ্যোতির্ম্ময়ের ছোট ছিলেন তৎকন্যা সাবিত্রী (অপুত্রক)।

(১) ৩৭ পৃষ্ঠায়—"ঘ" (৩৭ পঃ) যাদবেন্দ্র তৎপুত্র (১) ভৈরব (৩৮) নিঃসন্তান ও (২) প্রতাপ (৩৮) প্রতাপের দুই পুত্র (১ম) প্যারী (৩৯) তৎপুত্র বঙ্কিম ও গঙ্গা (৪০)
এই গঙ্গার (৪০) স্থলে "তুলসী" (৪০) হইবে।

(২) ৫১ পৃষ্ঠায় - ভগবতী দেবী জন্মগ্রহণ করেন (ইং সেপ্টেম্বর ১৮২৪ সাল ছাপা হইয়াছে, ১৮২৮ সাল হইবে)।

(৩) ৫৪ পৃষ্ঠায়—"৮ নং জয়রামের চতুর্থ পুত্র শিবনারায়ণের ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৭০ সালে জন্ম হয়। মৃত্যু ১২ শ্রাবণ ১৩৩০ সাল, ইংরাজি ২৮ জুলাই ১৯২৩ সাল। শনিবার কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ তিথি।

(৪) ৫৯ পৃষ্ঠায়—তৃতীয় লাইনে—"কৃষ্ণদাসের চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পুত্রগণের নাম সুবল সখা, বসন্ত, তুলসীদাস ও চন্দন।" ইহাতে ভ্রম আছে, এইরূপ হইবে, যথা—"কৃষ্ণদাসের তিনটী পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পুত্রগণের নাম সুবল সখা, বসন্ত ও তুলসীদাস, কন্যার নাম চন্দন"।

(৫) ৫৯ পৃষ্ঠায়—শেষের দুই লাইন ভ্রমবশতঃ দ্বিতীয়বার উল্লেখ হইয়াছে। পূর্ব্বে ৫৬ পৃষ্ঠায় জয়রামের ষষ্ঠ কন্যা বগলার উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৬) ৬২ পৃষ্ঠায়— (৩৯) প্যারীর—দুই পুত্র—(৪০) রতন ও গঙ্গা এই (৪০) রতন ও গঙ্গার স্থলে "(৪০) বঙ্কিম ও তুলসী" হইবে।

(৭) ১১২ পৃষ্ঠার—চতুর্থ লাইন হইতে ১০ম লাইন পর্য্যন্ত অর্থাৎ "হইয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরের অতি বৃদ্ধ পিতামহকে ইত্যাদি হইতে কাটোয়ার সন্নিকট কোন গ্রাম'' পর্য্যন্ত ভ্রমপূর্ণ ছাপা হইয়াছে। এই সাত লাইনের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত প্রকার লেখা হইবে, যথা—''হইয়াছিল। ৩১ পঃ) যজ্ঞেশ্বরের পূর্ব্বপুরুষ (১৭পঃ) চতুর্ভুজকে কোন বিশিষ্ট রাজা মল্লভূমে আনাইয়া বাস করাইয়াছিলেন। একশত বৎসরে চারি পুরুষ বর্ত্তমান থাকিলে ৬০০ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবতঃ বিষ্ণুপুরের রাজা পৃথ্বীমল্ল তাঁর রাজত্বকালে (১২৯৫ খৃঃ হইতে ১৩১৯ খৃঃ) যজ্ঞেশ্বরের পূর্ব্ব পুরুষ চতুর্ভুজকে কাটোয়ার সন্নিকট কোন গ্রাম।''

(৮) ১৩৯ পৃষ্ঠার—১৯ লাইনে—"বামরা গ্রাম নিবাসী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি, এ." ছাপা হইয়াছে" এই লেখাতে ভ্রম আছে যথা—"বামরা গ্রাম নিবাসী রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়" রামবাবু বি, এ, পাস করেন নাই বা বি-এ ক্লাসে পড়েন নাই।

রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, নহেন) খৃষ্টান মিসানারিদিগের দ্বারা পরিচালিত কলিকাতার ডফ স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাস করেন। রামনারায়ণ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, রামবাবুর একজন আত্মীয় বাঁকুড়ার রামনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামনারায়ণকে আগ্রায় লইয়া যান ও আগ্রার গভর্ণমেণ্ট কলেজে পড়িবার সুযোগ করিয়া দেন। রামনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঐ আগ্রার কলেজের অঙ্ক শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। সেই সময়ে আগ্রার কলেজ কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। রামনারায়ণ, এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে নিজের গ্রাম বামরায় ফিরিয়া আসেন ও বি, এ, পড়িবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি নিজ গ্রাম বামরায় একটী M. E. School স্থাপন করেন কিন্তু এই স্কুল সম্বন্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রামনারায়ণ বাবু অযোধ্যার M. E. School এর হেডমাষ্টার হইয়াছিলেন ও এই স্কুল হাইস্কুল হইলে তিনিই হেডমাষ্টার হন, সেই সময়ে হরনাথ অঙ্কশাস্ত্রের দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে মাসিক ২৫৲ বেতনে অযোধ্যার স্কুলে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ও রামনারায়ণ হেড মাষ্টারের ভ্রাতা রামকিশোর তৃতীয় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হরনাথ কুচিয়াকোল স্কুল হইতে ১৮৮৫ খ্রীঃ এণ্ট্রান্স পাস করেন ও বর্দ্ধমান-রাজ কলেজ হইতে এফ, এ, ১৮৮৭ খ্রীঃ পাস করিয়াছিলেন, অতএব রামনারায়ণ বাবু হরনাথের স্কুল বা কলেজের বন্ধু ছিলেন না। রামনারায়ণ বাবু ১৯২৮ সালে কলিকাতার গোলক দত্ত লেনের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে কাল-কবলিত হইয়াছেন। ১৯২৫ সালে রামনারায়ণ বাবু জীবনে একবার মাত্র সোণামুখীতে গিয়াছিলেন ও ঠাকুরের বাড়ীতে দুইদিন ছিলেন।

হরনাথের অযোধ্যায় শিক্ষকতা করা কালীন একদিন হরনাথ, রামনারায়ণ ও রামকিশোর দ্বারকেশ্বর নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। অযোধ্যা সহর দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে অবস্থিত—মধ্যে মধ্যে সকলে এই নদীতে স্নান করিতে যাইতেন। একদিন নদীর তীরে মৃতদেহ সৎকারের শ্মশানে হরনাথ সদ্যোজাত একটি মৃতশিশুকে পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পান ও তৎক্ষণাৎ বস্ত্রাবৃত মৃত শিশুটির নিকটে গিয়া বস্ত্র উন্মোচন করিয়া শিশুটিকে নাড়িতে চাড়িতে থাকেন।

রামনারায়ণ হরনাথের এইকার্য্য দেখিয়া হরনাথকে সম্বোধন করিয়া বলেন "তুমি কি তান্ত্রিক সাধক হবে নাকি" ? হরনাথ উত্তরে বলেন তাহাতে দোষ কি। রামনারায়ণ হেডমাষ্টার একজন তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এই বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। হরনাথ যে একজন পরম বৈষ্ণব এই ভাব রামনারায়ণকে একদিনও দেখান নাই। রামনারায়ণের ভ্রাতা রামকিশোর যিনি অযোধ্যার স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন তিনি এখন ও জীবিত আছেন ও কলিকাতার কুমার-টুলির ৩৮বি বনমালী সরকার ষ্ট্রীটে বাস করিতেছেন।

হরনাথের ধর্ম্ম মত।

স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুস্থানে বেদ, দর্শন, তন্ত্র পুরাণাদি শাস্ত্রমতে আর্য্য সন্তানগণের ধর্ম্ম কর্ম্মাদির যে প্রকার বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ভেদাভেদ রহিত জ্ঞান দৃষ্টিতে তাহা প্রণিধান করিলে দেখা যায়, সকলের উদ্দেশ্যই এক, সকল শাস্ত্রেরই চরম লক্ষ্য মুক্তি। ঐ প্রশস্ত পথের এক সীমান্তে কামনা বাসনা জনিত শোক দুঃখ-ময় এই অসার সংসার, বিপরীত প্রান্তে অমৃতময় শান্তিপূর্ণ নিত্য সুখ। অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিলে সকল ধর্ম্মগ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য একই প্রকার দেখা যায়। সামান্য সামান্য বিভিন্নতা থাকিলেও মূল উদ্দেশ্য সকলেরই সমান।

যাঁহারা হরনাথের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বলেন হরনাথ হরিনাম ও সংকীর্ত্তন প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের প্রচারিত জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য নাম করা, এই পুরাতন ভাবকে নবজীবন প্রদান করিতে হরনাথ আসিয়াছিলেন। যদি হরনাথ সত্য সত্যই নাম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা হইলে তিনি চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের ন্যায় নাম ও সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়ান নাই কেন ? হরনাথের সন্নিধানে কেহ খোল করতাল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিলে তিনি তাহাতে যোগ দিতেন না কেন ? নাম প্রচার করা উদ্দেশ্য লইয়াই যদি হরনাথ আসিয়াছিলেন তাহা হইলে তিনি নিজের মুখে, অঙ্গুলির পর্ব্বে বা মালায় নাম জপ করিয়া শিক্ষা

দেন নাই কেন? চৈতন্যদেবের ৩৮১ বৎসর গতে হরনাথের জন্ম হয়। শাস্ত্র অনুসারে মানবের এক বৎসরে দেবতাদিগের একদিন হয় অতএব দেবতাদিগের ১ বৎসর ১৬ দিন পরে চৈতন্যদেব প্রচারিত জীবের একমাত্র প্রশস্ত ও মঙ্গলময় হরিনাম পথ, যে পথ তিনি নিজে সাধিয়া দেখাইয়া গেলেন তাহা এত শীঘ্র আবর্জ্জনায় পূর্ণ হইয়া গেল তাই চৈতন্যদেবকে এত শীঘ্র নামরূপ পথ পরিষ্কার করিবার জন্য হরনাথরূপে আসিতে হইয়াছিল ইহার অপেক্ষা দুঃখের কথা কি হইতে পারে? যদি চৈতন্যদেব ও হরনাথের উভয়ের একই উদ্দেশ্য নাম প্রচার করা হইত, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে এত বিভিন্নতা লক্ষিত হইত না। হরনাথকে আমরা বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তিনি নাম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছি। যাঁহারা বলিয়াছেন বা বলিতেছেন যে হরিনাম জপ ও হরিনাম কীর্ত্তন করাই কলির জীবের একমাত্র উপায় বা পথ এই তত্ত্বই হরনাথ প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহাদিগের সিদ্ধান্ত নানা কারণে স্বীকার করা যায় না।

উপস্থ নিগ্রহই যে ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় ইহা অনেকেই বলিয়া গিয়াছেন। আবার বিবাহ করিলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হইবে না ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ, তাহা চৈতন্যদেব বৃদ্ধ নিত্যানন্দকে বিবাহ করিতে বলিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। মহাত্মা শাণ্ডিল্য, কশ্যপ, ভৃগু, পুলস্ত্য, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ ইত্যাদি সকলেই দারপরিগ্রহ ও বহু সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা ঈশ্বরলাভ করেন নাই, একথা কেহই বলেন না। কিন্তু প্রেম বা ভালবাসা ব্যতীত ভগবান লাভ হইতে পারে না, একথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, আর কাম রহিত বিশুদ্ধ ভালবাসা লাভ করিতে হইলে, উপস্থ নিগ্রহ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। এইখানেই হিন্দুধর্ম্মের যত জটিলতা, মানব বুদ্ধির অগোচর। ঠাকুর হরনাথ সকলকেই বিবাহ করিতে বলিতেন, স্ত্রীবিয়োগে পুনরায় স্ত্রী গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। আবার প্রেম বা বিশুদ্ধ ভালবাসা অনুভব হইল না বলিলে তাহাকে যত্নপূর্ব্বক উপস্থ নিগ্রহ করিতে বলিতেন। নিম্নে একটী উদাহরণ দিলাম।

অটলবিহারী নন্দীকে ঠাকুর হরনাথ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"পার্থিব কামকে ছাড়িতে চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সদানন্দে থাকিতে হ'লে শুক্র শূন্য দেশে বাস করা কর্ত্তব্য, নিশ্চিন্ত থাকিতে হইলে শুক্র শূন্য দেশে বাস করিতে হয়, নচেৎ সদাই সন্তাপ সদাই ভয়।"

পাগল হরনাথ ৪র্থ খণ্ড ১৭৫নং পত্র।

উপরি উক্ত ঠাকুরের কথা সকল মহাজনগণই বলিয়া গিয়াছেন। এখানে কাম অর্থ কি বুঝিতে সকলেই পারেন। যাঁহাদের হাতের পাঁচ লাগিয়া আছে অথচ তাঁহারা গোপীপ্রেম কি বুঝিয়াছেন ও অন্যকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। বৃন্দাবন কি? গোলকধাম কি? সকলই বুঝিয়াছেন প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহারা কলিযুগের জুয়াচোর। হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া নহে, সকল ধর্ম্মের মধ্যেই এই শুক্র শূন্য দেশে বাস না করিলে পরাশান্তি বা প্রেম অনুভব করিবার অন্য উপায় নাই সকল শাস্ত্রই উচ্চকণ্ঠে ইহাই ঘোষণা করিতেছেন। মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন, "আমলি কর্‌কে করে ধ্যান, গৃহী হোকে বাতায় জ্ঞান, যোগী হোকে কুটে ভগ, এই তিন আদ্‌মি কলিকা ঠগ।" অর্থাৎ নেশা করিয়া ঈশ্বর ধ্যান করিতে বসে, ঘোর সংসারী হইয়া ঈশ্বর তত্ত্ব আলোচনা করে, ব্রহ্মযুক্ত সাধক রমণীতে আসক্ত হইয়া রমণ করে, এই তিন প্রকারের লোকেরা জুয়াচোর।

বিশুদ্ধ ভালবাসা বা প্রেম লাভ করিতে হইলে ঠাকুরের কথা উপেক্ষা করিলে চলিবে না। অতএব হরনাথ কি শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন বুঝা বড় সোজা কার্য্য নয়। তাঁহার সমগ্র জীবনচরিত আলোচনা করিয়া যদি তিনি কৃপা করিয়া কোন সময়ে তিনি কে আসিয়াছিলেন বুঝিতে দেন তবেই বুঝা যাইতে পারে নচেৎ অহঙ্কার বশতঃ ঠাকুরকে বুঝিয়াছি বলিলে চলিবে কেন? ২৪নং মিডিল রোড়স্থ রামরাখাল ঘোষের বাড়ীতে অবস্থানকালে সর্ব্বসমক্ষে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন "তোমরা কেন আমার নিকটে আস তাহা আমি বুঝি, তোমরা আমাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা কর, বাবা, দাদা বলিয়া ডাক, আমাকে পাগল মনে ক'রে আমার সহিত চতুরতা কর, মনে কর আমি কিছু বুঝি না, এই চতুরতা করাতে আমার ক্ষতি কি তোমাদেরই ক্ষতি। আমি তোমাদের নিকট হইতে পূজা চাহি না, টাকা পয়সা চাহি না, নকল ভাল্‌বাসা দেখান চাহি না, যদি পার সরলভাবে আমার সহিত মিশিও।"

আমরা ঈর্ষ্যা দ্বেষ ঘোরস্বার্থপরতা হৃদয়ে পোষণ করিয়া হরনাথের সহিত মিশিয়াছিলাম। হরনাথ পরস্পর ঈর্ষ্যা দ্বেষ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহার উপদেশ অমান্য করিয়াছি। ইহাতে হরনাথ কি বস্তু বা কোন রাজত্বের মহাপুরুষ, কেন বা আসিয়াছিলেন ইহা আমাদের নিকট স্ফূরণ হইবে কেন?

সন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে হরনাথ শিক্ষাসঙ্ঘ নামে (পূর্ব্বের নাম

হরনাথ সাধন সঙ্ঘ) একটি প্রতিষ্ঠান কলিকাতার বাগবাজারে স্থাপিত হয়। ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে হরনাথ পাঠশালা নামে একটী নৈশ বিদ্যালয় খোলা হয়। এই বিদ্যালয় খোলার সময় সঙ্ঘের সভ্যগণের মধ্যে বিদ্যালয় খোলা সম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা হয়। কেহ কেহ বলেন আমরা কেবল ঠাকুরের পূজা, তাঁর অলৌকিক কার্য্যাদির প্রচার করিব অন্যান্য সভ্যগণ সাধারণ হিতসাধক কার্য্যাদি করিতে চান। এমন সময় ঠাকুর একদিন সঙ্ঘের বাড়ীতে আসেন। বিদ্যালয় খোলা সম্বন্ধে তাঁহার কি মত জিজ্ঞাসা করা হয়। ঠাকুর উত্তরে বলেন "Science is one religiōn, prayer is another but they are two sisters. Mad as I am, I believe, study is better than worship"

ঠাকুর এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন তিনি অন্ধ বিশ্বাস একেবারে পছন্দ করিতেন না। স্থায়ী বিশ্বাস লাভ করিতে হইলে জ্ঞানের আবশ্যক, এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জ্ঞানী ব্যক্তিগণের লিখিত পুস্তক পাঠের আবশ্যকতা আছে। পুস্তক পাঠ উপেক্ষা করিলে সকলই বৃথা হইবে।

(১) সকলেই ঠাকুরের কথা শুনিয়াছিলেন কিন্তু সকলে ঠাকুরের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লন নাই। ঠাকুরের উপদেশ মত হরনাথ পাঠশালা খোলা হয়। এই পাঠশালার কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে থাকিলে ১৯২৪ সালে ঠাকুরের পিতা জয়রামের নামে একটী M. E. School খুলিবার জন্য সঙ্ঘের সভ্যগণ সঙ্কল্প করেন, এবারেও জন কয়েক সভ্য ইহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। সঙ্ঘের সভাপতি ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সোণামুখীতে ঠাকুরের কি মত জানিবার জন্য একখানি টেলিগ্রাম করেন, এই টেলিগ্রামের উত্তরে ঠাকুর যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন তাহার photo পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল :—
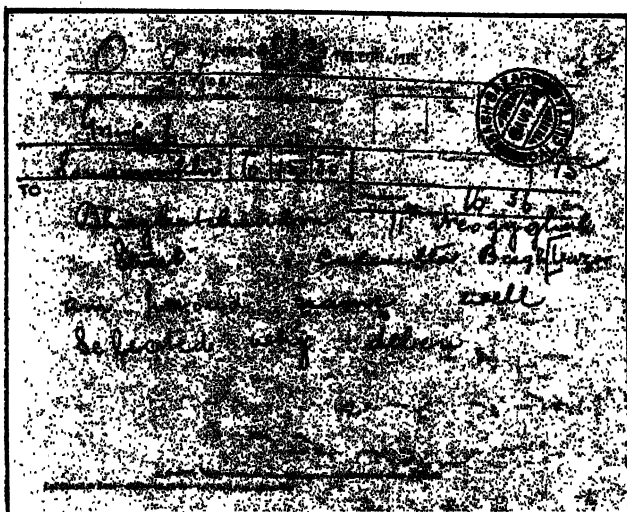
Reading of the telegram sent by Haranath.

(I, Haranath) am proud, name (of my father, Joyram) well selected why Deben (why the telegram sent by Dr. Debendra, President of the Sangha and not by you, Bhagbat)

ঠাকুরের নিকট হইতে উপরোক্ত ভাবে টেলিগ্রাম পাওয়া সত্বেও কয়েকজন হরনাথ ভক্ত আত্ম-গর্ব্ব ও অহঙ্কার বশতঃ ঠাকুরের কথা শুনেন নাই বরং নানা প্রকারে সঙ্ঘের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল ভক্ত হরনাথকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া থাকেন, ইঁহাদিগের হরনাথকে শ্রীকৃষ্ণ বলার কি অর্থ বুঝা যায় না।

২। হরনাথ শিক্ষা সঙ্ঘের সভ্যগণ ঠাকুর হরনাথের জন্মতিথি ধরিয়া জন্মোৎসব করিবার মনন করেন ও জন্মোৎসব করিয়াছিলেন। কিন্তু হরনাথের ভক্তগণ প্রমাদ গণিলেন ও চোখে সরিষার ফুল দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা সাধ্যমত এই জন্মোৎসব বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে ত্রুটী করিলেন না, কিন্তু তাঁহাদিগের সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। সঙ্ঘের সভ্যগণ এই গোলযোগ দেখিয়া

ঠাকুরকে এই জন্মোৎসবে আসিবার জন্য ডাকিলেন না, কিন্তু করুণাবতার হরনাথ দুঃখ করিয়া যে পত্র ভাগবত মিত্রকে লেখেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল—

ঠাকুর হরনাথের পত্রের সরল পাঠ নিম্নে দেওয়া হইল—

শ্রী

স্নেহের ভাগবত, বাবা আমি কলিকাতায় যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু ডাকিলে না, তাই গেলাম না, বাবা, তুমি সকলের জন্য এভাবে জীবন উৎসর্গ করেছ, আর আমি যাইব না এ চিন্তা নিতান্ত অমূলক হইয়াছিল। * * *

তোমার স্নেহের হর।

Translation of the above letter.

Affectionate Bhagbat

Son, I got ready for starting for Calcutta, but no response came from you, so I did not go. Dear, in this way you sacrificed your life for all, and without foundation had been the thought that I would not repair.

Your affectionately
Hara

জন্মোৎসব হইলে পর সংবাদপত্রে যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

Amrita Bazar Patrika, Calcutta, July 19th, 1924.

"The astrological Birthday Pujah of Thakur Haranath was celebrated on Thursday the 10th July 1924 etc etc—"

৩। শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বের সময় কাহারও অর্থ বা অন্য কোন দ্রব্যের কর্জ্জ করিবার আবশ্যকতা হইলে, এই কর্জ্জের জন্য কোন প্রকার লিখিত দলিল বা কোন সাক্ষী উপস্থিত থাকিত না, চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী স্বরূপ রাখিয়া কর্জ্জ দেওয়া হইত। এই প্রথা এখনও পল্লীগ্রামের নিরক্ষর চাষীদের মধ্যে আছে। কিন্তু শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কর্জ্জ করিয়া স্বাক্ষরিত দলিল প্রদান করিয়াও, কর্জ্জ অস্বীকার করিয়া থাকেন। হরনাথকে যাঁহারা ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পূজা করিয়াছিলেন ও এখন করিয়া থাকেন তাঁহারা যে সকলে সত্যপরায়ণ দেবতা হইয়াছিলেন তাহা নহে তাঁহাদিগের পূর্ব্বের যে মলিন স্বভাব ছিল তাহাই ঠাকুরের জীবিত কালে বর্ত্তমান ছিল। এখনও সেই পূর্ব্বের স্বভাবই আছে। ইহার কোন প্রকার ইতর বিশেষ হয় নাই, একজন ভক্ত অন্য আর একজন ভক্তকে প্রবঞ্চনা করার প্রবৃত্তি সর্ব্ব সময়ে আমাদিগের ভিতর বর্ত্তমান ছিল ও এখন আছে।

৪ঠা জুলাই ১৯২২ বরাহনগরের জন্মোৎসবের খরচের জন্য অর্থ অনটনের কথা ঠাকুর হরনাথকে জানান হয়, ঠাকুর ভাগবত মিত্রকে ডাকিয়া ৫০০৲ টাকা কর্জ্জ দিতে বলেন, ভাগবত ৫০০৲ টাকা আনিয়া ঠাকুরের সম্মুখে উৎসবের কর্ত্তাদের হস্তে দিয়াছিলেন। এই টাকা কর্জ্জ দিয়া কর্ম্মকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে কোন প্রকার লিখিত দলিল গ্রহণ করা হয় নাই। তিন বৎসরের মধ্যে এই কর্জ্জের টাকার এক পয়সাও পরিশোধ করা হয় নাই অধিকন্তু এই কর্জ্জের টাকা পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। এই কর্জ্জের টাকা ভাগবতকে দেওয়া হইলে কটকের টহল প্রসাদ রায়কে পুরীতে পাণ্ডা ভোজনের কর্জ্জের ১১০০৲ টাকা দিতে হইবে, এই সুন্দর যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভাগবতের টাকা দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। ৮ই জুলাই ১৯২৫ সালে ভাগবত আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঐ কর্জ্জের টাকা আদায় করিয়াছিলেন।

ঠাকুর এই টাকা ভাগবতকে দিতে আদেশ করেন, কিন্তু তাঁহার কথা কেহ শুনেন নাই অধিকন্তু ভাগবতের আর্জির যে জবাব দিয়াছিলেন তাহাতে এই কর্জ্জের বিষয় অস্বীকার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, কোনরূপ কর্জ্জের দলিল না থাকিলেও আদালত এই কর্জ্জের কথা বিশ্বাস করিয়া ভাগবতকে কর্জ্জের টাকা দিবার আদেশ করিয়াছিলেন। ঠাকুর হরনাথ কি ভক্তগণকে এই কর্জ্জের টাকা অস্বীকার করিতে বলিয়াছিলেন? তবে ভক্তগণ কর্জ্জের বিষয় অস্বীকার করিয়া সত্যের অপলাপ করিলেন কেন?

ঠাকুর হরনাথ বলিতেন ও পাগল হরনাথ পত্রাবলীর ছাপা পত্রে আছে "কৃষ্ণ সরলের নিকট সরল বাঁকার নিকট বাঁকা"। যাঁহাদের ভিতর মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কুটিলতা নাই তাঁহারাই সরল। সত্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। নিত্য সত্য শ্রীগোবিন্দ কেবল সত্যই ভালবাসেন, বিশুদ্ধ ভালবাসা বা প্রেম লাভ করাই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণচরণে রাধিকার ন্যায়, সুখ, কামনা, বাসনা পুষ্পের ন্যায় আত্মাঞ্জলি দিলাম বলিয়া দাঁড়াইতে না পারিলে বিশুদ্ধ ভালবাসার আস্বাদ আসিবে কেমন করিয়া? এই কথাই হরনাথ তাঁহার সারা জীবনে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তাঁর নিকটে গিয়াছিলাম বিশুদ্ধ ভালবাসা লাভ করা উদ্দেশ্যে নহে, যে বিশুদ্ধ ভালবাসা সারাজীবন তিনি স্বয়ং সাধিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার প্রাপ্তির আশায় আমরা তাঁহার নিকটে যাই নাই। আমরা তাঁর সহিত মিশিয়াছিলাম বুকভরা ইহ সংসারের অসার সুখ কামনা, বাসনা লইয়া। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে চাহিয়াছিলাম হে হরনাথ, পুত্র দাও, কন্যার উপযুক্ত পাত্র দাও, রোগ আরোগ্য কর, যশ দাও মান দাও, ঐশ্বর্য্য দাও, মোটর গাড়ি দাও, আমি তোমার অতি প্রিয় পাত্র ও শ্রেষ্ঠ ভক্ত এই আখ্যা দাও যাহাতে লোকে দেখিতে পায় যে হরনাথ কুকুর আমার দ্বারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আছেন। আমরা কি প্রকার অসার কামনা তাঁহার নিকটে করিয়াছিলাম তাহার একটী উদাহরণ নিম্নে দিলাম। লেখক কোন কল্পনা-প্রসূত অলীক গল্পের উদ্ভাবন করিয়া এই অমিয় হরনাথ লীলা কথার মধ্যে স্থান দিবে না ইহাই তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

একদিন বেলা আন্দাজ ১২টার সময় জলযোগান্তে হরনাথ ও মাণিক মা তাঁর ত্রিতলার বসিবার গৃহে বসিয়াছিলেন। ভাগবত মিত্রও ঐ সময়ে ঐ কক্ষের একটী আরাম চেয়ারে উপবিষ্ট ছিল। মাণিক মা তাঁহার সমাজগত অভ্যাস বশতঃ এক খিলি পাণ নিজ হস্তে তৈয়ারী করিয়া হরনাথকে দেন ও

একখিলি পাণ ভাগবতও পাইয়াছিল। মাণিক মা তাঁর নিজের জন্যও একখিলি পাণ তৈয়ারী করিয়া তাঁর মুখে দেন ও চর্ব্বণ করিতে থাকেন অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মুখ হইতে পাণ ফেলিয়া দেন ও পুনরায় পাণ তৈয়ারী করিয়া চর্ব্বণ করিতে থাকেন এবারেও মুখ হইতে পাণ ফেলিয়া দেন এইভাবে ক্রমাগত পাণ তৈয়ারী করিয়া মুখে দিয়া ফেলিয়া দিতে থাকেন। শেষে মাণিক মা ঠাকুরকে বলেন "আজ সকাল হইতে পাণ খাইতে পারিতেছিনা, পাণ একেবারে ভাল লাগিতেছে না কিন্তু পাণ খাইতে প্রবল ইচ্ছা হইতেছে—ইহার কোন উপায় করুন" ভাগবত এই কথা শুনিয়া মনে মনে হাঁসিল কিন্তু মহাপ্রাণ হরনাথ হাঁসিলেন না, তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে উপায় বলিয়া দিলেন। হরনাথ বলিলেন "পাণের সহিত কিছু চুণ খাও এখনি ভাল লাগিবে"। ঠাকুরের কথা ফলপ্রদ হইল। মাণিক মা মুখ-বিবরে দাহ হইয়াছে বলিলেন কিন্তু পাণ ভাল লাগিতেছে স্বীকার করিলেন। ঠাকুরের কথা ভাগবত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে বা যে কেহ পরীক্ষা করিতে পারেন।

এখন এই অতি তুচ্ছ গল্পের কথা ছাড়িয়া দিয়া একবার ভাবিয়া দেখুন আমরা কি হীনপ্রকৃতি লইয়া ঠাকুরের সহিত মিশিয়াছিলাম। আমাদিগের কপটতা অসত্যাচরণ ইত্যাদি মন্দ প্রকৃতি পরিত্যাগ করিবার উপায় কি? এই সকল হীনপ্রকৃতিগত অভ্যাস কি প্রকারে দূরীভূত হয় বলিয়া একদিনও হরনাথের নিকট প্রার্থনা করি নাই, তাই আমরা যেমন হীন সেইরূপই আছি।

৪। "কুসুম হরনাথের জয়" এই কথা কয়টী অনেককে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি ও পত্রের শিরোনামায় "কুসুম হরনাথের জয়" লিখিতে দেখিয়াছি। এইরূপ 'কুসুম হরনাথের জয়" বলা ও লেখার কি অর্থ আমি বুঝিতে পারি না। যদি কুসুমকুমারী ও হরনাথের উপর অনুরাগ দেখানই উদ্দেশ্যই হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত বর্ণনার সহিত কেমন করিয়া সামঞ্জস্য থাকে ইহা আমার বুদ্ধির অগম্য।

২৫শে মে ১৯২৭ সালে রাত্রি ৯৷৷০ টার সময় ঠাকুর হরনাথ অমরধামে চলিয়া যান। ৪ঠা জুন সোণামুখীতে তাঁর আদ্য শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শ্রাদ্ধ বাসরে অনেক ভক্তের সমাবেশ হয়, তাঁহারা সকলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া ঠিক করেন যে ঠাকুরের স্ত্রী ও পুত্রদ্বয় এই তিন জনে ঠাকুরকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই ভক্তগণ একত্রে বীরদর্পে ভিতর বাটীর প্রাঙ্গনে গিয়া কুসুমকুমারী, অনুকূল

ও কৃষ্ণদাসকে মধুর সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছিলেন "তোমরা ঠাকুরকে হত্যা করিয়াছ।" কিন্তু হরনাথকে হত্যা করার অপবাদের যবনিকা এইখানেই পড়ে নাই। ইহার এক মাস পরে ২রা জুলাই ১৯২৭ সালে মেদিনীপুরে ঠাকুরের জন্মোৎসব বাসরে এই কেচ্ছার বিষয় পুস্তক আকারে মুদ্রিত হইয়া বিনা মূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। ঠাকুর অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কুসুমকুমারী, অনুকূল ও কৃষ্ণদাস এই সংগৃহীত অর্থের উপভোগ করিতে পারিতেছিলেন না, তাই তিন জনে একত্রে হরনাথকে হত্যা করিয়াছিলেন এই যুক্তিই ঐ পুস্তকে দেখান হইয়াছে।

এই ভক্তগণ বলিয়া থাকেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ধরাধামে হরনাথ রূপে আসিয়াছিলেন। বোধ হয় এই ভক্তগণ ভাবিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ হরনাথ সোণামুখীতে আবির্ভূত হইয়া এক নীচকুলোদ্ভবা হীন চরিত্রা কন্যা কুসুমকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ও এই নীচকুলোদ্ভবা কন্যার গর্ভে কতকগুলি কামজ সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন তাই তাহারা তাহাদিগের স্বামী ও পিতাকে হত্যা করিয়াছিলেন এই ভক্তগণ কুসুমকুমারী, অনুকূল ও কৃষ্ণদাসের এখনও গলা টিপিয়া ধরিয়া আছেন কারণ হত্যা করা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই। অধিকন্তু ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে কুসুমকুমারীর পূজাকারী ভক্ত-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে ঐ ভক্তগণ এক হাত কুসুমকুমারীর গলায় দিয়া আছেন ও অন্য হাত ঠাকুরাণীর চরণে দিয়াছেন ও উচ্চ কণ্ঠে "কুসুম-হরনাথের জয়" বলিতেছেন। "ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুঃখ লাগে আর হাসি"।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই বুঝা যায় যে হরনাথ, যদিও তিনি কে আসিয়াছিলেন তাহা কাহাকেও বুঝিতে দেন নাই, তথাপি যদি কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণই হরনাথ হইয়া আসিয়াছিলেন বুঝিয়াছি তাহা হইলে তাহাদিগকে বলিবার আর কিছুই নাই। তবে মনে হয় এইরূপ ভক্তগণ নিশ্চয়ই কলিযুগের অবতার।

৫। হরনাথ অতি সাধারণভাবে সকলের সহিত মিশিতেন। তিনি আমাদের মত একজন সংসারী গৃহস্থ ভাবেই মিশিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় ও লিখিত পত্রে ভ্রম দেখাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিতেন। নিম্নে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত দুই খানি পত্রের নমুনা দিলাম। ইহাতে প্রমাণ হয় তিনি কত সরল ছিলেন।

ঠাকুরের পত্রের সরল পাঠ

শ্রী

বাবা ভাগবত!

বাবা আমি তোমায় জানি তবুও মাঝে মাঝে না লিখিলে পত্রে লিখিব কি তাই শরৎ বাবার বিষয় লিখিয়াছিলাম অবশ্য অন্যায় হইয়াছে নারাণ দাদার আসিবার কথা ছিল কি হইল যদি আসে, তার সঙ্গে একদিন কলিকাতা যেয়ে এ সময় একবার শরৎ বাবার সঙ্গে দেখা করে আসিতাম যদি নারাণ দাদা আসেন শীঘ্র পাঠাইয়া দিও শরৎ বাবা আশ্বিন মাসে নগর সংকীর্ত্তন করিবেন সেই সময়ে যেতে লিখিয়াছেন সে সময় ত আমি যাব না তাই আগে যাবার ইচ্ছা। বাবা ভাগবত তোমার কার্য্য অনেক, প্রভু তোমায় তোমার মনের কার্য্য করিবার উপযুক্ত সাহায্য করুন এবং জীবিত রাখুন। তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী স্নেহের Jugmohandas, Raja Babu, Bhagawandas, Narotamdas প্রভৃতি সকলে কার্য্য আরম্ভ করে দিয়েছে বাবা তোমাদের এ সুন্দর কার্য্য ও আদর্শ শিক্ষায় জগতের সকল জাতি উপকৃত হ'ক ইহাই আমার বাসনা। তোমাদের কার্য্য চিরজয়ী হ'ক তার সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও হও। Lahore যেতে হলে কোন দুঃখ করিও না, ভালই ও যেখানে যাও আমার নিকট হ'তে দূরে থাকিবে না আমি সকল সময়েই তোমাদের কাছে কাছে আছি তা' না হলে কোন একটা অন্যায় করিবার সময় ভাব কেন, লাহোর আমার নিকট দূর নয় বরং কলিকাতা বহুদূরে। কত মজাই দেখিবে। সুখে থাক। মা কেমন আছেন। আমার বড় দিদি কেমন আছে স্নেহের রাম কেমন আছে।

তোমার স্নেহের হর।

Translation of the above letter.

Baba Bhagbat

Baba, I know you well, still if I do not occasionally write such matters, what shall I write in the letter? I wrote about Sarat Baba. I admit I did wrong in doing so. Narain Dada was expected to come. What about his coming here? If he come I will accompany him to Calcutta to see Sarat Baba. If Narain Dada comes, send him soon. Sarat Baba will perform Nagar Sankirtan in the month of Aswin. He requested

me to come at that time, but I shall not be able to go then, so I want to go now. Baba Bhagbat your works are numerous. Pray to Lord to give you His proper help to fulfil your mission and let Him grant you long life. As you desired Jugmohandas, Raja Rabu, Bhagawandas, Narotamdas and others have commenced the work. Baba, let, the people of all nationality be benefitted by your noble works and unique example—this is my desire. Let your works be immortal, and along with them be you immortal. Don't be sorry to go to Lahore. Wherever you go you will be not far off from me, I am always with you, otherwise why do you hesitate to do wrong? Lahore is nearer to me than Calcutta. You will see many funny things there. Be happy. How is your wife? How are my elder sister and affectionate Ram.

Yours affectionately Hara.

ঠাকুরের পত্রের সরল পাঠ।

শ্রী

বাবা ভাগবত,

* * * তোমাকে আর ভোলাকে আমি বড় ভয় পাই তোমরা দুটী আমার নিতান্ত অপগণ্ড শিশু তাই এত আব্দার কর। বাবা রে তোমার ইচ্ছার শক্তি দেখে আমি স্তম্ভিত হইয়াছি * * * *

তোমার স্নেহের হর।

Translation of the above letter.

Affectionate Bhagbat,

Really I feel nervous to approach you and Bhola. You two are my simplex boys and this is why you fret so much I am stunned to feel the power of your will-force.

Yours Hara.

(৬) ঠাকুর হরনাথ তাঁর জীবনে কেবল ভালবাসা দেখাইয়া গিয়াছেন। যিনিই ঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছিলেন তিনিই বলিয়া থাকেন, ঠাকুর যেমন তাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন এরূপ আর কাহাকেও ভালবাসেন নাই। এই ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ ভাগবতকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার নমুনা দিলাম।

শ্রী

[illegible]

* * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

[illegible]

ঠাকুরের পত্রের সরল পাঠ।

শ্রী

বাবা ভাগবত,

তোমার পত্র পাবার আগেই আমরা তোমার আসা সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছিলাম আগে তুমি আসিবে শুনে কেবল আমি নই বাড়ীর সকলেই যেমন আনন্দিত হইয়াছিলাম তেমনই আবার তুমি আসিতে পারিলে না শুনে নিরানন্দ হইল। বাবা পূজার সময় ছেলেরা মা বাবার নিকট আসিলে মা বাপের আনন্দের সীমা থাকে না। ভাগবত তুমি যে আমাদের কি রকম ছেলে তা প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। বাবা যখন সুবিধা হবে একবার একদিনের জন্যও আসিও তোমাকে দেখিলে আমাদের প্রাণে অনেক বল পাই * * * *

তোমার হর

Translation of the above letter.

Baba Bhagbat,

Before any letter reached us we gave up all hopes of your coming. Your subsequent postponement of the proposed visit saddened us as much as your prior commitment filled us with delight. It is so natural with parents to have an ecstasy of joy when their children meet them during the Pujas. Bhagbat, it is beyond the range of my expression to expound the fact that what sort of a son you are unto us. Dear if opportunity comes, come even if it is for a single day, for hearts become more strengthened at your sight.

Yours Hara.

ঠাকুর হরনাথের পত্রের সরল পাঠ।

শ্রী

স্নেহের বাবা ভাগবত,

তোমার নাম আর বামাচরণ বাবার নাম চিরস্মরণীয় হউক ইহাই আমার ইচ্ছা। তোমরা প্রভুর প্রিয় জন এই জন্যই তোমাদের নাম তিনি চিরস্থায়ী করিবার জন্য এই এক কার্য্য করিলেন * * * *

তোমার স্নেহের

Translation of the above letter.

My affectionate Bhagbat,

It is my earnest desire that your name with Bamacharan's be commemorated. You are dear ones of our Lord and He has so willed to make your names immortal.

Yours Hara.

ঠাকুর হরনাথের পত্রের সরল পাঠ।

শ্রী

স্নেহের পতুল, বাবা ভাগবত তোমার পত্র ও বই পাইলাম বই পাইয়া তোমার মার গরব ও আনন্দ ধরে না। বাবারে আমার অবস্থা এতে বেশ বুঝিতে পারিবে তোমাকে যে রামায়ণ জন্য লিখিয়াছিলাম এ কথা এখন পর্য্যন্ত মনে আনিতে পারিতেছি না * * * *

তোমার হর

Translation of the above letter.

My darling doll Bhagbat,

Received your letter and the book. The joy of your mother knows no bounds on the receipt of the book. I can not yet remember when I asked you to send the Ramayana and you will fully realise my position from it.

Yours Hara.

ঠাকুর হরনাথের পত্রের সরল পাঠ।

শ্রী

স্নেহের ভাগবত বাবা,

তোমার পত্র না পাওয়াতে জীবন শুষ্ক মনে হইতেছিল যেখানেই থাক যেমনই থাক আমাকে ভুলিও না। তুমি আমার প্রধান ছেলে তোমাকে ছেলে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি জনমে জনমে যেমন আমাদের এ সম্বন্ধ থাকে। * * *

তোমাদের হর

Translation of the above letter.

Affectionate Bhagbat Baba,

My life seemed to be dreary as I did not receive any letter from you. Wherever and however you remain, do not forget me. You are my dearest boy. I am greatful to have you as my boy. May this relation of ours exist for all times to come.

Yours Hara.

শ্রী

[illegible]

* * * * * * *

[illegible]

ঠাকুর হরনাথের পত্রের সরল পাঠ।

শ্রী

বাবা ভাগবত, তোমার পত্র পাইবার বহু আগে হতেই আমি তোমায় জানি বাবা তোমার পত্রের প্রথম অংশ কলিকাতায় হরিদাসের নিকট পাঠাইলাম সে সকলকে দেখাইবে তাতে সকলেই পরমানন্দিত হবে বাবা। বাবা তোমার কার্য্যের তুলনা তুমিই তোমার হৃদয় তোমার হৃদয়ের মত অপর তুলনার বস্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রভু তোমার সকল সাধ পূর্ণ করুন। বাবা প্রভুর ইচ্ছায় Govt. notification শীঘ্র ২ কর্ম্মে পরিণত হক তোমাকে শীঘ্র আমাদের মধ্যে পাইয়া আমরা পরমানন্দিত হই। বাবা আজ একটী বৎসর তোমার মুখখানি দেখি নাই বড় দেখতে ইচ্ছা করেছে। প্রভু আমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন। * * *

তোমার স্নেহের হর

Translation of the above letter.

Affectionate Bhagbat,

I know you long before I received any letter from you. I send the first half of the letter to Calcutta for Haridas. He will show it, dear, to all others and they will certainly be very glad. My son, your works are matchless. Nothing can be found in par with your heart. You are the only embodiment of your type. May God fulfil your desires. God willing let the Govt. notification soon come into effect. Let your association soon in our midst be a source of joy. It is a year round since I could not see your face. How I crave to see you once again ! May God fulfil my desire.

Yours affectionately

Hara.

শ্রী

স্নেহের - ভাগবত -

বাবা - তুমি চুপ করে থাকিলে - আমার
তত কিছু আসে - যায় - না - কিন্তু - যে মা - ডান হাতে করে
তোমার মুত ফেলেছে - সে চারিদিক আন্ধার দেখে
আজ - তোমার পত্রখানি কিছু কম ২০ বার পড়ে ও
তার - আশা মিটে - নাই তোমার পত্র - [illegible]
[illegible]

* * * * * * * *

* * * * * * *

[illegible]

* * *

* * * * * * *

[illegible]

ঠাকুর হরনাথের পত্রের সরল পাঠ।

শ্রী

স্নেহের ভাগবত,

বাবা তুমি চুপ করে থাকিলে আমার তত কিছু আসে যায় না। কিন্তু যে মা ডান হাতে করে তোমার মুত ফেলেছে সে চারিদিক আন্ধার দেখে আজ তোমার পত্রখানি কিছু কম ২০ বার পড়ে ও তার আশা মিটে নাই তোমার

পত্রে পুস্তকের কথা তার যেমন ভাল লাগিল না তোমার পত্রে কেবল মাত্র লেখা থাকা চাই তুমি ভাল আছ, বৌমা ভাল আছে, গৌরী প্রভৃতি প্রত্যেকের নাম ধরে ভাল আছে এই সব থাকা চাই। তোমার মুখখানি আবার কবে দেখিতে পাইবে তাই ভাবিতেছে * * * * * * যাহাহক বাবা তুমি যেমন বলেছ তেমনই কার্য্যে পরিণত করিয়াছ ধন্য তোমার উৎসাহ প্রভু তোমাকে পুরস্কার দেন। তুমি সদা সুস্থ শরীরে থাকিয়া প্রভুর কার্য্য কর। * * *

তোমাদের হর

Translation of the above letter.

The letter in question was written by Haranath in 1910 A. D. after the arrival of Kusum Kumari at Srinagar, Kashmir.

Affectionate Bhagbat,

Son, it matters little to me if you maintain silence but the four quarters darken to that mother, who cleaned your urine with her own right hand. To-day she has read your letter at least 20 times and yet she is not satisfied. She could not appreciate much the note as regards the book mentioned in the letter. She wishes that you are well, so also your wife, Gouri, nay every body by name, these should only find place in your letter. Her mind is at present occupied with the only thought when she would see your face. However you have been true enough to your words. Thanks to your energy. May God reward you. Always remain hale and hearty and serve God.

Yours Hara.

ঠাকুর হরনাথের পত্রের সরল পাঠ

শ্রী

স্নেহের ভাগবত বাবা,

* * * * তোমার মা তোমায় পত্র পড়ে বড়ই সুখী আর পুস্তকের মধ্যে তুমি যাহা লিখিয়াছ তাতে তার আনন্দের সীমা নাই সে চক্ষে দেখিয়াছে তাই তার এত আনন্দ তোমার মা বলিতেছে যে সকল কথা লিখিয়াছ কিন্তু

তোমাকে যে আমি নানা রকমে ধমকাইতাম সে কথা লেখ নাই কেন। বাবা তোমরা সুখে থাক ইহাই আমার ইচ্ছা। * * *

তোমার হর

Translation of the above letter.

My beloved Bhagbat,

Your mother is very glad to read your letter. What more the text of the book you have compiled has given her unlimited joy. She is so glad because she has been able to witness it with her own eyes. She asks me why you have left out any mention of my reproaches when you have written every other thing. May you be in peace and happiness.

Yours affectionately
Hara.

ঠাকুর হরনাথের পত্রের সরল পাঠ।

শ্রী

বাবা ভাগবত,

তোমার পত্র পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম বাবা কৃষ্ণ তোমায় সদা আনন্দে রাখুন। তোমার আদেশ মত আমি, অটল, বামাচরণ বাবা, রাম রাখাল বাবা, রাধাচরণ বাবা, রাধাবল্লভ, নিমাই বাবা, লালমোহন সকলে এখানে আসিয়াছি অদ্য foundation stone সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব ভোজন করাইয়া স্থাপন করা যাইবে। পুরীর অনেক বড়লোক একত্রিত হইবে। বাবা তুমি আমার প্রাণের পুত্র এবং তা অপেক্ষাও বেশী তুমি পরমানন্দে থাক। * * * * *

তোমার বাবা হর।

Translation of the above letter.

My beloved Bhagbat,

I was much glad to go through your letter. May God rest you in peace. As you desired so I came here with Atal, Bamacharan Baba, Ram Rakhal Baba, Radhacharan Baba, Radha Ballav, Nemai Baba and Lal Mohan. The foundation stone will be laid to-day after Kirtan and feeding of the Vaisnavas. Many notable persons of Puri will assemble here. You are my dearest son and may you rest in greater and greater happiness.

Yours Hara.

উপরি উক্ত বিষয়ের অনুশীলন করিলে ইহাই অনুমান হয় যে হরনাথ কি প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন বা তাঁর ধর্ম্মমত কি নির্ণয় করা সোজা কার্য্য নয়। অবশ্য ইহা বর্ত্তমান জীবনী লেখকের সাধ্যাতীত কার্য্য। কিন্তু অন্যের পক্ষে ইহা সাধ্যাতীত নয় যদি তাঁহারা কখন কোন সময়ে কাহার নিকট হইতে অসত্য, অতিরঞ্জিত বর্জ্জিত হরনাথের সরল সত্য জীবনীর ঘটনাগুলি পান তখন তাঁহারা হরনাথ কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন নির্ণয় করিতে পারিবেন।

লেখকের শেষ কৈফিয়াৎ।

১৯২২ সালে বরাহনগর জন্মোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য টাকা কর্জ্জ দিবার এক বৎসর পরে লেখক বুঝিতে পারেন যে কর্জ্জের টাকা সভার কর্ম্মকর্ত্তারা পরিশোধ করিবেন না, এইজন্য লেখক স্বর্গীয় কবিরাজ সত্যচরণ সেনের সহিত মিলিত হইয়া ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সঙ্ঘ নামে একটী পৃথক্ অনুষ্ঠানের সূচনা করিয়াছিলেন। ৮ই জুলাই ১৯২৫ সালে লেখক কর্জ্জের টাকা আদায় করিবার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া টাকা আদায় করেন। ১৯২৫ সাল হইতে লেখক কলিকাতার সভার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। এমন কি ১৯২৫ সাল হইতে লেখক কোন উৎসবে বা সোণামুখীতে যাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। ২৫মে ১৯২৭ সালে ঠাকুর অমরধামে চলিয়া গেলেও তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধে লেখক সোণামুখীতে যায় নাই। ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে মেদিনীপুরের জন্মোৎসবেও লেখকের যাইবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু খাগড়ার কিরণেন্দু ঘোষের কথায় উৎসবের দিন লেখক মেদিনীপুরে গিয়া পৌছান ও এক ঘন্টার মধ্যে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উৎসব প্রাঙ্গনে লেখককে দেখিয়া ঠাকুরের দুইজন বিশিষ্ট ভক্তের সাদর ভাষণে লেখক তথায় আধ ঘণ্টার অধিক থাকিতে পারে নাই। সোণার গাড়ু লইয়া আইস লেখকের পা ধুইয়া দিতে হইবে এইরূপ মধুরভাষণ করিয়া লেখকের পাছে পাছে ঘুরাতে, লেখক তৎক্ষণাৎ উৎসব স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মেদিনীপুর উৎসবে হত্যা করা অপবাদের পুস্তক ছাপা বা বিতরণের বিষয় লেখক কিছুই জ্ঞাত ছিল না। ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত লেখক সভার সভ্যগণের সহিত বা কলিকাতার কোন ভক্তের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখে নাই। ১৯৩০ সালে তত্ত্বপ্রচারিণী সভার সভাপতি শরৎ চন্দ্র দের বিশেষ আগ্রহে লেখক ঐ সভার একজন সভ্য হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৯৩০ সালে কলিকাতা ২৪নং মিডিল রোডস্থ ভবনে শরৎ বাবুর আগ্রহে জন্মোৎসবে কর্ম্মিগণ সহ লেখক উপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই উৎসব বাসরে উপরোক্ত দুইজন ভক্তের মধ্যে একজন লেখককে শরৎ বাবুর সম্মুখে যেরূপ ইতর ভাষা প্রয়োগ করিয়া মধুর সম্ভাষণ করিয়াছিলেন তাহা এই পবিত্র জীবন চরিত্রে লিখিয়া কলুষিত করিবার অযোগ্য। শরৎ বাবুর দ্বারা আনীত লেখককে এইরূপ

কটু উক্তি করিতে শুনিয়া শরৎ বাবু উৎসব স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন ও অনেক অনুরোধ করাতে শরৎ বাবু ফিরিয়া আসেন।

উপরোক্ত বিবরণের মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে তাহা হইলে বুঝা যাইবে লেখকের সহিত তত্ত্বপ্রচারিণীর সভ্যগণের কোন সম্বন্ধই ছিল না। এমন অবস্থায় ঠাকুরকে হত্যা করার অপবাদের সহিত লেখকের কোন সম্বন্ধই ছিল না। ১৯৩০ সালের পূর্ব্বে লেখক এই অপবাদের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না।

পুরী আশ্রমের জমি ১৯১০ সালের ৩রা মে রেজেষ্ট্রিকৃত দলিলে লেখক পুরী মিউনিসিপালিটির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও ১৯১৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর এই সম্পত্তি ঠাকুরকে হস্তান্তরিত করিয়াছিলেন কিন্তু ১৯৩০ সালের ৫ই জুলাই তত্ত্বপ্রচারিণী সভা আদালতে নালিস করা হইবে এই ভয় দেখাইয়া ঠাকুরের দুই পুত্রের নিকট হইতে রেজিষ্টারী দলিলে পুরীর আশ্রম লেখাইয়া লইয়াছিলেন। লেখক ইহার বিষয় কিছুই জানিত না বা এই দলিল লেখককে দেখান হয় নাই। অধিকন্তু এই দলিলে লেখকের সহির বিশেষ প্রয়োজন ছিল কারণ লেখক ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই দলিল নাকচ করিতে পারে তাহার পথ বন্ধ হইত কিন্তু লেখকের সহি লওয়া হয় নাই। অতএব লেখক যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রেজিষ্টীকৃত দলিলই ইহার প্রমাণ দিবে। লেখকের নামে অযথা অপবাদ অনেকেই প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। এমন কি মাদ্রাজ, আন্ধ্রা ভক্তগণের নিকট লেখকের নামে কর্জ্জের টাকার আদায় করার জন্য অসত্য দোষারোপ করিয়াছেন ও করিতেছেন। পাপকাজ চিরকাল চাপা থাকে না, একদিন না একদিন সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

১৯৩০ সালের জন্মোৎসব হইবার একমাস পূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্যামসুন্দরের পালার সময় লেখক মাতাঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহে সোণামুখীতে গিয়াছিল। অর্থাৎ ১৯২৫ সাল হইতে ১৯৩০ সালের মধ্যে লেখক একবারও সোণামুখীতে যায় নাই। সোণামুখীতে গিয়া লেখক এরূপ নির্ম্মম ব্যবহার পাইয়াছিলেন যাহার তুলনা লেখকের ৬৯ বৎসর বয়স মধ্যে কোন ঘটনার সহিত তুলনা করা যায় না। লেখক সোণামুখীতে পৌছিয়া মাতাঠাকুরাণীর সহিত দেখা ও প্রণাম করিয়াছিলেন। তিনি তাঁর স্নেহ বাক্যে লেখককে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে লেখকের প্রাণে শান্তি আসে নাই কারণ প্রাতঃকালে সোণামুখীর বাড়ীতে পৌছান হইতে বেলা ৩টার সময় পর্য্যন্ত ঠাকুরের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া সোণামুখীর ষ্টেসনে

যাওয়া পর্য্যন্ত ঠাকুরের পুত্র অনুকূলচন্দ্র একবারও লেখকের সহিত একটী কথাও কহেন নাই অধিকন্তু লেখক যে স্থানে বসিয়াছিলেন সে স্থানে ইচ্ছা করিয়া আসে নাই। আহার করিয়াছ কিনা একথাও জিজ্ঞাসা করেন নাই। অনুকূলের নিকট হইতে এই প্রকার ব্যবহার পাইল কেন, ইহা চিন্তা করিতে করিতে লেখক কাহাকেও কিছু না বলিয়া সোণামুখীর ষ্টেসনে পৌছিয়া বাঁকুড়া যাইবার গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। একমাস পরে কলিকাতার জন্মোৎসবে ইহার কারণ প্রকাশ হইয়া পড়ে।

জন্মোৎসব ও কাঙ্গালী ভোজন হইয়া যাইলে তৎপর দিন মধ্যাহ্নের আহারের পূর্ব্বে ২৪নং মিডিল রোডস্থিত বাড়ীর ছাতে তত্ত্বপ্রচারিণী সভার প্রথানুসারে এক মিটিং হয়। সেই অধিবেশনে মাতাঠাকুরাণী ও অনুকূলচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুরাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কাতরভাবে লেখককে বলেন যে তোমরা কলিকাতার ভক্তেরা হত্যা করার মিথ্যা অপবাদ দিয়াছ ও পুস্তক ছাপাইয়াছ—এই কথা শুনিয়া লেখকের চোখ দিয়া জল পড়ে ও লেখক উত্তরে বলেন যে এই অপবাদ দিবার সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। এই জন্যই বোধ হয় অনুকুল সোণামুখীতে কথা কহে নাই। অনুকূলচন্দ্র অতি রূঢ়ভাবে বলেন "যাও যাও তোমাকে আর মায়া কান্না কাঁদতে হবে না ইহাতে আমি ভুলি না এই কারণেই তোমার সহিত সোণামুখীতে কথা কহি নাই" লেখক এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ জন্মোৎসব বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। অনুকূলের রূঢ় কথা শুধু হত্যা অপবাদের জন্য বাহির হয় নাই ইহার সহিত পুরী আশ্রমের হস্তান্তরের ঘটনার যোজনা আছে। অনুকূলচন্দ্র মিথ্যা ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কটু উক্তি করিয়াছিলেন কিন্তু সত্য কি তাহা তাঁহার জানা আবশ্যক, এখনও হয় তো মিথ্যা ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আছেন। এই জন্যই কৈফিয়াৎ দিবার আবশ্যকতা বোধে কৈফিয়াৎ দেওয়া হইল।

ভূমিকার প্রথম ভাগ

সমাপ্ত।